চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন

শচীন্দ্রকুমার মজুমদার

• নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি •

Com. Rabin Sen

।। চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন ।।

শচীন্দ্রকুমার মজুমদার

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০০১৩

প্রকাশক—
নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
"সত্যপ্রিয় ভবন"
পি-১৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

শিক্ষা আন্দোলনে প্রবীণ-নেত্রী
শ্রীমতী অনিলাদেবী-কে

ভূমিকা

এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক স্মরণীয় নাম। এ সংগঠনের কথা না বলে, তার ভূমিকার কথা আলোচনা না করে এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজটা একেবারেই অসম্ভব। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসেও নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে বাদ দিলে সে-ইতিহাস অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। অবশ্য, প্রচলিত শিক্ষার ইতিহাসের রচয়িতারা শিক্ষার অগ্রগতিতে সংগঠনের ভূমিকা সজ্ঞানে বাদ দিয়েই চলেন। কারণ তাঁদের একটা তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গীর ভাণ থাকে। যে দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবানুগত নয়ই, বরং বলা যেতে পারে ভ্রান্ত। ঐসব ইতিহাস রচয়িতারা সরকারী প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ঐ কার্যধারার পিছনে আন্দোলনের একটা ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই, সেই ভূমিকা ইতিহাসে অনুল্লেখিত থাক্‌লে ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত হবে কি ক'রে?

যাক্ সেকথা। ১৯২১ সনে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক জোয়ারের দিনে অবিভক্ত বাংলার বেশকিছু সংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষক নিজেদের সংগঠন গড়ার কথা ভাবলেন এবং কাজে নামলেন। অবশ্য ঐসব পূর্বসূরীরা যে তারও কিছুদিন আগে থেকে ঐ নিয়ে ভাবনাচিন্তা সুরু করেছিলেন, একথা ভাবা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক হবে না। দীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার একটা পর্ব থাকে। সেই সলতে পাকানোটা নিশ্চয়ই ওর আগে থেকে হচ্ছিল।

ঐ সময়কালে গোটা দেশেই বইছিল চরম উত্তেজনার হাওয়া। বিশেষকরে স্কুল-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে নানা ক্ষোভ, নানা অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে তিনবছর আগে। ঐ যুদ্ধে পরাধীন ভারত কোনো পক্ষে ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজশাসক শক্তি তাদের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি উপনিবেশের জনগণের ঘাড়ে চাপাতে কসুর করেনি। ঐভাবে ক্ষয়ক্ষতির বোঝা চাপানোর ফলে উপনিবেশের জনগণের নাভিশ্বাস উঠছিল।

এদিকে নভেম্বর বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জারশাসিত রুশদেশে জারের শাসনের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন ধরনের এক রাষ্ট্রের জন্মলাভ সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের বুকে দারুণ এক আঘাত হানল। নবপ্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে জারের আমলে শৃঙ্খলিত বহুজাতি উপজাতির দেশগুলিতে উপনিবেশিকতার অবসান ঘটল। যুগযুগান্তের শোষণ ও বঞ্চনা এবং নিপীড়নের হাত থেকে ঐ সব জাতি ও উপজাতির জনগণ মুক্ত হল। এ মুক্তির বার্তা পামির মালভূমিকে অতিক্রম করে সুউচ্চ হিন্দুকুশ পর্বত ডিঙিয়ে

পরাধীন ভারতের মানুষদের কানেও এসে পৌঁছাল। শিকল ভাঙার গানের গুঞ্জন সুরু হল সারা ভারতময়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা ছিল সুচতুর শাসক, তারা বারুদের গন্ধ পেল। তৈরী হল রাওলাট আইন। তার প্রতিবাদ উঠল দেশময়। ঐ প্রতিবাদী জনশক্তির প্রতিবাদের কন্ঠকে সুরুতেই দাবিয়ে দিবার জন্য ইংরাজ শাসকরা তাদের শাসনকালের বর্বর নিষ্ঠুরতম ঘটনা ঘটাল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে। কিন্তু আগুন নিভল না। বরং সে আগুন শিখা আরও দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী অনেকদিন আগে থেকেই মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। এমনকি বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবীতে ১৯০৮ সনে তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ রাজনৈতিক ধর্মঘট সুদূর রাশিয়ায় ভি. আই. লেনিনের দৃষ্টি পর্যন্ত আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাঁর লেখায় সেকথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সর্বভারতীয় কোনো সংগঠন ছিল না। ১৯২০ সনে সেই সর্বভারতীয় সংগঠনও গড়ে উঠল। জন্ম নিল, সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯২০ সনের ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ শহরে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২১ সনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। ইংরাজদের স্কুল-কলেজ বর্জন করে অনেক শিক্ষার্থী বেরিয়ে এলো। সরকারী চাকুরী, খেতাব প্রভৃতিও অনেকে বর্জন করলেন। এইসব ঘটনা সেদিনের পরাধীন দেশের লেখাপড়া শেখা মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে বেশ কিছুটা চাঙা করেছিল ঐ সঙ্গে তখন কর্মসংস্থানের বাজারও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল। অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হচ্ছিল। বেকারী বাড়ছিল, লেখাপড়া শিখলে চাকুরী পাওয়া যাবে, অতএব লেখাপড়া শেখো। শিক্ষার লক্ষ্য চাকুরী। অথচ সেই চাকুরীর বাজার সংকুচিত হলে স্বাভাবিকভাবেই লেখাপড়া-শেখা মধ্যবিত্ত অংশের অস্তিত্বে আঘাত লাগে। সে-আঘাত লেগেছিল। শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রেও ছিল নিরাপত্তার দারুণ অভাব। স্কুল কর্তৃপক্ষের আচরণও ছিল জমিদার-সুলভ। এর সঙ্গেও ছিল আরও নানা সমস্যা। এসবও একদিকে ক্ষুব্ধ করেছিল পরাধীন ভারতের ঐ লেখাপড়া-জানা অংশের যাঁরা আবার লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের—শিক্ষক সমাজকে। সেদিন তাঁদের সংগঠিত হবার পিছনে উদ্দীপক হিসাবে ঐ মানসিকতাই কাজ করেছিল! কেউ সজ্ঞানে, কেউ অজ্ঞাতসারে ঐ মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক অত্যন্ত স্মরণীয় মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন—নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সত্তর বছর ধরে তার জন্মমুহূর্তের ঐতিহ্যকে ভুলে যায়নি। তাই আজও সেই সংগঠন ইরাকে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। প্রাক্তন পূর্ব জার্মানীর শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার যখন জার্মানীর স্বৈরাচারী হেলমুট সরকার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন প্রতিবাদ জানায় নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সত্তর বছরের ইতিহাস তাই এক সংগ্রামের ইতিহাস সেই সংগ্রাম শিক্ষার স্বার্থে। সংগ্রাম গণতন্ত্রের স্বার্থে। সংগ্রাম এক সুখীসুন্দর সমাজ গঠনের স্বার্থে। সেই সুখীসুন্দর মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী গঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই বাস্তবায়িত হতে পারে। সে-কথা উপলব্ধি করেই সমিতির বিগত কাঁথি সম্মেলনে (১৯৮১) নবরচিত গঠনতন্ত্রের মুখবন্ধে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শপ্রচারের কথা বলা হয়েছে।

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে তার সত্তর বছরের সুদীর্ঘ জীবনে বহু গৌরবময় সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। ছোটবড় বহু আন্দোলনের সুমহান ঐতিহ্যই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছে পরম সম্পদ।

১৯৫৪ সনের আন্দোলন নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জীবনে ঐরকম স্মরণীয় অধ্যায়। ঐ আন্দোলন সেদিন শুধু পশ্চিমবাংলার নয়, সারা ভারতের শিক্ষা আন্দোলনকে এক নতুন গতিবেগের সঞ্চার করেছিল। কেবল শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয় পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও চুয়ান্নর আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐ আন্দোলন শিক্ষকদের গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্ররা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রিয় শিক্ষকদের পাশে। শ্রমিকরা এগিয়ে এসেছিলেন, দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে। এগিয়ে এসেছিলেন মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের নানাসংগঠন। পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং বিধানসভার বিরোধীদলের নেতারা। আমরা গৌরবান্বিত যে সেদিনের ঐ আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছেন শ্রদ্ধেয় জননেতা এবং পশ্চিমবাংলার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'জনগণের সঙ্গে' নামক গ্রন্থে। আমাদের সেদিনের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর 'অপরাধে' সেদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সরকার তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিল।

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তথা এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঐ অধ্যায়ের ইতিহাসের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। সেদিনের আন্দোলনের পরিচালকদের কেউ কেউ ঐ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কিছু লিখেছেন। কিন্তু তা আমাদের জানার আগ্রহ পুরোপুরি মিটাতে পারেনি। কেবল সেদিনের ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত জানা নয় ; ঐ ইতিবৃত্ত থেকে আজকের সমিতির কর্মীরা শিক্ষাগ্রহণ করবেন, শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের পথ চলায় সে-শিক্ষাকে ব্যবহার করবেন। তার মাধ্যমেই আজকের সংগঠন আরও মজবুত হয়ে উঠবে। অতীতের ঐ সুমহান ঐতিহ্য আজকের কর্মীদের উদ্দীপ্ত করবে, প্রেরণা জোগাবে তাঁদের পথ চলার নির্দেশকও হবে।

আমরা আনন্দিত যে আমাদের সমিতির অন্যতম নেতা শচীন্দ্রকুমার মজুমদার সেই অভাব পূরণ করলেন। তাই, তাঁর লেখা 'চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিন' নামক গ্রন্থসকলের হাতে

তুলে নিতে পারাতেও আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। তাঁর এই লেখাগুলি আমাদের সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তখন দেখেছি ঐসব লেখার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। ইতিহাসের গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি ঐকাজ করেছেন। তাঁর রচিত এই গ্রন্থ পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিবার মুহূর্তে আমার সহকর্মী শচীন্দ্রকুমার মজুমদারকেও তাঁর ঐ অধ্যবসায়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তাঁর এই গ্রন্থে সেদিনের ঐ গৌরবময় অধ্যায়ের সব ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে, আমরা তা মনে করি না। আমি মনে করি, এই গ্রন্থ তার এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সূচনা। আমরা মনে করি, সেদিনের আন্দোলনের বহু ঘটনা এখনও অনুদ্‌ঘাটিত আছে। বিশেষকরে ঐ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে জেলায় জেলায় কীভাবে প্রস্তুতি করা হয়েছিল, তার ইতিহাস তো জেলাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। যেদিন সেই সব ইতিহাসও জানা যাবে, সেদিন চুয়ান্নর ইতিহাসের অপূর্ণতা আরও ঘূচবে। সেজন্যেই বলতে চাই যে এই গ্রন্থ তার সূচনা করল।

এই গ্রন্থ রচনাকালে তার মালমশলা যোগাড় করার কাজে অনেকে সহায়তা করেছেন। যাঁরা নানাবিধ তথ্য দিয়ে, সেদিনের বিভিন্ন নথিপত্র, পত্রিকা, ছবি, প্রভৃতি দিয়ে একাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যগুলিতে কোনো ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সেই সব ভুলত্রুটি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তীকালে ঐ ত্রুটি সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অন্যান্য নানা বিষয়ে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অরুণ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

২৯.১২.৯১



'৫৪-র আন্দোলনের অন্যতম নায়ক
সত্যপ্রিয় রায়

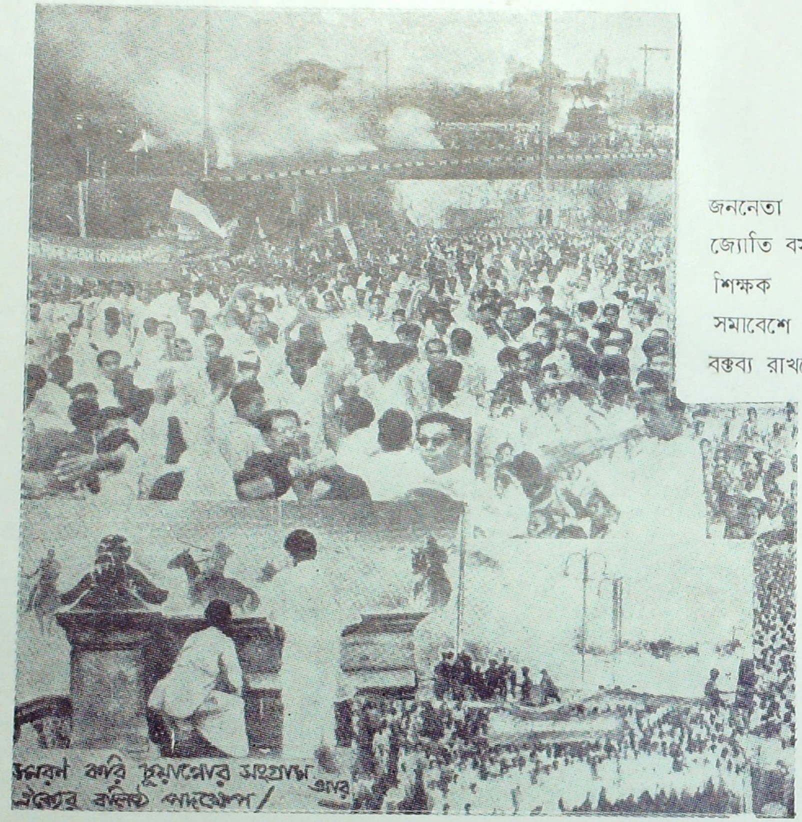


'৫৪-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার রাজপথ

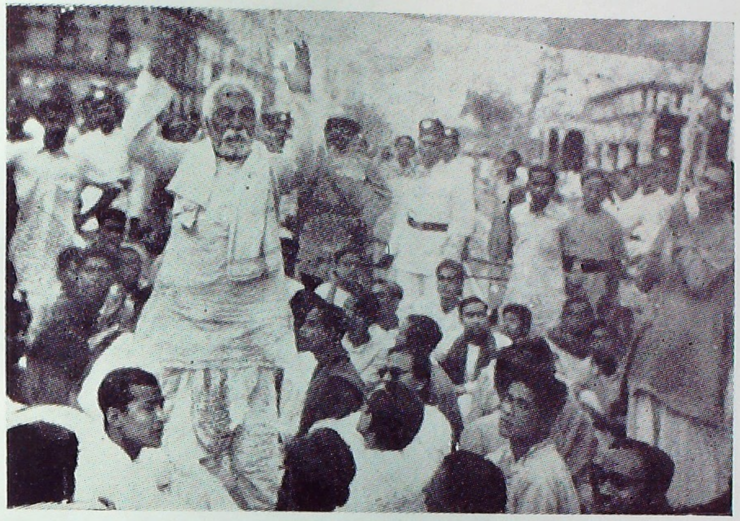


শিক্ষক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের আক্রমণ

পুলিশ আক্রমণ



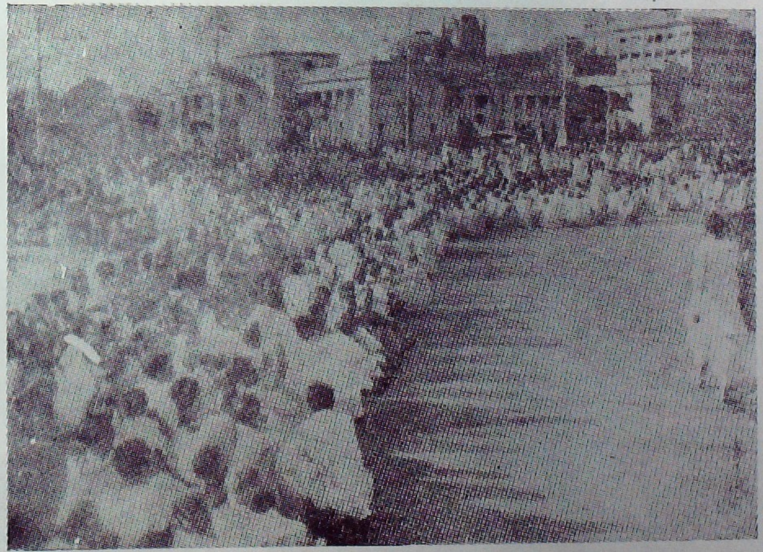
জননেতা জ্যোতি বসু শিক্ষক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন



সমাবেশে বৃদ্ধ শিক্ষক মহাশয় বক্তব্য রাখছেন



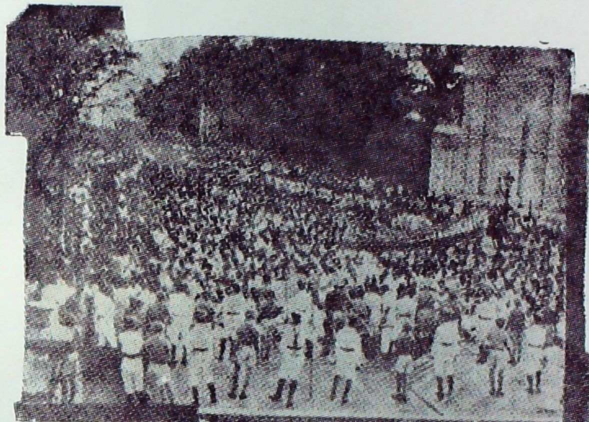
২৮শে ফেব্রুয়ারী '৬৪ বন্দীমুক্তির দাবীতে সমাবেশ



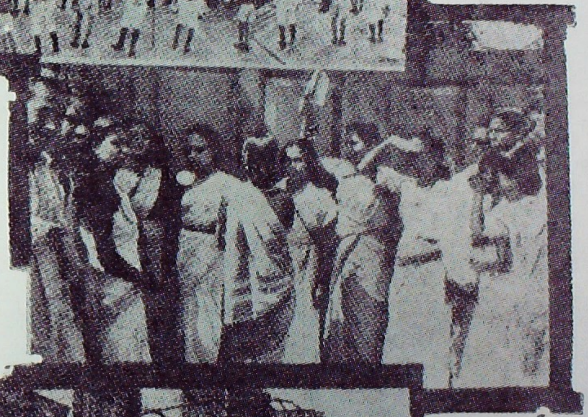
বিধানসভার পথে পথরুদ্ধ শিক্ষক শোভাযাত্রা



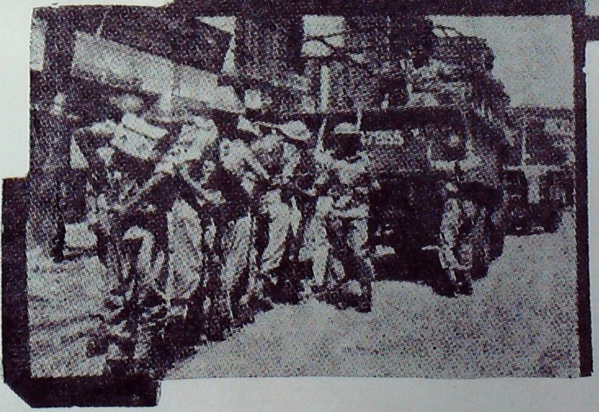
বিক্রম



'৫৪-র ঐতিহাসিক
গণঅবস্থান



বিদ্যালয়
কর্মবিরতির জন্য
স্বেচ্ছাসেবিকা



আন্দোলন দমনে
সামরিক বাহিনী



৯ই আগস্ট '৫৩-র জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন



'৫৪-র আন্দোলনের সমর্থনে স্কুলের ছাত্রছাত্রী

চুয়ান্নর স্মরনীয় বারো দিন

এক

দেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সুপরিচিত এক নাম। আমাদের জাতির জীবনে বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এ সময়ে শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। কিছুকালের মধ্যে শিক্ষক সমাজও বাঁচবার তাগিদে এক সমিতি করেন। পেশাগত দাবী আদায়ের সংগঠন ক্রমে উপলব্ধি করে শিক্ষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র তাদের আকাঙ্খার পূরণ হতে পারে। সম্মেলনগুলিতে এ সম্পর্কে মনোভাব গড়ে তোলা হয় এবং লড়াইয়ের সামর্থ্যলাভের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হয়। নতুন সরকারও শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের প্রয়াস নিলেন না। ধৈর্যের বাঁধ তখন ভেঙে যায়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালে রাজ্যে শিক্ষকদের এক ব্যাপক জাগরণ ঘটে। আন্দোলন সংগঠন, জনসমর্থনের ব্যাপকতা, সংগ্রামী কৌশলের অভিনবত্ব আর ত্যাগ স্বীকারের নিরিখে "মাধ্যমিক শিক্ষকদের ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪-র আন্দোলনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।" ১† রাজ্যের রাজনৈতিক প্রবাহ এতে কেন্দ্রীভূত হয়। আন্দোলনের তাৎপর্য অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। এ কারণে অবিস্মরণীয় এই শিক্ষক আন্দোলন ক্রমশঃ সকলের অনুধাবনের বিষয় হয়ে উঠছে।

সমিতির জন্ম যুগ সন্ধিক্ষণে

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে রাজনৈতিক প্রশ্নে, স্বাদেশিকতা প্রেরণায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নব চেতনা দেখা যায়। তা বৃটিশ প্রচলিত শত বছরের শিক্ষার ব্যর্থতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব, গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের অভাব, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু না করবার বিষয়গুলি নিন্দিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। লোকমান্য তিলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিশিষ্ট মনীষী স্যার আশুতোষ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার তথা তার স্বাধিকারের দাবীকে জনপ্রিয় করে তোলেন। দ্বিতীয় দশকে বিশ্ব পরিস্থিতি ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহ চিন্তাশীল মানুষের মনকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ইউরোপের দেশগুলিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের সংবাদ এখানে পৌঁছয়। সংবাদপত্র, দেশনেতাদের ভাষণ, বিভিন্ন ভাষায় এখানে প্রকাশিত মহামতি লেনিনের জীবনীগ্রন্থ থেকে এক পরিবর্তিত মানসিকতার রেখাপাত শুরু হয়। ইংরেজ সরকার স্বীকার করে এগুলি "ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্খায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।" ১৯১৮ সাল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হতে থাকে। বড় বড় শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। তার পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে সেটি উত্তাল হলো। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে শাসক

শক্তির জিঘাংসার বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হলো। ১৯২০ সালে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা "অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" গড়ে উঠল। এ সময়ে বছরে চার থেকে ছয় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলে ফসলহানি, খাদ্যঘাটতি, মহাজনের বাড়তি ঋণ এবং মহামারীর ভীষণ কোপের মুখে থেকেও কৃষকেরা আন্দোলনের সূচনা করছিল। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দেশবাসীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন "এক বছরের মধ্যে স্বরাজ"। ঠিক এ সময়ে বাংলার শিক্ষকেরা গড়ে তুললেন "অল-বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশন" বা "নিখিল-বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতি"। এক কেন্দ্রীয় সংগঠন সহসা তৈরী হয়নি। বরং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভাবনাটি এগিয়ে আসছিল। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ এম-পি ওয়েষ্ট-এর কথা অনেকে জানেন। ডিভিশনাল ইনস্‌পেক্টর হিসাবে কাজ করতে যেয়ে ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামের শিক্ষকদের তিনিই সংঘ গঠনে অনুপ্রাণিত করেন। এর ফলে চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষক গিল্ড নামে এক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম নেওয়া, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও স্বাস্থ্যকর সমাজজীবন লাভের লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি তিন বছর কাজ চালায়। মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুর্গামোহন গুহ এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সমসাময়িককালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় দত্ত হাই স্কুলের রেক্টর ও প্রধান শিক্ষক হেমদাকান্ত চৌধুরী শিক্ষক সমিতি তৈরীর প্রেরণায় অস্থির হয়ে উঠেন এবং উদ্দেশ্য সফল করতে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১৯ সালে সনাতন ধর্ম স্কুলে কাজ নিয়ে এ উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। একটা পত্রিকা প্রকাশ করে সমিতিকে শক্তিশালী করা তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বলা বাহুল্য বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের বেতন যৎসামান্য ছিল। আর এ সময়ে তাঁরা জীবনযাত্রা ও বেতনক্রমের নিম্ন পর্যায়ের জন্য ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক স্কুল উঠে যাচ্ছিল। এমন সময় নতুন কাউন্সিলে ভোটের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সাত বছরের গ্রাজুয়েটদের নাম নথিভুক্ত হওয়া শুরু হয়। গ্রাজুয়েটদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষক। ১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর তাদের এক সভা হয় কলকাতার ভারত সভা হলে। প্রখ্যাত দেশসেবী নির্মল চন্দ্র চন্দ্র সেখানে বক্তৃতা দেন। বাংলার গ্রাজুয়েটরা নিতান্ত নিম্ন সামাজিক পর্যায়ে রয়েছেন। এদের সকাল বিকাল প্রাইভেট পড়িয়ে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ একজন নরসুন্দর কিংবা একজন মুটে রোজগার করছে মাসে ৪০।৫০ টাকা। গ্রাজুয়েটদের অবস্থা পরিবর্তনের বিশেষতঃ শিক্ষকদের আয় বাড়ানোর ক্ষীণতম ভরসা নেই। দর্জিরা সমবেত হয়ে বর্ধিত মজুরীর দাবী করছে। কনডাক্টররা তাদের বেতন ও ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে—সভায় বক্তারা বিষয়গুলি তুলে ধরেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন থেকে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে অগ্রসর হতে বলা হয়। সারা দেশে সংগঠিত হবার প্রবল জোয়ার যখন দেখা দিয়েছে তখন স্বভাবতঃ বাংলার শিক্ষকেরা নিজেদের সমিতি গড়ার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করে নিলেন। এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলের গোপাল চক্রবর্তী, খেলাত চন্দ্র ইনস্টিটিউশনের সতীশ চন্দ্র বসু, মহম্মদ লায়েক ইনস্টিটিউশনের আল্লা নেওয়াজ, বৌবাজার হাইস্কুলের রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, জোড়াসাঁকো হাই স্কুলের পঞ্চানন পাল, শ্রীসনাতন ধর্ম স্কুলের সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাণী ভবানী স্কুলের বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সেণ্ট ম্যারী স্কুলের মনিমোহন চক্রবর্তী, বিশপস্‌ কলেজিয়েট স্কুলের সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯২১ সালের ৬ই মার্চ ২২ জন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে সমিতি গঠিত হলো। সংবাদ পরদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হলো। এদের নেতৃত্বে এলেন রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ। তিনি তখন

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। রায়সাহেব উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতি পরায়ণ, গ্রন্থকার এবং ত্যাগী মানুষ ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তি সমিতি উদ্বোধনের কাজ করেন। প্রথম থেকে পনেরো বছর তিনি সমিতির সভাপতি ছিলেন। শুরু থেকে সমিতির সরাসরি নেতৃত্বে ৩২ বছর যুক্ত ছিলেন ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। সম্পাদক কিংবা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই দীর্ঘ সময় এমনকি অবসরের দিনগুলিকেও তিনি নিজেকে সমিতির চলার সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছেন। এঁদের সহযোগী হলেন হেমদাকান্ত চৌধুরী। পত্রিকা প্রকাশ ও অন্যান্য কাজে প্রথম দশ বছর একান্তভাবে আত্মনিয়োগের পর মধ্যপ্রদেশে চলে যান। একজন ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবী হিসাবে সেখানেও জীবনের শেষ ৩৭ বছর অতিবাহিত করেছেন। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে রংপুর জেলার গাইবান্ধা শহরে সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মফঃস্বল শহর গাইবান্ধার চরিত্র উন্নত ছিল। ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে পৃথক স্বাধীন থানা ও খেলাফত কমিটি গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় নেতারা জেলা ও প্রাদেশিক স্তরে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতেন। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় থেকে তাঁরা শিক্ষক সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আহ্বানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইসলামিয়া হাই স্কুল ও তার প্রধান শিক্ষক রমেশ ভট্টাচার্যের অবদান এ ব্যাপারে স্বীকার্য। বিভিন্ন স্কুল থেকে একশত প্রতিনিধি গাইবান্ধা সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের উজ্জ্বল রত্ন ঋষিকল্প বলে তখনই খ্যাত শিক্ষাব্রতী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেদিন সম্মেলনে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এমন দিন আসবে যখন সমিতির সদস্য সংখ্যা পঁচিশ হাজার হবে তখন সমিতির শিক্ষা আন্দোলনের গতিপথে কোন বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিবন্ধকতা করতে পারবে না। সমসাময়িককালে অল বেঙ্গল হাই স্কুল টিচার্স এসোসিয়েশন সৃষ্টি হলে সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দুই ধারায় চলতে থাকে। একই উদ্দেশ্যে দুই সমিতি সৃষ্টি নিরর্থক বলে মনে হয়েছিল এবং তাদের একত্রীকরণ সহজে সম্পন্ন হলো। বিভিন্ন পদাধিকারী নির্বাচিত হলেন। প্রতি ডিভিশন থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৩ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হলো। সোসাইটী রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্টে সমিতি নিবন্ধীকৃত হলো। সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯২২ সালের ৫ ও ৬ই আগষ্ট কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে উৎসাহের সঙ্গে দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে শুরু হয়ে যায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

সমিতির প্রথম পঁচিশ বছর

স্থির ছিল সমিতি সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে অভাব অভিযোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয়তঃ এমন সংগঠন তৈরী করতে হবে যা শিক্ষকদের বাস্তব উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সমিতির আরও লক্ষ্য ধার্য করা হয় যে সমিতি শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নতি করার কাজ করবে এবং শিক্ষকতা বৃত্তির গুরুত্ব প্রকাশ করে সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জাগরিত করবে। এসময়ে বাংলায় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার। একজন প্রাথমিক শিক্ষক বেতন পেতেন সাড়ে ছয় টাকা। আর মাধ্যমিক শিক্ষকদের গড় বেতন ছিল ২৯ টাকা। তখন বাংলায় শিক্ষিতের হার বেশী ছিল। অথচ অন্য প্রদেশগুলিতে যেখানে বিদ্যালয় পিছু সরকারী ব্যয় ছিল ৭ থেকে ১২ হাজার টাকা সেখানে বাংলার প্রাদেশিক সরকার বরাদ্দ করতেন বছরে ৩২০ টাকা। স্কুলগুলি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ নিয়ন্ত্রণে চলতো। সমিতির প্রথম সম্মেলন থেকে

বেতনবৃদ্ধির দাবী শুরু হয়। ১৯২৫ সালে অর্থমন্ত্রী মিঃ ডোনাল্ড সর্বপ্রথম বেসরকারী স্কুলগুলির জন্য ৩ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করলেন। তাতে প্রবল আশার সঞ্চার হলো। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সকল দায়িত্ব পরিহার করে মুক্ত হতে চাইছিল। তাই "ডি-প্রভিন্সিয়ালাইজেশন" নামে এক অভিনব রীতি প্রবর্তন করে। এতে সরকারী স্কুলগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে। সমিতি এই নীতির প্রবল সমর্থক হয়। শিক্ষকেরা ভেবেছিলেন এভাবে সরকারী স্কুলের ব্যয় কমিয়ে এনে সরকার বে-সরকারী শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিকরণ করবে। ১৯২৭ সালে সরকারী বরাদ্দ আরও বাড়ে। সমিতি দাবী করে শিক্ষক বেতনের এক তৃতীয়াংশ সরকার থেকে দেওয়া হোক। তৃতীয় দশকে এসে সব ব্যবস্থাই সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। শিক্ষকদের সমস্ত আশা নস্যাৎ হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হতেই সরকার বে-সরকারী স্কুলগুলিও তুলে দিতে অগ্রসর হয়। নানা পরিকল্পনা এই খাতে চালনা করা হয়। এমন কি গভর্নর স্বয়ং লাটভবনে সভা ডাকেন। সেখানে বারো শত স্কুলের মধ্যে আটশত স্কুল তুলে দেবার প্রস্তাব তিনি নিজে করেন। সমিতিতে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ পায় এবং তখন ডি-প্রভিন্সিয়ালাইজেশনের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী মন্দা জনজীবনে এখানেও দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কমে যায় এবং ছাত্র বেতন আদায় হয় না। বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়ে। এর পর আবার ১৯৩৬ সাল থেকে সরকার সর্বক্ষেত্রে ১০ শতাংশ ব্যয়হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। নিদারুণ দুর্দিনে প্রতি বছর সম্মেলনে প্রতিকারের আবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নেতারা বরাবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে সাক্ষাত ও আবেদন নিবেদন পেশ করেন। অনুদান বৃদ্ধি ও রীতিনীতি পরিবর্তনের দাবীতে সম্মেলনগুলি সোচ্চার হতে থাকে। এর মধ্যে শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রচলন করা অবশ্য সম্ভবপর হয়েছিল। সমিতির দাবী অনুসারে এ ব্যাপারে সরকারী নীতি ঘোষিত হয় এবং অর্থ বরাদ্দ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সর্ত স্থির করে। আন্দোলনের ফলে সব স্কুলে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু হয় এবং তা থেকে প্রয়োজনে শিক্ষকদের ধার নেবার সুযোগ আসে।

সবসময়ই শিক্ষক সমিতির জ্বলন্ত সমস্যা ছিল শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা রক্ষার সমস্যা। শিক্ষকেরা পরিচালন কমিটির খামখেয়ালীর শিকার হতেন। বছরের পর বছর অন্যায়ভাবে বরখাস্ত হয়েছেন—লাঞ্ছিত হয়েছেন বহু শিক্ষক। বহু স্বনামধন্য শিক্ষক কর্তব্যচ্যুত না হয়েও আক্রমণে পড়েছেন। দশ থেকে তেইশ বছর চাকুরী করেও ছাঁটাই হয়েছেন। প্রথম থেকেই কলকাতার বড় বড় স্কুলে এ ঘটনা প্রতিকারের চেষ্টা সমিতি শুরু করে। বহু প্রচেষ্টার ফলে এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বের করানো হয়। তাতে বিষয়টির নির্মমতা প্রকাশ পায়। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছুটা দৃষ্টি দেন। সমিতিতে বর্ধিত সংখ্যায় ছাঁটাইয়ের ঘটনা আসতে থাকে। প্রতিরোধের কিছু লড়াই সফল হয়। এমনকি বরখাস্ত শিক্ষককে কাজে যোগদানে অস্বীকার করলে বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করানো যায়। এসব কাজে সমিতির জনপ্রিয়তা দ্রুত প্রসারিত হয়। উপরন্তু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় শিক্ষকদের জীবনজীবিকার প্রশ্নে কতকগুলি ইতিবাচক অধিকারবোধের প্রসংগ সামনে এসে যায়। এগুলি আদায়ের তৎপরতার মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা হয়। সমিতি প্রাথমিক পর্যায়ে দাবী করে (১) ছাঁটাইয়ের আগে সতর্কীকরণ করতে হবে (২) এ সংক্রান্ত বিরোধগুলি সালিশীতে নিতে হবে (৩) প্রতি ডিভিশনে সালিশীবোর্ড চাই (৪) পুনর্নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারের নির্দেশ অমান্য হলে স্কুলের অনুমোদন বাতিল

করতে এবং (৫) স্কুলকমিটিতে শিক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে। ক্রমান্বয়ে সালিশী সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করা হয় এবং এরূপ বোর্ডে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষক স্বার্থের উপযুক্ত ভূমিকায় সংগ্রাম পরিচালনার খাতিরে অল্প সময়ের মধ্যে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সুপরিচিত হয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা সরকার উভয়েই সমিতিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেন। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব সংগ্রামে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমর্থন পেতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ও সমিতিকে বরাবর সাহায্য করতে থাকে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার সামগ্রিক আইন রচনায় হাত দেন। স্কুল কোড নামে সুসংহত আইন প্রণীত হয়। কোডের খসড়া তৈরীর ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বিরাট ভূমিকা নেন। সমস্ত স্কুলগুলিকে ঐ কোডের আওতায় আনা এবং সালিশী বোর্ডের এলাকা বিস্তৃত করতে সমিতি লাগাতর চেষ্টা চালায়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ১৯২৮ সালে সিনেটে পাঁচজন মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচিত হবার সুযোগ আসে। ১৯৩০ সালে সরকারী নির্দেশ বের করা সম্ভব হয় যে, নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়োগপত্র দিতে হবে। পরবর্তী বছরগুলিতে টিচার্স কাউন্সিল গঠন, পরিচালন কমিটিতে শিক্ষকদের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে এবং ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সালিশীবোর্ডের আওতা সম্প্রসারণ, বরখাস্তের আগে শিক্ষাবিভাগের পূর্ব অনুমতি বাধ্যতামূলক করা এবং চাকুরীর নিরাপত্তার দাবীতে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক পথে বিপন্ন শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো সমিতির নৈমিত্তিক কাজ হিসাবে পরিণত হয়।

এছাড়া দুটি বৃহৎ সংগ্রাম চালিত করে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে নিজেকে সুপরিচিত করে তোলে। সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য স্বতন্ত্র "মধ্যশিক্ষা বোর্ড" গঠনের দাবী সমিতির দ্বারা শুরুতেই করা হয়েছিল। এসময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস নেতা হেমচন্দ্র নস্কর দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রশ্ন তোলেন। সরকার চিন্তা ভাবনা শুরু করলে সমিতি থেকে বোর্ড গঠনের মতামত তৈরী করা হয়। তারা বলেন এর স্বাতন্ত্র্য থাকবে, নির্বাচিত শিক্ষকেরা বেশী সংখ্যায় তার সদস্য হবেন, পদাধিকারীরা নির্বাচিত হবে এবং এটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হবে। ইতোমধ্যে সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার আসে। ছাত্রেরা পিকেটিং করে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেয়। বন্ধের বিরুদ্ধে সমিতি মন্তব্য জানায়। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের খাতে নিজস্ব কর্মধারা গঠনের অভিমত প্রকাশ করে। ১৯৩০ সালে বরিশালে বার্ষিক সম্মেলন শেষ হলে পৃথক এক সভা বসে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সে সভায় প্রখ্যাত শিক্ষকনেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও রায়সাহেব হরিদাস গোস্বামী প্রস্তাব তোলেন। প্রস্তাবে খাদি পরিধান, দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার, মাদক ও সিগারেট বর্জন করবার সিদ্ধান্ত হয়। অনুরূপ প্রস্তাব পরবর্তী বছরে নড়াইল সম্মেলনে নেওয়া হয়। সেখানে এগুলি ছাড়া শিক্ষকেরা স্বায়ত্তশাসনের নীতি, নাগরিকত্ব ও স্বাদেশিকতা প্রচারে অগ্রসর হোন বলা হয়। সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাস্থ্যকর চেতনাসৃষ্টি ও সহযোগিতার পরিসর তৈরী করবার আহ্বান দেওয়া হয়। এ সময়ে আইন অমান্যকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে শৃংখলা পত্তনের নামে ১৯-৬-৩০ তারিখে সরকার ক্ষতিকারক ও ছাত্রনির্যাতনের এক নির্দেশনামা জারী করে। সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদে অগ্রসর হয়। এর ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে এবং ঐ নির্দেশ কার্যকর করতে হলে শিক্ষকতাবৃত্তির মান ও ঐতিহ্য-বিরোধী কাজ করা হবে বলে সমিতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা জানায়। ১৯৩১ সালের ৩১শে আগষ্ট চট্টগ্রামের তিনটি স্কুলে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী দলবদ্ধভাবে ছাত্রদের উপর হামলা

করে। তাদের উপর সৈন্যরা গুলিও চালায়। সমিতি প্রতিবাদে গর্জে উঠে। বিদ্যালয়ে পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিকর্তার কাছে সমিতির নেতারা যান। নৃশংসতার বিরুদ্ধে ৯ই অক্টোবর প্রতি বিদ্যালয়ে বেলা বারোটার সময় তিন মিনিট নীরবতা পালিত হয়। ছাত্রশিক্ষকেরা বহু প্রতিবাদ সভা করে। উৎপীড়নের ঘটনাবলীর প্রতিকার না হওয়ায় সমিতি ইংল্যাণ্ডে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্স সংস্থার সাহায্য নেয়। সংস্থাটি সম্পূর্ণ বিষয়গুলি জেনে অস্থির হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ব্যাপারটি বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টে পৌঁছয়। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল শেষকালে বলেন, "ভারতবর্ষে যে হিংস্রতাবলের অতিরিক্ত প্রয়োগ বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রদের প্রতি দেখানো হয়েছে তাকে অনুমোদন করা হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটলে এই অননুমোদনকে কার্যকর করা হবে।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের খসড়া প্রস্তাব আনেন ১৯৩৬ সালে। তার আগে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে বোর্ড গঠিত হয়েছে। এদের সঙ্গে বৈপরীত্য রেখে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বোর্ড গঠনের সুপারিশ তারা করলেন। দুজন মাত্র প্রধান শিক্ষক সদস্য রেখে বোর্ডের অধিকাংশ পদে কর্মচারী ও মনোনীত ব্যক্তিদের রাখবার সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছিলেন, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এতে প্রচণ্ড আপত্তি জানায় এবং তার ভবিষ্যত কার্যধারা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। শোনা যায় নবগঠিত আইনসভার প্রথম অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপিত হবে। সমিতি থেকে তীব্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি বার্ষিক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন "চাই আজ দেশব্যাপী—সারা বাংলাময় তুমুল আন্দোলন। এ আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষকের আন্দোলন হইবে না। সমস্ত দেশবাসীকে এজন্য উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ একটি আন্দোলন জাগাইয়া তোলা কিছু কঠিন নহে! বারশত হাইস্কুল, দুই হাজার এম. ই. স্কুল এইরূপ আন্দোলনে এক একটি কেন্দ্র হইবে। প্রবল জনমত গঠন করিয়া আসুন আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই।" জনমত গঠনের কাজ শুরু হয় তারপর থেকে। ১৯৩৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর অ্যালবার্ট হলে মধ্যশিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সমিতির বিশেষ সম্মেলন ডাকা হয়। পাঁচশত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সমিতি নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন, সরকার ক্ষান্ত হোন। আর সভাপতির আসন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আহ্বান দিলেন "সারা দেশে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন।" শিক্ষার আন্দোলনে আগে থেকেই সমিতি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জীবিকার স্বার্থ ছাড়া শিক্ষা সংস্কারের বিভিন্ন দাবী—মাথা পিছু শিক্ষার ব্যয় বাড়ানো, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের আবশ্যকতাগুলি প্রচার করে। কয়েক বছর ধরে 'শিক্ষা সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হতে থাকে। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক দিবস পালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থান বোঝাতে ম্যাপ চার্ট পোষ্টার করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতে থাকে। পদস্থ সরকারী কর্মচারী, শিক্ষানুরাগী মানুষ এমন কি সপারিষদ গভর্নর সাহেবকেও একবার প্রদর্শনী দেখানো হলো। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা আইনের মধ্য দিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টির চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তাকে সমিতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে। অতীতেও মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী এসেছে এবং ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে। জীবনের সূচনাকাল থেকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ঐক্য বিরোধী মতলবের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতামত সোচ্চার করেছে। হিন্দু, মুসলিম লেখকদের ঐক্য সৃষ্টির লেখনীগুলি মুখপত্রে প্রকাশ করেছে, সমিতির মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঐক্যের ভাবধারাকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্র বিরোধী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রস্তাবিত আইন সংখ্যাগরিষ্ঠতার

জোরে যে কোন সময় পাশ হতে পারে। এই অবস্থায় একটা চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে এবারে সমিতি রুখে দাঁড়ালো। বস্তুতঃ দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগ্রাম তাদের আন্দোলনকে নির্ভয় করে তুলেছিল। এ সময়ে কয়েক বছর ধরে শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যায় সংগঠিত হতে থাকে। ডক, রেল, বস্ত্র ও চটকল শ্রমিকেরা লাগাতর ধর্মঘট ডাকে। সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও কৃষক সভার জন্ম হয়। কংগ্রেস নতুন পর্যায়ে আইন অমান্য শুরু করে। এ জন্য শিক্ষকদের পাশে জনমত স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষকদের আন্দোলনের কী পর্যায় ছিল তা সমিতির দলিলে স্পষ্ট হয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে খুলনা সম্মেলনের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে "ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করিলে শিক্ষার উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা শিক্ষক, আমাদের নিকট হিন্দু মুসলমান সব ছাত্র সমান এবং সমান স্নেহের পাত্র। শিক্ষা সম্পর্কে আমরা জাতি ও ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায় যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ না করে তজ্জন্য আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে এই আন্দোলনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি যে দেশব্যাপী প্রেরণা জাগাইয়াছে তাহাতেও শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট সমিতির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" ক্রমান্বয়ে শিক্ষাবিলের বিরুদ্ধে সমিতির আন্দোলন ১৯৪০ সালে জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয়। বড় বড় জমায়েত আর প্রতিবাদে সরকার সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ বছর ৬ই আগষ্ট অ্যালবার্ট হলে ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শত শত শিক্ষক উপস্থিত হলেন। প্রতিটি স্কুলে প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে বাংলার সর্বত্র বিষয়টি সমালোচিত হতে থাকল। সমিতির জেলা সংগঠনগুলির উদ্যোগে নানাস্থানে বিশেষ সভায় প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো। প্রস্তাবিত বিল মাধ্যমিক শিক্ষায় শুধু ক্ষতিকর নয় জাতীয়তা বিরোধী বলে খ্যাত হলো। এ বিষয়ে সমিতির বিশেষ সম্মেলন ২৪শে ডিসেম্বর আহূত হয়। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ডঃ মুখার্জী বাংলার মফস্বল শহরগুলিতেও সমিতির বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হলেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারাও ব্যাপক জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। কলকাতা শহরে ১৯৪১ সালেও বড় বড় সভা হলো। অবশেষে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থায় এ নিয়ে আর বিতর্ক নয় এই ভণিতায় সরকার বিল প্রত্যাখ্যান করে নিল।

ঘাত প্রতিঘাতে জাতির জীবনের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িয়ে ছিল শিক্ষক সমাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে যোগ দেয়। বাংলাদেশ 'বিপদজনক' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বোমাতঙ্কে কলকাতার স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি চরম খাদ্যাভাব দেখা যায়। ফলে এক বছরের মধ্যে ২৬ শত প্রাথমিক স্কুল, ৪২টি হাইস্কুল ও ৯৩টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাভাবে দুর্ভিক্ষে সমূহ এ বিপদে শিক্ষক সমাজ হতচকিত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে যথেষ্ট অনুদান দাও, শিক্ষকদের সাহায্য কর এই আর্ত চিৎকার উঠে, নেতৃত্ব কাতর আবেদন নিয়ে বার বার সরকারের কাছে যান। ইউরোপের দেশগুলিতে এমন কি বৃটেনে যুদ্ধ অবস্থায় শিক্ষাখাতে ব্যয় কমেনি এসব দৃষ্টান্ত দিলেও কোন কাজ হয় না। কিন্তু ১৯৪২ সালে শরৎকালে দুর্দশাগ্রস্থ কলকাতার শিক্ষকদের জন্য এককালীন ৭৫ টাকা থোক দেবার সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হয়। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরাসরি এই অংশগ্রহণ যেমন আকস্মিক তেমনি ঐতিহাসিক। ১৮১৩ সাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর্তব্য পালন না করে গ্রান্ট ইন এইড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এ থেকে সরকার পরিস্থিতির চাপে সরে আসতে বাধ্য হল। ঠিক তার পরে ১৯৪৩ সালে মার্চ মাসের বাঁকুড়া সম্মেলনে

দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে তাল রাখতে সরকার থেকে মহার্ঘভাতা দেওয়া হোক দাবী করা হলো। কয়েকটি জেলা সমিতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলো। আন্দোলনের ধাপ হিসেবে সে বছর ১লা আগস্ট "নিখিলবঙ্গ শিক্ষক দিবস" উদ্‌যাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। জেলা শাখাগুলির উৎসাহে সমস্ত স্কুলে কর্মসূচী পালিত হলো। জনসভা করে প্রচার চালানো হলো। সেদিন কলকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ করে সভায় আনা হলো। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ছাত্রাভাবে শিক্ষকদের মুমূর্ষু অবস্থা ব্যক্ত করে সমিতি সরকার ও গভর্নরের কাছে কাতরভাবে সাহায্যের আবেদন করলেন। গভর্নর প্রতিকারের আশ্বাস না দিয়ে শিক্ষকদের অযথা শিক্ষিত করতে চিঠি দিয়ে জানালেন "দুঃখিত, মন্ত্রীদের দায়িত্ব মহামান্য গভর্নরকে জানানো, একে অপরকে নয়।" সমিতির প্রচেষ্টা অবিরাম চললো। সে বছর ২০শে ডিসেম্বর আইন সভার সদস্যদের ডেকে অবস্থাটা ব্যক্ত করা হলো। অবশেষে ক্রমান্বয়ে সরকার দাবীগুলি বিবেচনার পর্যায়ে নিয়ে গেল। আশানিরাশার দ্বন্দ্বে সমিতির ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ১৯৪৪ সালের ৮ই এপ্রিল মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি হলেন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী তমিজউদ্দিন খান। মরুভূমিতে তেষ্টা নিবারণের আশায় উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে তিনি জানালেন সরকারের মহার্ঘভাতা দেবার কথা। মাসে জনপ্রতি পাঁচ টাকা। দুঃখ ব্যথায় সাশ্রুবাহী শিক্ষককুল নতুন দিনের স্বাগত জানাতে তাতে এখানেও অশ্রু-সজল হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধোত্তোর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হলো। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবৃদ্ধিতে শিক্ষকেরা আর দিনের নাগাল পান না। পরবর্তী বছর জুড়ে প্রতিদিন পরিস্থিতি শিক্ষকদের আতঙ্কিত করছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন কলকারখানা ও সংস্থার শ্রমিকেরাই শুধু নয় বাবু কর্মীরাও লড়াই করে মহার্ঘভাতার দাবী আদায় করছিল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৫ সালে কৃষ্ণনগরে সমিতির পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। অন্যান্য দাবীর সাথে উচ্চারিত হলো—নির্দিষ্ট বেতনক্রমের দাবী—প্রধান শিক্ষকদের ২০০ টাকা, সহশিক্ষকদের চাই ১৭৫ টাকা। বেশী সোচ্চার রিলিফের দাবী—মহার্ঘভাতা বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাহারের দাবীতে যে সুর উচ্চগ্রামে উঠেছিল তা থেকে অনেক নরম ও বিনীতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো যে নিশ্চয়ই সরকারের দ্বারস্থ হতে হবে। বিল প্রত্যাহারের কর্মসূচীতে সমিতির যে বিজয় সূচিত হয়েছিল তা ছিল নেতিবাচক। এর বিপরীত ইতিবাচক আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। তাই এত বড় সাফল্যের পর সদস্যেরা হতাশাতেই থেকে গেলেন। সমিতির কর্মসূচীতে নেতৃত্ব সমস্ত সদস্যের অংশ গ্রহণের কথা তাঁদের ভাবনার মধ্যে আনতে পারতেন না। তবু বিগতকালে তাঁরা যা দিয়েছিলেন তার মূল্য কম নয়। শিক্ষকদের যে সমস্ত অধিকার আয়ত্তে এসেছিল এবং ঐক্যবোধের মূল্য তাঁরা যে অনুভব করতেন সে যুগে তার মূল্য অসীম। যা হোক কৃষ্ণনগর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত রূপায়িত করতে '৪৫ সালের ২৯শে এপ্রিল ভারতসভা হলে দাবীপত্র পেশের জন্য উপস্থিত হলেন পাঁচশত শিক্ষক। সভা করে তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন। গভর্নরের কাছে উপস্থিত হলেন সভাপতি, অধ্যাপক হুমায়ন কবীর, কার্যকরী সভাপতি হরিদাস গোস্বামী এবং সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। ইংরেজ গভর্নর সব শুনলেন এবং জবাব দিলেন। প্রতিক্রিয়া কি—বাইরে এলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর এলো—'শুধু অরণ্যে রোদন'।

দুই

সংগ্রামশীল চেতনা

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সকল আভাস দেখা গেল ১৯৪৬ সালের শুরু থেকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের ঘন ঘন কথাবার্তা হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে। বছরের শুরুতে প্রবল ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের বিচার নিয়ে জনচিত্ত উদ্বেলিত। ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহ হলো। কলকাতা ও বোম্বাইয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের দাবীদাওয়ার আন্দোলনে উত্তাল। দেশ জুড়ে মাঝে মাঝেই রেল রোকো রাস্তা রোকো চলছে। উত্তেজক এই পটভূমিতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ২৪তম বার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে দিনাজপুর শহরে। বঙ্গভঙ্গ কালে বয়কট আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা শহরটি চেতনাসমৃদ্ধ। এখানকার শিক্ষকেরা সমিতিবদ্ধ হতে কিছু বিলম্ব করলেও পরিবর্তিত চিন্তার কয়েকটি কাজ করেছেন ইতোমধ্যে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতিতে বিভিন্ন স্তরের ও মতবাদের মানুষকে আনা হয়েছে। এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট পরিষদীয় রাজনীতি বিশারদ নিশীথনাথ কুণ্ডু। ২০শে এপ্রিল কবিশেখর কালিদাস রায় রচিত সংগীত গীত হয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন হলো। সেদিন সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (জাতীয় গ্রন্থাগার) অধ্যক্ষ জে-এম-কেনিথকর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত, দশগুণ মূল্যবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের মনে কিন্তু হতাশা ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তাঁদেরকে বরং উৎসাহিত করেছিল। বেতন প্রাপ্তির অভাবে, চাকুরীর সর্তাবলীর জন্য বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকেরা গুজরাট, আমেদাবাদ, বরোদায় লড়ছিলেন। বিহারের প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত সব স্তরের শিক্ষকদের ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এ সব সংবাদ প্রতিনিধিদের বরং উৎসাহিত করে রেখেছিল। সমিতির নেতৃত্ব বিগতকালে তাদের প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করলেন। সে বছর ২৮শে জানুয়ারী ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টারী প্রতিনিধিদল কি বলেছেন তাও বলা হল। দুশো বছর বৃটিশ শাসনে শিক্ষার হার ১২ শতাংশ দেখে, এবং ইংলণ্ডে একজন শিক্ষকের বেতন যখন ১১শত টাকা তখন ভারতে ১০ থেকে ২৫ টাকা বেতনের শিক্ষক দেখে তাঁরা অস্থির হয়েছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন—"জনসাধারণ এ সহ্য করে কি করে? এ নিয়ে আন্দোলন হয় না কেন?" অথচ শিক্ষকেরা সরকারী অনুকম্পার আশায় শেষবারেও গভর্নরকে আবেদন করেন গড়ে মাত্র দশটাকা বাড়ানো হোক। তাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সম্মেলনে সকল বক্তা সরকারী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের মনোভাব স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এলো যে নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করতে হবে যেদিন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হবে। সভাপতি ডঃ মেঘনাদ সাহা তাঁর ভাষণে বললেন, "আপনাদের সমিতি সংগঠনে আমার মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকেরা সামান্য চাঁদা দিয়ে আপনাদের সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে আসুন। স্থানীয় ও আঞ্চলিক কমিটি তৈরী করে পিরামিডের আকারে একটা সত্তার সৃষ্টি করুন। এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রতিকারের বিকল্প পথ না পেলে জোর ও কৃতসংকল্প নিয়ে সাধারণ

ধর্মঘট ডাকতে দ্বিধা করবে না। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মজীবী মানুষের জন্য সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত ব্যবস্থা। নেতৃত্ব সঠিক থাকলে সমষ্টিগত দাবী প্রতিষ্ঠা এবং আপস মীমাংসার সর্ত নির্ধারণে সদস্যদের জন্য শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক এক প্রতিষ্ঠান।" আলোচনা ও অনেক চিন্তাভাবনার পর সম্মেলনে আগামী দিনের কর্মসূচী নিরূপিত হলো। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য সম্মেলন নেতৃত্বকে নির্দেশ দিল। বোঝাপড়া ব্যর্থ হলে "সংগ্রাম পরিষদ"কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এমন কি শেষ অস্ত্র হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করবে বলে স্থির হলো। এ জন্য সম্মেলন থেকে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে আহ্বায়ক করে ১২ জন সদস্যদের মধ্যে থাকলেন ঢাকার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাবনার সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, মেদিনীপুরের শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, চাঁদপুরের সিদ্দিক রহমান, ফেনীর মণীন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী, কলকাতার কামিনীকুমার ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা শিক্ষক নেতারা। দিনাজপুর সম্মেলন শিক্ষক সংগ্রামকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাবার যে নির্দেশ দিয়েছিল তা ইতিপূর্বে কোন সম্মেলন মঞ্চে উচ্চারিত হয়নি। সেখানে যে পদক্ষেপগুলি পর্যায়ক্রমে গ্রহণের কথা ছিল তাকে মূল্য না দিয়ে কালক্ষেপ করা হলো মাত্র। মে ও জুন মাসে ওয়ার্কিং কমিটি আর কার্যকরী কমিটি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করলো। ধর্মঘটের দিন আগে স্থির হবে, না স্ট্রাইক ব্যালট নেওয়া হবে, এ নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। অথচ তখন নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৩ হাজার স্কুলের একলক্ষ সদস্য লড়াই করে মাসে দুটাকা বেতনবৃদ্ধি করেছে। বহু সভার পর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সংগ্রাম সম্পর্কে শিক্ষকদের মনোভাব যাচাই করতে স্কুলে স্কুলে প্রশ্নমালা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিল। স্কুলে পৌঁছবার আগেই দেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। ডিসেম্বর মাসে সংগ্রাম পরিষদের সভা ডাকা হলো। তার আগে পরবর্তী বছরের সাধারণ সম্মেলনের কর্মসূচী স্থির হয়ে গিয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করলেন, ধর্মঘটের ব্যাপারে উপযুক্ত সাড়া নেই। আবার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেবার কর্মসূচী নেওয়া হলো। ১৯৪৭ সালের প্রথমে বর্ধমানে সমিতির সম্মেলন বসলো। নির্দিষ্ট বেতনক্রমের প্রস্তাব নিয়ে এবং মহার্ঘভাতার দাবীতে প্রতিনিধিরা আবার সোচ্চার হলেন। দেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক গোলমাল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এর আগেই বিহারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকেরা যুক্ত আন্দোলন করে দাবীর অনেকাংশ আদায়ে সমর্থ হন। তাছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যায় তাঁদের আন্দোলন চলছিল। দিল্লীর ৩৫৫টি স্কুলের পাঁচ হাজার শিক্ষক ধর্মঘট করছিলেন। ছাত্ররা তাঁদের দাবীর পেছনে এসে জনসভা করে এবং স্লোগান তোলে "শিক্ষকদের দাবী মেনে নাও"। এই সব দৃষ্টান্ত রেখে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা এগিয়ে যাবার আওয়াজ দেন। সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে শিক্ষকদের সমঝোতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর কাজ যত কঠিন হোক প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট চালাতে হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে ৪৭-এর ১৫ই ও ১৬ই জুলাই প্রতীক ধর্মঘট পালিত হবে। সরকার তাঁদের দাবী না মিটালে শিক্ষকেরা ৩রা ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। সমিতির নেতৃত্ব নরম করে বললেন, ঘোষিত দু'দিনের প্রতীক ধর্মঘট নয়, অভিব্যক্তি। তাই এর মধ্য দিয়ে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। শিক্ষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কমিটির সমর্থন আদায়ের জন্যই এই সংগ্রাম। এ কারণে তাঁদের সঙ্গে সমিতির কোন বিরোধ নেই। মে মাস থেকে দেশ হস্তান্তর কাজে দারুণ তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। এ সম্পর্কে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে বিল উঠল। জুলাই মাসে প্রস্তাবিত প্রতীক ধর্মঘটের আগে সে বিলে বৃটিশ

রাজের স্বাক্ষর দেওয়া সম্পন্ন হলো। এলো পনেরই আগষ্ট। রাষ্ট্র বিভাজন সম্পর্কে ধারণা কারুর স্বচ্ছ হয়ে উঠেনি। পূর্ব বাংলায় তখনও সমিতির কাজ চলেছে। এমনকি পরবর্তী সম্মেলন মৈমনসিংহে হতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পশ্চিম-বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সমিতির তদানীন্তন নেতৃত্ব খুশী হলেন এই ভেবে ডাঃ রায় এক সময় সমিতির প্রতিনিধি হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষকদের অবস্থা বিবেচনা করছিলেন। বোম্বাই সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এ সময়ে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মাধ্যমিক শিক্ষকদের অন্যূন ১০০ টাকা বেতনের সুপারিশ জানিয়েছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস থেকে শিক্ষা-মন্ত্রীর নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা আইন নিয়ে কাজ শুরু হলো। এতে শিক্ষকদের দুর্ভাবনা কাটলো না। তাঁরা এই মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হতে সচেষ্ট হলেন। ১৯৪৬ সাল থেকে শিক্ষকদের জঙ্গী মনোভাব সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত উপলব্ধি করে আসছিলেন। চাপে পড়ে তিনি আর কয়েকজন কর্মকর্তা ২২শে আগষ্ট,১৯৪৮-এর কনভেনশন আহ্বানের প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করলেন। ২০শে আগষ্ট স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় নিজস্ব সংবাদদাতা যে সংবাদ পরিবেশন করলেন তাতে সবার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বেতনহারের অন্তবর্তীকালীন পুনর্গঠন করছেন। প্রধান শিক্ষকদের বেতনক্রমের জন্য তিন ধরনের বিদ্যালয় করা হবে। ঐ শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষকেরা ভাতা পাবেন ২০ থেকে ৫০ টাকা। তাঁরা এবং সহকারী শিক্ষকেরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পাবেন। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা পাবেন ৫০-৮০ টাকা। গ্রাজুয়েট ৬০-১০০ টাকা এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট ৭৫-১০০ টাকা। একজন এম-এ বা এম-এস-সি শুরুতে পাবেন ৯০ টাকা। আর সেই সঙ্গে প্রকাশিত হলো ছাত্র বেতন বৃদ্ধির কথা। মফস্বল গ্রাম, মফস্বল শহর আর কলকাতার জন্য তিন রকম ছাত্র বেতন বর্ধিত হারে দিতে হবে। বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ আর ঢালাওভাবে নয়, সীমিত আকারেই দেওয়া হবে।

সংবাদে বিচলিত শিক্ষকেরা। তাঁরা ভারত সভা হলে উপস্থিত। উত্তেজিত হবার মত মানসিকতা নিয়েও তাঁরা শান্ত ও সংযত। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা সে পরিচয় বক্তব্যে ও সিদ্ধান্তে দিচ্ছিলেন। এটা 'শিশু রাষ্ট্রের' বিনাশের জন্য নয়, সরকারের বিবেকের কাছে তাঁদের সুবিবেচনার জন্য আবেদন। তাঁরা জানতেন সংগ্রামের এই প্রথম মঞ্চ থেকে তাঁদের দূরে, অনেক দূরে এগিয়ে যেতে হবে।

সংগ্রামের প্রথম মঞ্চ

১৯৪৮ সালের ২২শে আগষ্ট রবিবার। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কনভেনশনে আটশত শিক্ষক ও কিছু ছাত্র সমবেত হয়েছে বেলা ১টায় ভারত সভা হলে। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি বিজড়িত ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল। কলকাতার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সংযোগস্থলে সুদৃশ্য বিরাট সভা কক্ষ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং প্রগতিশীল আন্দোলনে ঐতিহাসিক সভাগুলির স্থান হিসাবে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবহনকারী সভাস্থল। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং কয়েকজন কর্মকর্তার আহ্বানে সভা আয়োজিত।

কনভেনশনে পৌরোহিত্য করবার জন্য চেতলা বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম ঘোষিত হলো। তিনি শুধু কলকাতার এক বড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কলকাতা জেলা শাখার বড় নেতা। শিক্ষকদের সংগঠিত করতে একটানা প্রয়াস নিয়ে চলছেন। সমিতির সভা অনুষ্ঠানের জন্য নিজের স্কুল ও নিজস্ব অর্থ ব্যবহার করছেন।

কনভেনশনে সমস্ত অবস্থাটা তুলে ধরা হলো। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকার বরাদ্দ করেছেন ১৩ লক্ষ টাকা। এই অর্থে শিক্ষকদের বেতন নিতান্ত অপ্রতুলভাবে দেওয়া যাবে। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৩ শতাংশ, বোম্বাই সরকার ১৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছে। বাংলাদেশের লীগ সরকার ১১ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতো। অথচ বর্তমান প্রাদেশিক সরকার মাত্র ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রস্তাব রেখেছেন। অতীব দুঃখজনক এই ঘটনার অবসান হোক। শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হোক। সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে প্রাদেশিক সরকারই রাজস্বের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাঁচবার মত বেতন না দিলে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার কথা অমূলক। মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী উন্নীতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভরতুকী লাভের আবেদন করা হোক। এই সব দাবীগুলি সেখানে উপস্থিত হয়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবিত বেতনক্রম সম্পর্কে সভায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেতনক্রম এবং সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের যে বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় বলা হয় শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটবে যদি না শিক্ষকেরা জীবনধারণের উপযোগী বেতন পান।

কনভেনশনে আলোচ্য বিষয় দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করতে বিশিষ্ট ভূমিকা প্রদান করলেন কালীধন ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়। তিনি তখন কলকাতা জেলা সমিতির প্রধান নেতা। মৈমনসিংহ জেলার মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন একজন ব্যবহারজীবী। ছাত্রজীবনে একজন সফল খেলোয়াড় এবং সমাজসেবী রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে আনন্দমোহন কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে বি. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে এম. এ. এবং বি. টি. পাশ করলেন। কিছুকাল আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাপ্ত উচ্চ সরকারী কর্মচারী পদের প্রলোভন ত্যাগ করে শিক্ষকতা শুরু করলেন চট্টগ্রামের এক স্কুলে। বৃটিশ রাজ দ্বারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দায়ে চট্টগ্রামের শহর ও গ্রাম তখন অত্যাচারে জর্জরিত। শুধু পুলিশ নয় মিলিটারী দিয়ে সাধারণ মানুষকে দমন করা হচ্ছে। বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এই সন্দেহে দুজন ছাত্রকে তল্লাসী করতে তাঁর স্কুলে কয়েকজন গোরা সৈন্য হঠাৎ ঢুকে পড়লো। শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নষ্টের এই ঘটনায় সত্যপ্রিয় রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। প্রতিবাদে গর্জে উঠে তিনি অবশেষে ওদের তাড়া করলেন। গোরা সৈন্যেরা ভয়ে পালিয়ে গেল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ও সত্যপ্রিয় রায়ের নিরাপত্তার প্রশ্নে কিন্তু আশঙ্কিত হলো। বহু চেষ্টায় আত্মীয়স্বজন দিয়ে বুঝিয়ে তাঁকে চট্টগ্রাম ত্যাগে বাধ্য করা হলো। সেখান থেকে কলকাতায়, আবার শিক্ষকতা। ১৯৩৬ সালে বিদ্যালয় গঠনের কাজে নিযুক্ত হলেন দক্ষিণ কলকাতায় কালীধন ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক হয়ে। তিনি অসাধারণ উদ্যোগী ছিলেন। খেলাধুলা, ছাত্রদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও কঠোর শাসন, ক্লাসে বিদ্যাদানে নিপুণ কৌশলের জন্য তাঁকে ঘিরে ঐ বিদ্যায়তন সত্বর খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে প্রকাশ পেত। সহকর্মীরা যেন বিরাট বটবৃক্ষতলে কাল কাটাতেন। তাঁদের সঙ্গে সত্যপ্রিয় রায়ের ছিল একান্ত মেলামেশা। স্বল্প বেতনের সহকর্মীদের

প্রতি ভালবাসার টানে একদিন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সভায় যোগ দিলেন। অতি সহজেই নিজের অজান্তে সেখানকার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে ফেললেন। বুঝলেন সহকর্মীদের প্রতি ভালবাসা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিসে এবং এর জন্য তাঁকেও সংগ্রাম চালাতে হবে। ক্রমশঃ স্কুল গঠনের সংগ্রামের সঙ্গে তিনি সমিতি গঠনের সংগ্রামকে একীভূত করে ফেললেন। তাঁর আদর্শ ছিল, জীবনই সংগ্রাম। তিনি যখন উপলব্ধি করতেন যে কাজ করা দরকার তাঁর জন্য ব্যগ্রতার অভাব দেখাতেন না। এই কারণে শিক্ষকেরা তাঁকে প্রথমে দক্ষিণ কলকাতা মহকুমা সমিতি তারপর কলকাতা জেলা সমিতিতে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করলো। তিনি হলেন কলকাতা জেলা সমিতির সম্পাদক। অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে কোন রফা করা তাঁর জীবনে কোনদিন ঘটেনি। অন্যায় ক্ষেত্রটিকে সিংহের গর্জনে প্রকম্পিত করতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। এর সূত্রপাত ছাত্রজীবন থেকে তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। এই সত্যের জন্য লড়াই শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলতে চেষ্টা শুরু করেছেন তখন। সেদিনের সম্মেলন প্রসঙ্গে সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গোলোকপতি রায় উল্লেখ করেছেন "শিক্ষকদের চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্বেও ভারত সভা ভবনে শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনেই কমরেড সত্যপ্রিয় রায়কে আমি প্রথম দেখি। সেদিনের সভায় এই প্রস্তাবকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন কমরেড সত্যপ্রিয় রায়। তাঁর সেদিনের সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে আমরা উপলব্ধি করলাম যে পুরানো নেতৃত্বের বদলে শিক্ষক সমাজকে সঠিকভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা এই মানুষটির আছে।" নেতাজীর বামপন্থায় বিশ্বাসী মুর্শিদাবাদ জেলার গোলোকপতি রায় কলকাতায় বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এম.এ., বি.টি., পাশ করে সাংবাদিকতা বৃত্তি ত্যাগ করে তখন শিক্ষকতা জীবন শুরু করেছেন। তাঁর এবং বহু জনের প্রত্যাশার উপযুক্ত মূল্য সত্যপ্রিয় রায় পরবর্তীকালে দিতে পেরেছিলেন। সমিতিকে গণতন্ত্র এবং আন্দোলন নির্ভর করতে তাঁর সংগ্রাম অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। আধুনিক চিন্তায় তিনি ক্রমশঃ বেশী বেশী করে শিক্ষকদের উদ্‌ভাসিত করলেন। তাঁর চিন্তার আলোকে শিক্ষক সমাজ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করলো। তাই তাঁকে সমিতির "সংগ্রামী রূপকার" বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। শিক্ষকদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সম্যক পরিচয় ছিল। একে একটু একটু করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবার স্বার্থে ১৯৪৮-এর প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে আখ্যা দিলেন ধর্মঘট শব্দে নয়। তাকে পরিবর্তিত করলেন 'কর্ম বিরতি' বা ইংরাজীতে 'সীজ ওয়ার্ক'-এ।

সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করলেন কমলা গার্লস স্কুলের শ্রীমতি সুধা রায়। লেবার পার্টির রাজনৈতিক কর্মী এবং শিক্ষক সমিতির বিশিষ্ট নেত্রী হিসাবে তিনি পরিচিত হয়ে আছেন। প্রস্তাবটি সংক্ষেপে—

১। গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেতন নিতান্ত কম এবং জীবনধারণের উপযুক্ত নয়। এর চাইতে উচ্চ বেতন অনেক বে-সরকারী বিদ্যালয় দিয়ে আসছে। কনভেনশন আশা করে, সরকার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে বেতনক্রম সংশোধন করবেন।

২। সরকার শিক্ষাখাতে স্বল্প ব্যয় করে দেশের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের কাজের সঙ্গে বৈপরীত্য করছে। শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৩। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে যে বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে সরকারকে সেটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৪। সরকার মহার্ঘভাতা হিসাবে শিক্ষকদের ৫ টাকা ও অশিক্ষকদের ৩ টাকা বরাদ্দ

করেছেন। অনেক স্কুলের শিক্ষক ও কর্মীরা এর চেয়ে বেশী টাকা মহার্ঘভাতা হিসেবে পেয়ে থাকে। এই ভাতা বাড়ানো হোক্।

৫। দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কলকাতার ৪ জন এবং প্রতি জেলা থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে।

৬। সরকার এই দাবীগুলি সত্বর মান্য না করলে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি হবে।

প্রস্তাবের সমর্থনে উঠে দাঁড়ালেন কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমীর শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায় এম.এ., বি.টি.,। শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকের পদ ছেড়ে ১৯৪৩ সালেই এই স্কুলে তিনি যোগ দিয়েছেন। সাম্যবাদী মনোভাব থাকবার জন্য ইতিমধ্যে কিছু অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে এবং সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি। তাই তাঁকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে এগিয়ে এলেন শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী। তিনি সেদিন উদ্যোক্তা মাত্র। যশোর জেলার এক রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা হচ্ছেন সরকারী উকিল। ১৯৩২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঐ জেলায় তিনিই মহিলাদের মধ্যে প্রথম ঐ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সেখান থেকে হোস্টেলে বাস করে কলকাতা কলেজে পড়াশুনা চললো। হোস্টেলে প্রখ্যাত মহিলা নেত্রীদের আনাগোনা হোত। এইভাবে লীলা রায়, রেণুকা বসু, মণিকুন্তলা সেন, মীরা দত্তগুপ্তের সঙ্গে পরিচিতা হন। ছাত্রাবস্থায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। দেশে গিয়ে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী সভার সভাপতিত্বও করেছেন। সক্রিয় রাজনীতিতে নামলেন এম.এ. পাশ করবার পর। '৩৯ সালে যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস শুরু হয়েছে তখন তিনি রিলিফের কাজে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে বেলতলা গার্লস স্কুলে সহকারী শিক্ষিকাপদে যোগ দিলেন। সেই সময় থেকেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা সেন ছিলেন সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি অনিলা দেবীকে সমিতির সদস্য করলেন। কিন্তু তিনি সমিতিতে কোন যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন না কারণ কলকাতার মহিলাদের মধ্যে পার্টির কাজের বিরাট দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক সমিতির কর্মীরা বিকেলে প্রতিদিন কালীধন ইনস্টিটিউশনে সবাই সমবেত হতেন। '৪৭ সালে একদিন সুধা রায়ের আহ্বানে অনিলা দেবী সেখানে উপস্থিত হলেন। মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে আলোচনায় অনিলা দেবী তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলেন। মুগ্ধ হয়ে সুধা রায় ও সত্যপ্রিয় রায় তাঁকে সমিতিতেও কাজ করতে আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি কনভেনশনে এসেছিলেন। এর পরে শুরু হলো তাঁর সমিতি জীবন। এ জীবন একটানা ৪০ বছর অতিক্রম করে আজও অব্যাহত, সে যাত্রা অবিরাম চলছে। সমিতির সংগ্রামের পথে তাঁর চলার আওয়াজ ঝংকার দেয়। সমিতির কাজে তাঁর অন্তর্ভুক্তি শিক্ষক সমাজকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল প্রথম থেকেই। অত্যন্ত মর্মস্থল থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষকদের অবস্থা ও অবস্থানটা নজরে আনতেন। দেখা সত্যগুলি প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তির সাহায্যে উপযুক্ত প্রয়োগ করতেন। সঠিক বিশ্লেষণে ভাষার অমোঘ শক্তি দিয়ে আবেগে ও জ্বালাময়ী ভাষণে শিক্ষকদের উদ্‌বোধিত করতেন সর্বত্র। খুব দ্রুত সহকর্মীরা তাঁকে বীরাঙ্গনার মর্যাদায় ভূষিত করলো। শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় শিক্ষকরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন "বাংলার লক্ষ্মীবাঈ"। তাঁর মত সাধারণভাবে আর এক মহিলা কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন যিনি সংগ্রামের মঞ্চ থেকে সমিতির বিশিষ্ট নেত্রী হিসাবে পরিচিতা। ইনি শ্রীমতী মীরা সেন (চ্যাটার্জী)। দার্জিলিং-এ ছাত্রী অবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সেখান থেকে কলকাতায় এসে এম. এ. পাশ করবার আগেই উত্তর কলকাতা বীণাপাণি পর্দা স্কুলে সবে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্য দিয়ে নারীদের মধ্যে কাজ হতো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। ঐ সমিতি কর্মরতা মহিলাদের সমস্যা নিয়ে এ সময় বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করছিল। কনভেনশনে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

সভাপতির ভাষণে শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এই প্রতিবাদ সভা বা একদিনের কর্মবিরতি জাতীয় সরকারকে বিব্রত করবার লক্ষ্য নিয়ে করা হচ্ছে না। নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে এই কর্মসূচী গ্রহণে শিক্ষকেরা বাধ্য হয়েছেন। বে-সরকারী বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষকদের অসহায় ও অবহেলিত অবস্থা জনসাধারণের কাছে ও কর্তৃপক্ষের দরবারে উপস্থিত করবার জন্যই এই কার্যক্রম। তিনি পুনঃ পুনঃ এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে সংবাদপত্রগুলি শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি প্রচার করছে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করে বলেন ঐ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে সরকারী প্রেস-বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে সরকার শাসানিও দিয়েছে। যে সমস্ত বিদ্যালয় ধর্মঘটে অংশ নেবে তারা অখুশীর পাত্র হবে বলা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সরকার সংকীর্ণ মনোভাব পরিহার করে শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে আন্তরিকতার পরিচয় দেবেন এবং সহানুভূতিশীল হবেন। বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকদের শাস্তিদানের পরিবর্তে সরকার ক্ষোভের কারণগুলি খুঁজে দেখুন এবং দূর করুন। শিক্ষকেরা খাদ্য চান, আর কিছু নয়। তাঁদের খাদ্য দেওয়া হোক।

ঐতিহাসিক কর্মবিরতি

শিক্ষকেরা অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে ঐকমত্য হয়ে এক দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর এক সপ্তাহের মাথায় ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কঠিন এক সংগ্রামের আহ্বান দিলেন। বিষয়গুলি বিস্ময়কর মনে হবে না যদি আমরা ঐ সময়কালকে পর্যালোচনা করি। ১৯৪১ সালে হিটলারের দস্যুবাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়ন-এর উপর আক্রমণ করলে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে মানসিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংস্থা তৈরী হয়। আগে চালের দর ছিল ৪।৫ টাকা প্রতি মণ। ইংরেজ সরকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলায় চোরাকারবারী ও মজুতদারী প্রকট হয়ে উঠলো। ১৯৪২-৪৩ সাল। চালের দাম হলো ২৮ টাকা মণ। মহিলারা লঙ্গরখানা খুলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের খাওয়াতে শুরু করে। রেশনের দাবী এবং নারী শিশুদের জন্য খাদ্য বস্ত্র আদায় করা, আশ্রয় কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র এমন কি শিক্ষা কেন্দ্র খুলে এদের সাহায্য করতে মহিলারা এগিয়ে আসেন। প্রত্যেক জেলায় কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে খাদ্যের দাবীতে স্বাক্ষর সংগ্রহ, মজুত উদ্ধার ও বড় বড় জমায়েত হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে '৪৫-এর মাঝামাঝি সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে চলে বন্দীমুক্তি আন্দোলন। '৪৫-এর মে মাসে লাল ফৌজের মহান বিজয় হলো। বিশ্বত্রাস হিটলার সমাজতান্ত্রিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। শুধু বিস্ময়ে নয় সমাজতন্ত্রী শক্তির প্রতি প্রবল বিশ্বাস তাতে স্থাপিত হলো। তার দু-বছর আগে থেকেই বিরাট শ্রমিক আন্দোলন এখানে শুরু হয়েছে। মহার্ঘভাতা বাড়াবার দাবীতে সামিল হয়েছে বাংলার আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক। লক্ষাধিক সুতাকল শ্রমিক, রেল, ট্রাম, বাস, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শ্রমিক। কৃষক আন্দোলনে এসেছে জোয়ার। সারা বাংলায় কৃষকের সভা, সমাবেশ, হাটতোলা, তোলাগণ্ডী আন্দোলন। '৪৬

সালে বিস্ফোরণ ঘটলো তে-ভাগা আন্দোলনে। "আন্দোলন হল অল্প বিস্তর পরিমাণে ১৫টি জেলায়, সমিতি (কৃষক সমিতি) হিসাবে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক জড়িত হল এই আন্দোলনে।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে যে যাই বলুক, তেভাগার দাবীর বিরুদ্ধে কারো কোন বক্তব্য শোনা যায়নি।" † ১০ ঠিক এ সময়ে "......কলকাতা আই-এন-এ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি দিবস, নভেম্বর) কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক শক্তি উত্তাল অভিযানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরই বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ ও তার পিছনে ব্যাপক জন সমর্থন এদেশের বৃটিশ শক্তিকে মূলে ধরে টান দিয়েছিল।" † ১১

"এর কিছু পরেই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকদের একটি শক্তিশালী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এখনও মনে পড়ে। সেই ধর্মঘটে লালবাজার ও লালমুখো ইংরেজদের প্রায় ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতো অবস্থা হয়েছিল। সারা ভারত ডাক ও তার কর্মীরা তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেন। তারই সমর্থনে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়। দিনটা ছিল '৪৬ সনের ২৯শে জুলাই।" "১৯৪৬ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৪৭ সালের পুরো বছরটি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার বছর। ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশের চক্রান্তে চলছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। শান্তি-বাহিনী ও শান্তি সেনাদের কর্ম তৎপরতার বিরাম নেই। সারা ভারত জুড়ে চলেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষার কাজ। বাংলা দেশে বারে বারে প্রচণ্ড দাঙ্গা চলতে থাকায় শান্তি সেনার কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু শান্তি সেনা ও শান্তি বাহিনীতে যোগ দেয় সমস্ত দলমতের মানুষ।

জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের শান্তি মিছিল প্রতি সপ্তাহে জেলায় জেলায় বিশেষতঃ কলকাতায় সংগঠিত হতে থাকে। কলকাতার শান্তি মিছিলের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল।" † ১২

এই সংগ্রামগুলির শিক্ষা শিক্ষকেরা বহন করছিলেন। দেশবিভাগ হয়েছে। কিন্তু তার তাৎক্ষণিক কোন প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেনি। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক শাসনে কংগ্রেস সরকার।

"কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় এলো। যে কংগ্রেস শিক্ষাকে জাতীয় রূপ দেবার নীতি গ্রহণ করেছিল, শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অঙ্গীকার করেছিল, উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো পাল্টে জাতীয় কাঠামো জাতীয়তাবোধ সমৃদ্ধ পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবিষয় নির্ধারণের কথা বলেছিল, দেশ স্বাধীন হবার পরে কিন্তু সে কংগ্রেসের মতটা উল্টে যেতে লাগলো। শিক্ষার সাথে জড়িত যে মানুষরা—যাঁদের উপজীবিকা শিক্ষা তাঁদের পেশাগত উন্নতির জন্য কংগ্রেসী শাসকেরা কোনোরূপ অগ্রসর হলেন না। এটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এ বিষয়ে যে ভাবা দরকার, তাই তাঁদের মনে হলো না। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এবং স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে এই প্রদেশের মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরাজ শাসকদের ঘেষা মন্ত্রীসভা যেভাবে ভাবতো, শিক্ষাকে যে দৃষ্টিতে দেখতো, যেভাবে উপেক্ষা করতো, কংগ্রেসী শাসকরা তার চেয়ে অন্য কিছু করলেন না।" শিক্ষক প্রতিনিধিরা এই সব ভাবনা থেকে কঠিন, তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল—১লা সেপ্টেম্বর প্রতীক কর্মবিরতি সফল হোক।

সত্যপ্রিয় রায়, সুধা রায়, হীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ নেতাদের নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। আরও উপযুক্ত সহকর্মী তাঁরা পেয়ে গেলেন। সমিতির প্রাচীন নেতৃত্ব তাঁদের পদাধিকার থেকে রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করলেন। উত্তেজনাপূর্ণ কোন কিছু হলেই তাঁদের মনে গেল গেল রব উঠে যেতো। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৯শে আগষ্ট সমিতি

অফিসে সভা বসালেন। প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে সভা ভেঙ্গে গেল। তবু তাঁরা থামলেন না। শিক্ষক সম্মেলন বা সংগ্রাম পরিষদের সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। এই সম্মেলন বার্ষিক বা বিশেষ সম্মেলন নয়, এমন কি ⅓ অংশ সদস্যদের আহ্বানেও হয়নি। যে পদাধিকারীরা সম্মেলন ডেকেছিলেন তাঁরা কেউই ধর্মঘট কিংবা সংগ্রাম পরিষদের সমর্থক নন। দু-এক পদাধিকারী ব্যক্তিগতভাবে সেখানে যোগ দেন। কাজেই ঐ সম্মেলন সিদ্ধ নয়। এই প্রস্তাবের অনুমোদন সমিতি দিতে পারে না। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এ-বি-টি-এর সিদ্ধান্ত বলা চলবে না, সমিতি নেতৃত্ব এই অভিমত প্রকাশ করলো অসংকোচে। কলকাতা জেলা সমিতির নেতৃত্বে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে কর্মবিরতি সফল করবার কাজ এগিয়ে চললো। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায়ও কিছু যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। কর্মবিরতি আদৌ সফল না হয় তার জন্য সরকারী লক্ষ্য স্থির ছিল। সাহায্য কেটে নেওয়া হবে এই ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের পরিচালন কমিটির সমর্থনচ্যুত করা হলো। কমিটিগুলিও শিক্ষকদের নিবৃত্ত করতে চায়। তবু কর্মীদের মধ্যে ছিল জঙ্গী মনোভাব ও তৎপরতা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অলক্ষ্যে থেকে এই কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রিকতা রক্ষায় এগিয়ে এলো। তাদের সমর্থক দরদী বন্ধুরাও প্রচারকের ভূমিকায় থাকলেন। মহিলা সমিতি এবং ছাত্রেরা দলবদ্ধভাবে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ালেন। বিদ্যালয়গুলিতে পিকেটিং-এ তাঁরা উপস্থিত থাকলেন। কর্মবিরতির দিন পুলিশ ছিল বেজায় তৎপর। স্কুলের সামনে পুলিশ বাহিনী ছিল। মহিলা পিকেটারদের অস্থির করে তুলতে ঘোড়সওয়ার পুলিশ নামানো হয়েছিল। সরকারের ভীতি প্রদর্শন ও দমনমূলক কার্যক্রম, প্রাচীন নেতৃত্বের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের ভবিষ্যতকে হাতের মুঠোয় নিয়ে শিক্ষকেরা ১লা সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি সর্বাত্মক ও সফল করে তুললেন। অনেক ভাবনা সংকটের মধ্য দিয়ে সেদিন যাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন বিকেল তাঁদের কাছে মনে হলো যেন বিপ্লবের পরের দিন। সেই আনন্দে দলবদ্ধভাবে জমায়েতের উদ্দেশ্যে সকলে পা ফেললেন। কর্মবিরতির সংবাদ পর দিন (২রা সেপ্টেম্বর '৪৮) স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা চিত্রসহ প্রকাশ করেছিল, তার হুবহু অনুবাদঃ—

"বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রতীক ধর্মঘট

নতুন বেতনক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

(স্টাফ্‌ রিপোর্টার প্রদত্ত)

কলকাতার ৫০ শতাংশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গতকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত বেতন-ক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এক প্রতীক ধর্মঘট করেন।

বেশ কিছু ধর্মঘটী নন এমন শিক্ষক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু কতকক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্র অবস্থানকারীদের দ্বারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশে নিবৃত্ত হন।

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষকেরা উপস্থিত হন সেখানেও বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল বলে ক্লাশ হতে পারেনি।

সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই।

নগরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রী সহ ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়। তারা এক সভা করে শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও বিদ্যালয়গুলির জন্য অধিকতর অর্থ দাবী করে এবং ছাত্র বেতন হ্রাস করতে বক্তব্য রাখে।

অপরাহ্ণে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শ্রীযুক্ত এস. ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে শিক্ষকদের এক সভা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এই প্রতীক ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়। শিক্ষকদের জীবন-

ধারণ ও কাজের 'দুরবস্থা' সম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারকে জ্ঞাত করতে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বলা হয়। এই ধর্মঘটের লক্ষ্য সরকার কিংবা সংশিলষ্ট বিদ্যালয় পরিচালক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়।"

নিঃসন্দেহে এত বড় সংগ্রামের জন্য উদ্যোক্তা শিক্ষকদের কিছু মূল্য দিতে হয়েছিল। স্কুল কমিটি তাঁদের বিরুদ্ধে বহুকাল আলোচনা চালিয়েছিলেন। ভীত সহকর্মীরাও কিছু দিনের জন্য তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে। যাঁরা কর্মবিরতির প্রস্তাব আগেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সভায় পাশ করিয়েছিলেন তাঁরা একটু ভাল অবস্থানে থাকলেন। কলকাতার জেলা শাখার নেতৃস্থানীয় কর্মী অজিত প্রসাদ দাস কেশব একাডেমী থেকে এ জন্য ছাঁটাই হলেন। পরের বছর সত্যপ্রিয় রায় তাঁকে নিজের বিদ্যালয়ে নিয়ে এলেন।

ক্ষয়ক্ষতির সামান্য আঘাত মিলিয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যেই। কিন্তু এই সংগ্রাম শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছিল একটা প্রেরণা। শিক্ষকেরা তারপর থেকেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠেন। আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাচীন নেতৃত্বের বাধা কাটিয়ে তুলতে হবে স্পষ্টই বুঝতে পারেন। বিকল্প নেতৃত্ব কি হতে পারে তার পরিচয় তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। এক সংগঠিত কর্মী বাহিনীকে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে ছাত্ররা স্কুলে সেদিন ধর্মঘট করে। হাতে ফেস্টুন নিয়ে লম্বা ব্যানারের নীচে মিছিলে এগিয়ে চলে। কলকাতার রাজপথে দু'বছর পরে আবার সেই কচি মুখগুলি এগিয়ে চলেছে দেখা গেল। আর অভূতপূর্বভাবে শিক্ষক সমাজের সংগে শ্রমিক শ্রেণীর সমন্বয় ঘটলো। নীচের উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়—

"১৯৪৮ সালের একদিনের প্রতীক কর্মবিরতির প্রস্তুতি পর্বে এক শিক্ষক সভায় আজকের সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী প্রস্তাব করেছিলেন কর্মবিরতির প্রস্তুতির জন্য পোষ্টার দেওয়া হোক। সত্যপ্রিয় রায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন পোষ্টার তো মজুরদের। অনিলা দেবী উত্তর দিয়েছিলেন—যে ভাবেই বলুন কর্মবিরতি ধর্মঘটই। ধর্মঘট মজুরেরা করে। যুক্তিকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। রাজি হয়েছিলেন পোষ্টার দেওয়ার কর্মসূচীতে।

১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর একদিনের কর্মবিরতি শুধু কলকাতা নয় পশ্চিম-বাংলার প্রায় সমস্ত জেলাতে সাড়া জাগালো। কর্মবিরতির পর শিক্ষক সমাবেশ হলো। বিক্ষোভ প্রতিবাদ সেই প্রথম আন্দোলনের ভাষা পেলো। অনিলা দেবী ঠিকই বলেছিলেন, যে নামেই ডাকা হোক না কেন কর্মবিরতি আসলে ধর্মঘটই—যে ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণীর অস্ত্র। মধ্যবিত্ত শিক্ষক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর এই অমোঘ অস্ত্রটিকে প্রথম এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করলেন সত্যপ্রিয় রায়। আর সেদিনই শ্রমিক আন্দোলনের সাথে শিক্ষক আন্দোলনের সেতু বন্ধনের ভিত্তি প্রস্তরটি স্থাপিত হলো।" † ১৪

তিন

নেতৃত্বঃ প্রাচীন বনাম প্রগতিশীল

সংগ্রামী রূপকার সত্যপ্রিয় রায় বলতেন আন্দোলন ও সংগঠন পর্বত অভিযানের মত। কিছু উর্ধ্বে উঠে আরও উপরে উঠবার জন্য বেস ক্যাম্প তৈরী করা দরকার। '৪৮-এর ১লা সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি সমিতির সংগ্রামী জীবনের একটা ভিত তৈরী করেছিল। তাকে সম্মুখে রেখে এগিয়ে চলতে প্রগতিশীল নেতৃত্ব সচেষ্ট হলেন। অন্যদিকে এ.বি.টি. এ-র প্রাচীন নেতৃত্ব ঐ কর্মসূচী সম্পর্কে বিরূপ প্রচার অব্যাহত রাখলেন। কর্মবিরতি প্রস্তাব গঠনতন্ত্রসম্মত উপায়ে গৃহীত হয়নি বলা হলো। গুরুত্বপূর্ণ এই সংগ্রামের সাফল্যগুলি আশা করা গিয়েছিল সমিতির নেতৃত্ব উপযুক্তভাবে তুলে ধরবেন, সে আশা ম্লান হয়ে গেল। বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতে থাকলো ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। সম্মেলনের আগে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের এক তালিকা করা হতো। তাঁদের মধ্যে একজন সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতেন। সমিতির সাধারণ সম্মেলনে এভাবে এসেছেন দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিরা। এঁরা হলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এফ-এ রহমান, প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, অপূর্বকুমার চন্দ, স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জী, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী প্রমুখ। রায়সাহেব ঈশান চন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর থেকে বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি থাকতেন পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত সমিতির সভাপতি। সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে তিনজন সহকারী সভাপতি, পত্রিকার সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতেন। পরবর্তীকালে জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি এবং সেখান থেকে ওয়ার্কিং ও ফিনান্স কমিটি তৈরী হতো। এই কমিটিগুলির সভায় সভাপতির যোগ দেওয়া স্বাভাবিক ও সম্ভব ছিল না। সমিতি নেতৃত্ব ইতিমধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক শিক্ষকের সন্ধান পেলেন। ইনি হলেন আসানসোলের ই. আই. রেলওয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায়বাহাদুর হরিদাস গোস্বামী। শান্তিপুরে আদিত্য মহাপ্রভুর বংশে তাঁর জন্ম। উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে অবশেষে স্বদেশে এসে এই বিদ্যালয় গঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষকদেরও বেতনহার ছিল নগণ্য। নিয়মতান্ত্রিকতার পথে সংগ্রাম করে তিনি দ্রুত এর অবসান ঘটান। বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষকেরা পেতে থাকেন। তাঁর স্কুলটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে বাংলার গভর্নর এটি পরিদর্শন করেন। একারণে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব বৃটিশ রাজের উপহার হিসাবে পেলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সমিতির সহকারী সভাপতি হলেন। পরের বছর সমিতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রধান নেতৃত্ব পাবার আশায় কার্যকরী সভাপতি পদে তাঁকে বরণ করা হলো। প্রতীক কর্ম-বিরতির পর প্রাচীন নেতৃত্ব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া শুরু করলেন। ঐ সময়ে কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচনের কর্মসূচী নেওয়া উচিত ছিল। '৪৮-এর অক্টোবরে সিদ্ধান্ত নিতে বসলেন। নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হলো। প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধি শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইতোমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক শিক্ষা পর্যদ তৈরী হয়ে গিয়েছে। লীগ আমলের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিলের আদলে

একটা বিল তৈরীর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আগ্রহী হয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ নামে ৪২ জন সদস্যবিশিষ্ট এক পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে একটি বিল '৪৮ সালের মাঝামাঝি বিধান সভায় উপস্থিত করা হলো। ঐ বছর শেষের দিকে বিলটি সিলেক্‌ট কমিটিতে পাঠানো হলো। '৪৯ সালের শুরুতেই সিলেক্‌ট কমিটির রিপোর্টসহ বিলটি বিধানসভার চলে এসেছে। পাশাপাশি গত বছরই সরকারের গ্রান্ট-ইন-এইডস্‌ রুলের পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রদেশের বিদ্যালয়গুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে আছে শিক্ষকদের জন্য দশ রকমের বেতনক্রম—শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদ অনুযায়ী। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যে বেতনক্রম প্রকাশ পেয়েছিল হুবহু সেই বেতনক্রম। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ৫০—৮০ টাকা, গ্রাজুয়েটদের ৬০—১০০ টাকা এবং উচ্চ যোগ্যতা-সম্পন্নদের জন্য ৭৫—১৫০ টাকা মাসিক বেতন। আর ১০ টাকা ডি. এ. যার ৫ টাকা সরকার সরাসরি দেবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা আইন ও বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্যের নির্দেশনামা আলোচনার জন্য ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ রামমোহন লাইব্রেরী হলে শিক্ষকদের সভা আহূত হলো। সভায় বক্তা ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ রায়, জগদীন্দ্র নাথ ঘোষ, কালিপদ কুণ্ডু, অনিলা দেবী এবং সত্যপ্রিয় রায়। তাঁরা তীব্র ভাষায় মাধ্যমিক শিক্ষা আইন এবং গ্রান্ট ইন-এইড্‌সের নিয়মাবলীর সমালোচনা করলেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা যে ভাবে মধ্যশিক্ষা আইন তৈরী কার্য করতে চেষ্টা করে তা থেকে রায়সাহেব হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী কোন ব্যতিক্রম করেননি। এর বিরুদ্ধে কলকাতার শিক্ষক সমিতি অসংখ্য সভা করেছে। এই সভাগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে দেশের মানুষ তাঁকে ধিক্কার দিতে শুরু করেছে। সংবাদপত্রগুলিও এই বিলের আপত্তিকর বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। আর সাহায্যদানের নীতি সম্পর্কে তাঁরা বললেন, শিক্ষকদের বেতনক্রমের ব্যাপারে সরকারের নির্দেশনামা নিতান্ত অনুদার। সরকারী শিক্ষকেরা যে মহার্ঘভাতা পান অবশ্যই সমস্ত শিক্ষকদের তা দেওয়া উচিত। অথচ নানা শর্ত কণ্টকিত করে তাঁরা ১০ টাকা ডি. এ. ঘোষণা করেছেন। কলকাতার অনেক বিদ্যালয়ে এটি বর্তমানে ৩০-৪০ টাকা পর্যন্ত। সহকারী প্রধান শিক্ষকদের বেতনক্রম নেই, প্রারম্ভিক মূল বেতন ধার্য করবার কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধাত হয়নি। ভাষা শিক্ষকদের জন্য কোন বেতনক্রম করা হয়নি। বয়ঃসীমার ক্ষেত্রেও অবিচার করা হয়েছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা সম্পূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, একে সরকারের আর একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে—দ্বিতীয় মহাকরণে পরিণত করা উচিত হবে না। সরকার কর্মচারী বদল না করে পর্ষদ সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক প্রতিনিধি দ্বারা করা দরকার। পর্ষদ-এ অর্থ এবং সাহায্য ও অনুমোদন উপসমিতি থাকা দরকার। শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য সালিসী কমিটি রাখা দরকার।

বঙ্গ বিভাগের ফলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্ব বাংলার কার্যকরী সমিতির সদস্যেরা সেখানকার কাজ চালাবার জন্য পূর্ব বাংলা শিক্ষক সমিতি নামে সংগঠন শুরু করে দেন। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভা-সমাবেশ সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক এই নামে চল হয়ে এসেছে। কার্যকরী সমিতি ১২।৩।৪৯ তারিখের সভায় পূর্ববাংলার মত এখানেও পৃথক সমিতি সংগঠনের কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাজকর্ম করবার দায়িত্ব বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সমিতি সদস্য বামনদাস মণ্ডলের উপর অর্পণ করলো। সমিতি শুরু থেকে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা বই সাহিত্যচয়ন এবং টেষ্ট পেপার্স প্রকাশ করে আসছে। এক কথায় সমিতির আর্থিক অবস্থা কোন সময়ই প্রতিকূলতা

সৃষ্টি করেনি। এমনকি ১৯৪০ সালেই ২৭ হাজার টাকায় গণেশ এভিন্যুর জমি আজ যেখানে সত্যপ্রিয় ভবন অবস্থিত সেটি কেনা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের সংগঠিত করতে বামনদাস মণ্ডলকে ২০ হাজার টাকার এক তহবিল দেওয়া হলো। অল্প দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কাজকর্মে বেশ উৎসাহজনক অবস্থা তৈরী করে দিল। শিক্ষকদের বেতনক্রম কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে সরকারের কাছে এক দাবীপত্র তৈরী করে পেশ করা হলো। এই প্রস্তাবে আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ১০০ টাকা এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক, বি. টি. পাশ অথবা অনার্স এম. এ.-দের জন্য ১৫০—৩০০ টাকা বেতনের সুপারিশ ছিল। প্রধান শিক্ষকদের ২০০—৪০০ টাকা বেতনহার ধার্য করতে তাঁরা বলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করা হলো '৪৯ সালের ১৩ ও ১৪ই আগষ্ট। ১৩ই আগষ্ট ভারত সভা হলে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বিদ্যালয় যে সরকারী সাহায্য হতে বঞ্চিত তার জন্য ব্যথা প্রকাশ করলেন। চার শতাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নির্দিষ্ট হারের চেয়েও কম বেতন পান তার উল্লেখ করলেন। সমিতির প্রগতিশীল অংশ সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তিনি সরকারী সাহায্যরীতির প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন। বি. এ. অনুত্তীর্ণ, বি. এ. এবং বি. টি. উত্তীর্ণ এই শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা এবং প্রধান শিক্ষকদের জন্য সরকার ১৫০—৪০০ টাকা বেতনক্রম ঘোষণা করেছেন সেগুলি তিনি তুলে ধরলেন। সহ-শিক্ষকদের বেতনের দ্বিগুণের অধিক প্রধান শিক্ষকেরা পাবেন জানিয়ে শ্লেষের সুরে বললেন, চন্দ্রমা যেমন নৈশ গগনের অন্ধকার বিদূরিত করে সরকার মনে করেন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী সুদক্ষভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রসু করে তুলবে,—এ হচ্ছে অবাস্তব ধারণা। শিক্ষকদের তীব্র সংগ্রাম করা ছাড়া এর অবস্থান্তর ঘটবে না। এই ক্ষেত্রে ধর্মঘট ছাড়া আর কি উপায় আছে? তিনি বললেন, ধর্মঘট শিক্ষকদের মর্যাদার মূলে আঘাত করে কিনা—এই সূক্ষ্ম প্রশ্নের জটিলতা সব কিছু নয়। আসল প্রশ্ন, শিক্ষক সমাজকে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের উপায় নিজেকেই স্থির করে নিতে হবে। সে উপায় হওয়া চাই শিক্ষক সাধারণের সুচিন্তিত কর্মধারা। আজ তাই সব চেয়ে প্রয়োজন—সাংগঠনিক কার্যক্রম। শুধু সরকারী সাহায্যরীতি নয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষকেরা কিভাবে চান তাও তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্বন্ধে আমাদের দুইটি প্রধান দাবী—প্রথমতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্থার পরিকল্পনার সৃষ্টিকেন্দ্র এই বোর্ড যেন সরকারী আওতায় পড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়। দ্বিতীয় দাবী—শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ যেন বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়। সম্মেলনে বামনদাস মণ্ডল সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করলেন। হীরেন্দ্র নাথ রায় শিক্ষকদের লাগাতার ধর্মঘট করবার প্রস্তাব আনলেন। সবশেষে হলো কর্মকর্তা নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সম্পাদক হলেন সত্যপ্রিয় রায়। পরদিন শিক্ষক প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট হলে। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন প্রস্তাব নিল, সরকারের কাছে দাবী ৫০ টাকা মূল বেতন ও ৫ টাকা দুর্মূল্যভাতা প্রত্যাখান করে শিক্ষকদের মূল বেতন ১০০ টাকা ও ৩০ টাকা দুর্মূল্যভাতা ঘোষণা করা হোক। আর দাবী পূরণ না হলে ১৯৪৯-এর ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর দু'দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হবে স্থির হলো।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারূপে প্রগতিশীল অংশের শিক্ষকেরা নির্বাচিত। তৎসহ আগামী নভেম্বর মাসে দু' দিনের কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত—সমিতির প্রাচীন নেতৃত্বের অস্থিরতা দেখা দিল। হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা সম্পাদক সহ মনোরঞ্জন বাবু, হরিদাস বাবু এবং বামনদাস মণ্ডল ঐ আহ্বানের সাংবিধানিক দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সমিতিকে চিঠি দিলেন। তাঁরা বললেন, কর্মবিরতি প্রস্তাবের কোন খসড়া তো আগে দেওয়া হয়নি। সম্মেলনে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব বিধি-বহির্ভূত ব্যবস্থা রয়েছে। আর সম্মেলনে কোন বিষয় নির্বাচনী সভা হয়নি এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের নির্বাচনকেও তাঁরা চ্যালেঞ্জ জানালেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বের হতে বিলম্ব হলো না। কর্মবিরতির আগেই ঘোষণা করা হলো পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি মূল সমিতির প্রতিনিধিত্ব করছে না। এ. বি. টি. এ তাকে শাখা বলে স্বীকার করছে না। মূল সমিতি বিনাশ না হলে আইনতঃ এই সমিতি কোন স্বীকৃতি পেতে পারে না। অতএব পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আইনগত ও গঠনতন্ত্রগত অস্তিত্ব শূন্য মাত্র। এই সমিতির সঙ্গে এ. বি. টি. এ-র কোন সম্পর্কই আর থাকছে না।

কোন পিছু টানের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলেছে সমিতির প্রগতিশীল অংশের শিক্ষকেরা। অমানুষিক পরিশ্রম করে তখন প্রাথমিক শিক্ষকেরাও সংগ্রামের মঞ্চ তৈরী করছেন। '৪৬ সালে তাঁরা সর্বাত্মক ধর্মঘট করেছেন। ২৮ দিন স্কুল বন্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে '৪৮ সালে তাঁরা বহরমপুর সম্মেলনে এসেছেন কাতারে কাতারে। দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের একজন 'গ্রুপ-ডি' কর্মীও পান ৮০ টাকা, অথচ একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ২৫।৩০ টাকার বেশী নয়। ৪০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে তাঁদের বেতন করতে হবে নতুবা '৪৯ সালের ১লা মার্চ থেকে তাঁরা লড়াইয়ের ময়দানে নামবে এই সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হলো। '৪৯ সালের প্রথমেই অনুষ্ঠিত হলো তাঁদের বর্ধমান সম্মেলন—যেখানে ২টি বড় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মিলন ঘটলো। এই দাবীগুলি জোরদার হলো। সারা বাংলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্মেলন কলকাতায় ১৫ থেকে ১৭ই এপ্রিল ('৪৯ সালের) অনুষ্ঠিত হলো। সরকার তাঁদের জন্য ১০ টাকা ডি-এ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। সম্মেলন এই সব কারণে কিন্তু উত্তেজিত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তাঁদের দাবী ৫০ টাকা মহার্ঘভাতা। এই সব কারণে সামান্য যোগাযোগে ১৫ ও ১৬ই নভেম্বর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি যৌথ আন্দোলনে পরিণত হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিক্রিয়া হলো ভয়াবহ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করলেন, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দায়িত্ব সে তো সরকারের না। তবে ধর্মঘট বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যার সঙ্গে জড়িত, সেজন্য পরিচালনা কর্তৃপক্ষ যাচ্ঞা করলে পুলিশী সাহায্য পাবেন। এই সূত্র ধরে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা অধিকর্তার পত্র সত্বর পাঠানো হলো। ধর্মঘটী শিক্ষকদের কাছ থেকে কৈফিয়ত নিতে হবে এবং পরিচালনা কমিটি বিদ্যালয় বন্ধ করবেন না। এর ব্যতিক্রম হলে শিক্ষকদের জন্য সরকার যে ৫ টাকা করে শিক্ষক পিছু মাসিক ভাতা দিচ্ছেন তাও বন্ধ করা হবে। নেমে এলো প্রচণ্ড নিপীড়ন। ভীতি প্রদর্শন ও জুলুম উপেক্ষা করে দুই দিনের কর্মবিরতি সার্থকতা লাভ করলো। সত্যপ্রিয় রায় একে অভূতপূর্ব সাফল্য বলে বর্ণনা দিলেন।

এ ধর্মঘটে অংশ নেবার অপরাধে মুর্শিদাবাদের সৈয়দাবাদ মণীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠে বরখাস্ত হলেন শিক্ষক সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য। সরকারের প্ররোচনায় সে স্কুলের পরিচালন কমিটি ১০।১।৫০ তারিখে তাঁকে ছাঁটাই করলো। তাঁর অন্যতম সহকর্মী

হিমাংশু শেখর ভট্টাচার্যকে সাবধান করে দেওয়া হলো। সন্তোষ ভট্টাচার্য শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্তমানে শহীদ সন্তোষ ভট্টাচার্য বলে খ্যাত। তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল তারকা। তিনি অধ্যাপকের একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে সম্মান ও কৃতিত্ব নিয়ে স্নাতক হন। এ সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত এক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে তাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখন তিনি এম-এ পড়ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। আটমাস কারাভোগ করেন। পিতার মৃত্যু হলে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয় এবং তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। '৪৯ সালের দুদিনের প্রতীক কর্মবিরতিতে অংশ গ্রহণের অপরাধে তাঁর ছাঁটাইকে সহকর্মীরা মেনে নেননি। তাঁকে সমর্থনের অভিযোগে পরবর্তীকালে অন্যতম শিক্ষক মণীন্দ্রমোহন সরকারও বরখাস্ত হন। কোন অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার না করে উভয়ে কঠোর জীবন সংগ্রাম সূচনা করেন। কখনো রেশম কখনো আমের ব্যবসা করে চরম আর্থিক কষ্টে দিন কাটাতে থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণ প্রচণ্ড প্রতিবাদ চালিয়ে যান। বেশ কিছুকাল পরে তাঁরা আবার স্বস্থানে পুনর্নিয়োগ পান।

ত্যাগ স্বীকার ও মর্যাদার এসব দৃষ্টান্ত জেনে তা থেকে নতুন কিছু গ্রহণের ইচ্ছা তখনকার সমিতি কর্মকর্তাদের ছিল না।

প্রাচীন নেতৃত্ব কর্মবিরতি মূল্যায়নে বিরূপ ফলাফল প্রকাশ করলেও সাফল্য সরাসরি অস্বীকার করলেন না। তাঁদের মূল্যায়নে মেদিনীপুর জেলা ছাড়া অন্য সব জেলাতে কর্মবিরতি আংশিক হয়েছিল। তাঁরা কলকাতা সম্পর্কে বললেন, আগে গুজব ছড়িয়ে যায় যে ঐ দু'দিন প্রচণ্ড গোলমাল হবে। আর তা ছাড়া বেশীর ভাগ স্কুলে অবস্থান ও হিংসাত্মক হুমকী সত্ত্বেও স্কুলের কাজ চলে। কর্মবিরতি অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণের জন্য তৎপর হন। ১৯৫০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে লাগাতার কর্মবিরতির পথে শিক্ষকেরা যেতে পারেন কিনা এই অভিমত জানাবার জন্যই প্রস্তাব প্রেরিত হয়।

আসল কথা তাঁরা যাই বলুন না কেন অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন নেতৃত্বকে চলতে হচ্ছিল। অনেকদিন ধরেই সমিতির সংগঠনকে গঠনতন্ত্রসম্মত করতে তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যেই টিকে থাকবেন। এর জন্য পর্যায়ক্রমে সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা হচ্ছিল। গঠনতন্ত্রে ধারাটি এই ছিল যে সমিতির বিনাশের জন্য ২/৩ অংশ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন। পর পর তিনটি সম্মেলন আহ্বান করে এমন কি পূর্ব বাংলা থেকে সমিতির কর্মীদের এনেও সবশেষে তা করা সম্ভব হলো না। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে মূল সমিতির কর্মকর্তারা খবরদারির জন্য কেয়ার টেকার বা তদারকী কমিটি তৈরী করে কাজ চালাচ্ছিলেন। '৪৯ সালের শেষের দিকে এই কমিটির আইনানুগ অস্তিত্বকে আপত্তি জানিয়ে সত্যপ্রিয় রায় উকিলের নোটিশ দিলেন এবং '৫০ সালের প্রথম দিকেই হাইকোর্টে এক মামলা রুজু করে দিলেন। সংগঠনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য, সমিতির ভিত্তি মহকুমা পর্যায়ে এনে সেখান থেকে সদস্য অনুপাতে নির্বাচন করে কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য প্রগতিশীল সদস্যেরা ইতিপূর্বেই এক খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। '৪৯ সালের শেষভাগে এসে সমিতির নেতৃত্ব প্রখ্যাত ব্যারিষ্টারের পরামর্শে প্রভাবান্বিত হলেন। তাঁরা দেখলেন এতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক

সমিতির অবসানের প্রয়োজন নেই। সাধারণ সম্মেলন ডেকে গঠনতন্ত্রের সামান্য সংশোধনের মধ্য দিয়ে পূর্বাপর কাজ চালানো যেতে পারে। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন '৫০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমিতির বার্ষিক সম্মেলন করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা আইন পাশ হলো '৫০ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে। কিন্তু ঐ আইনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন শিক্ষক ও পরিচালন কমিটি থেকে ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হবে, এ সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত ছিল। এই অবস্থাগুলির মুখে পড়ে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ স্থগিত রাখা যায় না তাঁরা বুঝিয়েছিলেন। সমিতির সম্মেলন ১৬ ও ১৭ই জুলাই বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং সভাপতিত্ব করলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। সম্মেলনে শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন ১০০ টাকা এবং ৪০ টাকা ডি-এর দাবীতে কর্মবিরতি, অন্যূন কয়েক দিনের প্রতীক কর্মবিরতির প্রস্তাব খসড়াকারে তোলা হয়েছিল। প্রাচীন নেতৃত্ব তখনও দৃঢ়ভাবে এই মনোভাব পোষণ করতেন এতে প্রতিক্রিয়া হবে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। মিলের শ্রমিকদের ধর্মঘটে উৎপাদন নষ্ট হয়। পৌরকর্মীদের ধর্মঘটে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। যুদ্ধের সময় কলকাতায় স্কুলগুলি দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। আবার স্ট্রাইকের দরুন স্কুল বন্ধ হলে কি হবে। জনমত তেমনি নিশ্চুপ রইবে। আর তা ছাড়া কলকাতার শিক্ষকেরা প্রাইভেট টিউশনি করেই বেঁচে থাকেন। বিপুলাকার স্ট্রাইক ফাণ্ড গড়ে তুলতে না পারলে ঐ পথে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার এক মাস আগে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে প্রাচীন নেতৃত্ব এক স্মারকলিপি পেশ করে দিয়েছিলেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ঐ দাবীপত্রের প্রতি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। তাঁদের প্রতি সুবিচারের জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হলো। সরকারী সাহায্যদান রীতি পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তাঁরা কর্তব্য শেষ করলেন। ২ বছরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন হলো। উল্লেখ্য অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে এলেন সত্যপ্রিয় রায়। সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের বিষয়। স্থির হলো এজন্য বিশেষ সাধারণ সম্মেলন আহূত হবে। ঐ সম্মেলনে জেলা সমিতিগুলি ও বিদ্যালয়ের মতামত চাওয়া হবে এবং তারপরই হবে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন। নেতৃত্ব জানালেন, বছরের শুরুতেই বিশেষ সম্মেলন করা সম্ভব হবে।

জয় পরিবর্তিত মানসিকতার

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাজ শুরু হবে। প্রধান শিক্ষক ৩ জন, সহকারী শিক্ষক ২ জন, একজন সহ-শিক্ষিকা, প্রধান শিক্ষিকা একজন এবং পরিচালন কমিটি থেকে ৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে বোর্ডের সদস্যপদে আসবেন। নির্বাচন আগামী বছর মার্চের মাঝামাঝি। কাজেই আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ৭।১।৫১ তারিখ জেলা সম্পাদক ও ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের মনোনীত করে ফেলা হলো। উল্লেখ্য সমিতির প্রগতিশীল অংশের কোন প্রতিনিধিকে সদস্যপদে মনোনয়ন দেওয়া হলো না। তাঁরাও খুব সক্রিয় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা গঠন করলেন সমিতির মধ্যে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা বা ডেমোক্রাটিক টিচার্স ফোরাম। কংগ্রেসের মধ্যে আচার্য জে. বি. কৃপালনী ইতিপূর্বে গণতান্ত্রিক ফোরাম গঠন করেছেন এই দৃষ্টান্ত নিয়ে। শিক্ষায় শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। আন্দোলনমূলক নীতি ও কর্মসূচী তাঁরা অনুসরণ করবেন বলে ঘোষণা করা

হলো। তাঁরা শিক্ষকপদে প্রার্থী দিলেন। নির্বাচনে তাঁরা প্রত্যাশিত ফল পেলেন। নির্বাচনের ফলাফল—

প্রধান শিক্ষক কেন্দ্রে—

(১) বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী—(এ. বি. টি. এ),

(২) শৈলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী—(গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা),

(৩) কামিনী কুমার ঘোষ—(স্বতন্ত্র)।

প্রধান শিক্ষিকা কেন্দ্রে—

১। ডঃ ফুলরেণু গুহ (গঃ শিঃ সংস্থা)

সহ-শিক্ষক কেন্দ্রে—

১। বামনদাস মণ্ডল (এ. বি. টি. এ.), ২। জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত (গঃ শিঃ সংস্থা)।

সহ-শিক্ষিকা কেন্দ্রে—

১। অনিলা দেবী (গঃ শিঃ সংস্থা)

পরিচালন কমিটি প্রতিনিধি কেন্দ্রে—

১। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (এ. বি. টি. এ.), ২। ডঃ পি. কে. গুহ (স্বতন্ত্র) (৩) ঈশ্বরচন্দ্র মাল (স্বতন্ত্র)।

ইতোপূর্বেই স্থির ছিল '৫১ সালের ১৩ ও ১৪ই এপ্রিল হাওড়া শিবপুর গার্লস কলেজে সমিতির বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। শৈলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলের শচীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী সম্মেলন সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সমিতিতে চিঠি দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিকে প্রাচীন নেতৃত্ব কাজে লাগালেন। বলা হলো এঁরা মামলা করলে নিষেধাজ্ঞা পেয়ে যাবেন মনে করে ঐ সম্মেলন বাতিল করে দেওয়া হলো। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ করে পর্ষদের নির্বাচনের ফল অনেককেই বিষণ্ণ করে তুলেছিল। সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হলেন যিনি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে সমিতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূলহোতা কার্যকরী সভাপতি হরিদাস গোস্বামী। তিনি তাঁর পদে ইস্তফা দিলেন। গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ২২শে জুলাই বর্ধমান জেলার কুলটীতে বিশেষ সম্মেলন আহূত হলো। বিশেষ সম্মেলনে খসড়া গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হলেও এটিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার জন্য এবং আরও মতামত গ্রহণের জন্য স্থগিত রাখা হলো।

বছরের মাঝামাঝি থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কাজ শুরু করেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের সমস্ত প্রসঙ্গগুলি তাঁদের আলোচ্যসূচীতে। পাঠক্রমের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলকোড স্কুলকোড সম্পর্কে সমিতির দাবী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলকোড দীর্ঘ ৩০ বছরের এবং এর ব্যাপক সংশোধন আবশ্যক, এ সম্পর্কে সমিতির মতামত স্পষ্ট। তাঁদের এত আশা ছিল সরকার সংশোধিত গ্র্যান্ট-ইন-এইড স্কীমে শিক্ষকদের জন্য দুঃখ-জনক বেতন পর্যায় স্থির করেছে স্কুলকোড মাধ্যমেই তার পরিবর্তন সম্ভব। এ ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি গঠন সম্পর্কে সুষ্ঠু বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। সমিতি এই ব্যাপারে আন্দোলন সংগঠিত করুক এই প্রত্যাশায় গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা তৎপরতা শুরু করলো। মূল সমিতির উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ২০০ জন সদস্যের এক আবেদনপত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদককে পাঠানো হলো। উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য তারা ১২ই আগস্ট কনভেনশন আহ্বান করবার সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিলেন। নেতৃত্বের

রক্ষণশীল মনোভাব তখনও প্রবল। আন্দোলনের যৌক্তিকতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাকে রূপায়িত করবার কোন ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। বস্তুতঃ ঐ দিনই কনভেনশন আহ্বান করে সত্যপ্রিয় রায় কিংবা গণতান্ত্রিক শিক্ষা সংস্থাকে মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া ও সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনা করে প্রচারপত্র তৈরী হলো ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সেগুলি পাঠানো হলো গণতান্ত্রিক সংস্থা থেকে। তাঁরা বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। প্রচণ্ড চাপের মুখে প্রাচীন নেতৃত্ব উপলব্ধি করলেন শিক্ষকদের মতামতকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনকে কার্যকর করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে হবে। আর দাবীদাওয়া প্রসঙ্গে আলোচনাও করা দরকার। তাঁরা স্থির করলেন ১৯৫২ সালের প্রথমে বাংলার উত্তর প্রান্তে কোচবিহার কিংবা শিলিগুড়িতে সম্মেলন করা হবে। এ সময়ে সরকারের সংশোধিত গ্রান্ট-ইন-এইড প্রকল্প কার্যকর হতে শুরু করেছে। তাতে চারিদিকে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বেতন নির্ধারণে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। বেশ কিছু শিক্ষককে ইনক্রিমেন্টের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকের নির্দেশে বহু বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যাট্রিক এমন কি ম্যাট্রিক ভি. এম. শিক্ষকরা বরখাস্তের কবলে পড়েছেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের অনেককে ৬০ বছরে অবসর নিতে বাধ্য করছেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে তিন চার হাজার শিক্ষকের সম্মুখে খড়্গ ঝুলতে থাকে। তাঁদের পরিবার ও পোষ্যদের মুখে অনাহারের ছায়া দেখা দেয়। অনেক লড়াই-এর মধ্য দিয়ে সেখানকার শিক্ষক প্রতিনিধিরা শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতনের প্রশ্নটি পর্ষদে এগিয়ে নিয়ে আসেন। সর্বসম্মত প্রস্তাব এই ব্যাপারে যাতে রচিত হয় সেজন্য তাঁরা আশাবাদী পথ পরিত্যাগ করে বাস্তবতাকে মূল্য দেন। এই মুহূর্তে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক কনভেনশন আহ্বান করে। ২৪শে ডিসেম্বর '৫১ এই কনভেনশন ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সহকারী সভাপতি বিজয় কুমার বসু। তিন শতাধিক প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত ছিলেন। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হলো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে বেতনক্রম সুপারিশ করছে সরকারকে সেটি গ্রহণ করতে হবে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অধীন সংস্থাগুলি মূল বেতনের সঙ্গে দুর্মূল্যভাতা দেয় ১৫০ টাকা। ভারতের কোথায়ও এই ভাতা ২০ টাকার কম নয়। কাজেই শতকরা সাড়ে সতের টাকা হারে অথবা ৩৫ টাকা যা কম তা দেওয়া হোক। সরকারী সাহায্যদান রীতি পরিবর্তনের দাবী করে বলা হয় যে ২/৩ অংশ পরীক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সেই বিদ্যালয়কে সাহায্য দিতে হবে। গ্র্যান্ট-ইন-এইড নীতি উদার করতে হবে এবং তার সংশোধন করা দরকার। বিশেষ করে স্পষ্টতঃই যে চার শ্রেণীর বিদ্যালয় করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। বোঝা গেল সমিতির সংগ্রামী শক্তি জোগাচ্ছে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা।

সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের প্রথমেই এক অধিবেশনে মিলিত হলেন মহাবোধি হলে। সত্যপ্রিয় রায় তাঁর রচিত প্রস্তাবে বললেন "শিক্ষা জাতির মৌলিক সমস্যা। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় নগণ্য। পশ্চিমবাংলার শিক্ষাবাবদ মোট ব্যয়ের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সরকারী তহবিল থেকে আসে এবং বাকী খরচ বহন করে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অভিভাবকগণ। বহু শিক্ষার্থী পয়সার অভাবে শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি জাতীয় অপচয় ও শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। বিদ্যালয়গুলির অবস্থা শোচনীয়। শিক্ষকগণের ন্যূনতম বেতন

৫০ টাকা ও ঊর্ধ্বতম ৯০ টাকা। এই স্বল্প বেতনে শিক্ষকগণের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাঁদের গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নহে এবং দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারও অসম্ভব। শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" সভায় স্থির হয় যে ন্যূনতম সুবিধা আদায়ের জন্য শিক্ষক অন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এই দাবীর সমর্থনে শিক্ষকদের সমবেত করতে হবে। বৃহত্তম জনমত গঠন করতে হবে। তাই কলকাতায় দাবী সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। দাবী সপ্তাহ চলবে ৩১শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত।

বছরের সূচনাতে সমিতির তদানীন্তন নেতৃত্ব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন আগামী ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্মেলন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের চাঁদা ও পত্রিকার ফি শুধু পরিশোধযোগ্য নয়, তাঁদের কার্যকরী সদস্য হিসেবে অবশ্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পরিচয়পত্র আনতে হবে। শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলে ১১ই এপ্রিল প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত সম্মেলনের সূচনা হলো। প্রচণ্ড উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সম্মেলন-এর কাজ আরম্ভ হয়। পৌরোহিত্য করলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্র নাথ বসু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ভবানীচরণ গুহ স্বাগত ভাষণ পাঠ করলেন। সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সমিতির কার্যবিবরণী উপস্থিত করলেন। সমিতির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, ৫২-৫৩ সালে রাজ্যের বাজেটে শিক্ষকদের প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ৮ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সহ সামান্য সরকারী অর্থপ্রাপ্তি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত হলো। তিনি জানান, দাবী করলে সরকার বোর্ডকে দেখান। সমিতির পক্ষে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বোর্ডের সভাপতির নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। তিনি অর্থের নিতান্ত অপ্রতুলতার কথা বললেন। নবগঠিত মন্ত্রীসভা সম্পর্কে বলেন রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার কথা ছিল কিন্তু অর্থমন্ত্রী নলিনী সরকারের বাজেটে শিক্ষার কোন সমস্যার উল্লেখ নাই।

সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা হলো। সদস্যদের চাঁদা, পত্রিকা চাঁদা স্থির হলো। বিদ্যালয় সদস্য, সহযোগী সদস্য এবং সাম্মানিক সদস্য কিভাবে করা হবে এই নীতি তৈরী হলো। সাধারণ সম্মেলন প্রতি বছর ৩০শে জুনের মধ্যেই ডাকতে হবে; আগষ্ট মাসের মধ্যে সম্মেলন আহূত না হলে এক হাজার সদস্যের স্বাক্ষরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন থেকে একজন সভাপতি ও ৩ জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলো। মহকুমার ১০০ জন সদস্য পিছু এক জন অথবা তার অতিরিক্তের জন্য ২ জন গোপন ভোটপত্র মাধ্যমে নির্বাচিতেরা কার্যকরী সমিতিতে আসবেন। শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে পৃথকভাবে ২ জন করে আসবেন এক এক ডিভিশন থেকে। সহ-সভাপতি ছাড়া সরাসরি নির্বাচিতদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি হবে। তাঁরা নির্বাচিত করবেন সাধারণ সম্পাদক, পত্রিকার সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ। এঁরা সকলে এবং সমিতির সভাপতি ও সব কয়টি ডিভিশন থেকে মোট ৪ জনকে নিয়ে গঠিত হবে সমিতির সর্বোচ্চ স্তর ওয়ার্কিং এণ্ড ফিনান্স কমিটি। এই সম্মেলন পুরাতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সত্যপ্রিয় রায়কে কার্যকরী সভাপতির পদে নির্বাচিত করলো। সহকারী সভাপতি হলেন বিজয় বিহারী বসু, জগদীন্দ্র নাথ ঘোষ এবং শচীন্দ্র নাথ সরকার। সাধারণ সম্পাদক হলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। পত্রিকা সম্পাদক বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। সহকারী পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন শ্রীমতী অনিলা দেবী। কোষাধ্যক্ষ হলেন জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত। এই সব পদগুলির ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন হলো

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে। সেখানকার নির্বাচনে কার্যকরী সমিতি থেকে কয়েকজন প্রগতিশীল সদস্য সাফল্যলাভ করলেন।

দীর্ঘ সংগ্রামের সফল পরিণতি সম্পর্কে এর চাইতে বেশী চাহিদা তখন প্রগতিশীলদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা সুস্থিরভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন। সমিতির মধ্যে মূল্যহীন করা শুধু নয় তাঁদের মতামতকে কোন গুরুত্ব না দেওয়া এবং সমিতির নামের ছাপের সাহায্যে বিরোধের আবর্ত্তে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেতো। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে একটা আন্দোলন একটা সংগ্রামী আবহাওয়া এঁদেরকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল। লাগাতর এই প্রচেষ্টা যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আরও দীর্ঘদিন সমিতি সেই পুরানো সংগঠনের মধ্যে থেকে যেতো। বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে উচ্চস্বরে আলোচনা, দাবী-দাওয়া সম্পর্কে শিক্ষক মনকে উচ্চে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর ধীরে ধীরে হতাশাগ্রস্ত করে তোলা এই ঢং প্রাচীন নেতৃত্ব আরও চালিয়ে যেতেন। তাঁদেরকে কোন কর্মসূচী হয়তো বাধ্য হয়েই নিতে হতো। কিন্তু তা রূপায়ণে থাকতো দারুণ অনীহা, কিছু দিনের জন্য কর্মকর্তারা অফিসেই এলেন না, এই ভাবে চলেছিল। সমিতির পদাধিকারী নির্বাচনে এই ধরন সম্পূর্ণভাবে নীরবে ধিকৃত হয়ে গেল। শিক্ষকদের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটলো মঞ্চ থেকে। তাই সমিতির জীবনে শিলিগুড়ি সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিলিগুড়ি সম্মেলন সমিতির জীবনে প্রচণ্ড বাঁক নেওয়া গতিপথ রচনা করলো। সেখানে গঠনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টি করা এবং সংগ্রামী নেতা স্বরূপ সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবীকে সমিতি পরিচালনায় গ্রহণ করার মত উজ্জ্বল কর্মসূচী গৃহীত হয়। শুধু তাই নয় সম্মেলন এক রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে সম্মেলনগুলিতে কিছু কিছু রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেমন বর্ধমান সম্মেলন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে। ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। বিষ্ণুপুর সম্মেলনে সম্পাদক মনোরঞ্জন বাবু নিজেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যাতে শিক্ষকেরা পার্লিয়ামেন্ট, বিধানসভা এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থাগুলির নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নেন। ভ্রাতৃস্থানীয় সমিতিগুলির সঙ্গে সংযোগের কথা বলা হয়। কিন্তু শিলিগুড়ি সম্মেলনে এই ভাবধারার ক্রমোন্নয়ন দেখা গেল। গৃহীত দুটি প্রস্তাব সম্মেলনেরই গুরুত্ব সূচিত করছে। রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা অধিকতর অবনতির দিকে যাচ্ছে, এই মর্মে এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। কংগ্রেস শাসন ক্ষমতাসীন হয়েও এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য দিচ্ছেন না, শিক্ষা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই। তাইতে শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নতির কোন পথ খোলা নেই। ঐ প্রস্তাবে বেদনার সঙ্গে বিবৃত হয় সরকার শিক্ষকদের উপযুক্ত খোরাক না দিতে পেরে বরং আন্দোলনকে আঘাত করতে পুলিশ, লাঠি এবং গ্রেফতার দিয়ে ঈর্ষার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। তাকে ধিক্কার জানায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অসাধারণ। সময়ের বিচারে ঐ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজের প্রগতিশীল চিন্তার বিজয় চিহ্নিত করেছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন অনিলা দেবী। বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা কালিপদ কুণ্ডু তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। প্রস্তাবে বলা হয় "ভারতের মানুষ বৃটিশ রাজত্বে স্বেচ্ছাচারমূলক নীতিহীন আইনের জালে পড়েছিল। দেশ প্রেমিকেরা বিদেশী শাসকদের অত্যাচারে বিনাবিচারে জেলে রুদ্ধ হয়েছিলেন। কংগ্রেসদল সে সময়ে এ সব কানুনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এণ্ডারসন, টেগার্ট যারা এগুলি তৈরী করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ধিক্কারের ঝড় তুলেছিল। ভাগ্যের পরিহাস এই, সেই কংগ্রেস আজ শত শত সুস্থ নাগরিককে বিনাবিচারে বন্দীশালায় পচিয়ে মারছে। সমস্ত বিষয়টা নিদারুণ ক্ষতিকর যে এইসব নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধিরাও যাঁরা বিধানসভা কিংবা কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেন্ট

সদস্য। তাই এটি নির্ভুল যে কংগ্রেস এণ্ডারসনের প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে তুলছে—রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে টুঁটি টিপে ধরেছে। অবশ্যই গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের মহান-চিন্তাভ্যস্ত চেতনাবদ্ধ মানুষ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ ফ্যাসীবাদী প্রতিহিংসার এই ক্রমবর্ধমান গতিতে আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। অনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে সে কারণে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এ সম্মেলন জোর প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করছে। দাবী করছে, এ আইনগুলির অবসান ঘটুক। বন্দী নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া হোক যাতে তারা জাতি পুনর্গঠনে এমনকি শিক্ষায়ও উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারেন।"

সম্মেলনে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। সত্যপ্রিয় রায় প্রায় সময়ই শিক্ষকদের অগ্রসর করতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে এবং আচার্যের তর্জনী সংকেত করতে বলতেন। আচার্য প্রয়োজন হলেই রাজশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন—রাজাকে শাসন করেছেন। তিনি শিক্ষকদের এই ঐতিহ্য নিয়ে বাঁচবার অধিকার আয়ত্ত করতে আহ্বান দিতেন। জড়ত্বের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষকেরা কোন্ গতিপথ নেবে প্রগতিশীলেরা সেদিন তার ইংগিত এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। তাই একটু একটু করে রাজ্যের শিক্ষক সমাজের চক্ষু উন্মীলিত হয়ে একদিন দেশ আর রাজনীতিকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছিল।

চার

শিক্ষা আন্দোলন

ঔপনিবেশিক স্বার্থে বৃটিশ সরকার ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সে সময় থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা ভাবনা শুরু হলো। বাংলার নব জাগরণের প্রথম পুরুষ রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা চালু করবার দাবী তুলেছিলেন। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সৃষ্টি করেছিলেন নব্য শিক্ষার আন্দোলন। শিক্ষা বিস্তারের কথা বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব ছিল সেখানে। অনেক কাজের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এ দৃশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে দেখা দিয়েছিলেন একথা সবার জানা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিক্ষার দাবী রাজনৈতিক প্রবাহ লাভ করে। ১৯০৭ সালে বোম্বাই-এ বিটলভাই প্যাটেল প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। এর কিছুকাল পরে লোকমান্য তিলক ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিল তোলেন। গণশিক্ষার দাবীতে এই বিল এক ঐতিহাসিক দলিল। ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী দেশে ছিল শিক্ষিতের সংখ্যা ৬ শতাংশ। এ সময়ে আমেরিকায় ২১, গ্রেটবৃটেনে ১৭, আয়ারল্যাণ্ডে ২০, জাপানে ১১, রাশিয়ায় ৪·৫ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। এই অবস্থা কাটাতে এখানকার সরকার কী ভূমিকা নিচ্ছেন লোকমান্য তিলক তার দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিলেন। সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ১৬ শিলিং, গ্রেটবৃটেন ১০ শিলিং ব্যয় করছিল। অথচ ভারতে ব্যয়িত হতো ১ পেনি মাত্র। ঐ দেশগুলির তুলনায় ২০০ থেকে ১০০ ভাগ কম। শিক্ষাখাতে ব্যয় করবার এই কুণ্ঠা এবং পাশাপাশি সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য দপ্তরের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতাকে তিনি মানসিক পশ্চাৎগামিতা বলে উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং বয়কট আন্দোলনের সূত্রে গড়ে উঠা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রভাব অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলন কালে কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ এবং আলিগড় ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভারসিটী গড়ে উঠে। দেশে অসংখ্য জাতীয় শিক্ষায়তনের জন্ম হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের তৎপরতা দেখা যায় বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও বিহারে। এর কিছুকাল পরে দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষিজীবিদের সাক্ষর করবার প্রসংগ তথা মৌল অধিকার হিসাবে শিক্ষাকে দেখা হতে থাকে। ১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় সম্মেলনে শিক্ষাকে ভারতীয়করণের দৃষ্টিভংগী উত্থাপিত হয়। পরের বছর ওয়ার্ধাতে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাতত্ত্ব প্রকাশ পায়। প্রদেশগুলিতে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার তার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় সচেষ্ট হয়। জাতীয় কংগ্রেস থেকে সাত বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, উৎপাদনশীল কাজ বা হস্তশিল্পের সংগে শিক্ষার সংযোগের দাবী করে।

শিক্ষা আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে যোগ করে ছাত্র আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। ১৯১৯ সাল থেকেই ছাত্র সমাজ নিজস্ব সংগঠন তৈরী করতে শুরু করে। বাংলাদেশে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে, দেশপ্রেমের অপরাধে ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদ, মীরাট কমিউনিস্টদের ও অন্যত্র শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘটে, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে ও কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘটের সমর্থনে

ছাত্ররা বার বার সংগঠিতভাবে এগিয়ে এসেছিল। তারা ছাত্র সংগঠন গড়েছিল। তার মধ্যে ১৯২৮ সালে নিখিল-বঙ্গ ছাত্র সমিতি বা এ-বি-এস-এ এবং ১৯৩৫ সালে ছাত্রলীগ গঠনের ঘটনা খুব উল্লেখযোগ্য। সারা ভারত জুড়ে ছাত্র সংগঠন গড়বার প্রস্তুতি নেওয়া হয় ১৯৩৬ সালে। এ বছরের মাঝামাঝি বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রপ্রতিনিধিরা লখনৌ শহরে সমবেত হলেন। সেখানে তৈরী হলো সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন বা এ-আই-এস-এফ। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকরণ, ছাত্র সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠার লক্ষ্য নিয়ে, চিন্তা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্য—এইগুলি লক্ষ্য ছিল ঐ সর্বভারতীয় সংগঠনের। এদের দাবী সনদে (১) সার্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার, (৩) পাঠ্যসূচীতে জাতীয়তাবিরোধী বা গণতন্ত্রবাদ বিরোধী বিষয়গুলির বিলোপ, (৪) অভিভাবকদের ঘাড় থেকে শিক্ষার ব্যয়-ভার কমানো এবং (৫) ছাত্রদের দেয় সমস্ত শুল্কের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনবার দাবী ছিল। বাংলায় প্রাদেশিক শাখা বি-পি-এস-এফ-এর নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাবেশ, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, ছাত্রদের উপর পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ছাত্রদের সংগঠিত আন্দোলন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এটি বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন অফিসারের মুক্তির দাবীতে ধর্মঘট হয়। ঐদিন ছাত্র মিছিলে গুলি চললে পরদিন দলমতনির্বিশেষে সমস্ত ছাত্র ও ট্রাম শ্রমিকেরা সমবেত হয় ধর্মতলা স্ট্রীটে। বিশাল ঐ জমায়েত দেখে পাহারারত গোরা সৈন্যরাও ভয়ে ফোর্ট উইলিয়মে আশ্রয় নেয়। ছাত্র আন্দোলনের উত্তালতা দেশকে অসাধারণ পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। এ বছর ১১ই ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের যৌথ সমাবেশ হলো। তাতে বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণ ঘটলে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালো। কলকাতায় মিলিটারী নামাতে হয়। ২৪শে জুলাই ছাত্ররা নাগরিকদের সঙ্গে মিলে বন্দীমুক্তির আন্দোলন করলেন। লীগ সরকারকে তাদের দাবী মেনে নিতে হলো বাধ্য হয়ে। এরপর ২৯শে জুলাই ডক শ্রমিকদের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে ছাত্ররা বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এ কথা অনস্বীকার্য এই সংগ্রামের প্রভাব নস্যাৎ করতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করা হয়েছিল। তখনও তাঁরা পিছিয়ে পড়েননি। খুনীদের পায়ে পা চালিয়ে সংগঠনগতভাবে উজ্বল প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। এর মধ্যেও ১৯৪৭ সালের ২১শে জানুয়ারী ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতা ও বাইরে ছাত্ররা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি শিক্ষাজীবনের মৌলিক প্রশ্নে গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। ছাত্রের ভবিষ্যত জীবনের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে লড়াই চালিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ছাত্ররা ভিন্ন উপদেশ পেতে লাগলো। শাসন ক্ষমতায় বসে কংগ্রেস বললো, ছাত্রদের রাজনীতি করবার প্রয়োজন নেই। তারা থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিয়ে। নির্বাচন নয় প্রয়োজন হলে এই সব কাজের জন্য মনোনীত ছাত্র ইউনিয়ন করে দেওয়া হবে। কতকগুলি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের কাছে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট হলো। শাসনব্যবস্থাসহ শিক্ষানীতিকে তাঁরা পূর্বতন শাসকদের পদাংক অনুযায়ী চালনা করতে চান; এটা বুঝা গেল। ক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ নতুনভাবে সংগঠিত হলো। ছাত্রীরা বিপুল সংখ্যায় এলো। বিভিন্ন বিক্ষোভে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সামিল হলো। এ সময়ে প্রাথমিক মাধ্যমিক কলেজ শিক্ষকেরা তাঁদের বেঁচে থাকবার বেতন চাইতেন। তাঁদের দাবী নিষ্ফল পরিণতিতে থাকতো। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে সরকার ছাত্র বেতন বৃদ্ধির কথা ভাবতেন, এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময়

পশ্চিমবঙ্গে শত শত প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই আবার স্কুল কলেজের ছাত্রদের ১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের দাবীতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। শিক্ষকদের দাবীতে স্কুল কলেজের দরজা বন্ধ করে রাজপথে নেমে পড়ে। '৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে সমবেত হয়। পুলিশ তাঁদের কয়েকজনকে গুলি করলে ছাত্ররা প্রতিবাদে নামে। এ'দেরকে সভ্য জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স ছাত্রদের দাবির সমর্থনে ক্রমাগত কলেজ ধর্মঘট হয়। অবশেষে সে আন্দোলন 'কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই' দাবী করে। ১৯৫০ সালের ২রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাত্রভর্তি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি বিজ্ঞপ্তি জারী করে। তাতে সরকারের শিক্ষাবিরোধী চরিত্র আরও নগ্ন হয়ে উঠে। এর প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস ও কয়েকটি কলেজে লাগাতার ধর্মঘট হয়। বিধানসভায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিল উপস্থিত হলে কলকাতায় তীব্র প্রতিবাদ দেখা দিল। ছাত্ররা প্রতিবাদ সভায় যোগ দিল। শিক্ষক সমিতি আয়োজিত কর্মসূচীতে দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। জাতীয় শিক্ষার দাবী কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় বসে কিভাবে অবহেলা করছে এবং দেশের সর্বত্র একই সংকোচন রীতিতে চলছে, বোঝা যেত। কোন কোন প্রদেশে এর বিরুদ্ধে লড়াইগুলির খবর পাওয়া যেত। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য প্রদেশের চাইতে শিক্ষায় একটু বেশী উদাসীন তাও বোঝা যেত। শিক্ষাখাতে মধ্যপ্রদেশ ১৭, বিহার ১৪, পাঞ্জাব ১৩, বোম্বাই ২১, মাদ্রাজ ১৭, মহীশূর ২২ আসাম ১৬ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় করছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যয় ৭ শতাংশ, এটা ধিকৃত হতো। কয়েকটি রাজ্যের পুলিশ খাতে ও শিক্ষাখাতের ব্যয় দেখিয়ে এ রাজ্যের গতিকে নিন্দা করা হতো।

	পুলিশ খাতে (শতকরা)	শিক্ষাখাতে (শতকরা)
উড়িষ্যা	১১	১৩
উত্তরপ্রদেশ	১৩	১৬
পশ্চিমবঙ্গ	১৬	৭

শিক্ষাক্ষেত্রে একশত টাকা ব্যয় হলে ঐ টাকার কতটা কোথা থেকে রাজ্যগুলি নিয়ে আসে তার তথ্য—

	সরকারী সাহায্য	স্থানীয় সংস্থার অনুদান	ছাত্র বেতন	অন্যান্য আয়
আসাম	৬৩·৯	৬·০	২০·০	১০·১
উড়িষ্যা	৭২·৯	৫·১	১৪·২	৭·৮
বোম্বাই	৫৮·৫	১০·৫	২১·২	৯·৮
পশ্চিমবঙ্গ	৩৭·৫	১০·৬	৩৭·৬	১৪·৩

শুধু তাই নয় বর্তমান কংগ্রেস শাসন পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারে যেন লীগ সরকারকে নকল করে চলছেন। কোন পৃথক দৃষ্টিভংগী তাঁদের নাই এ বিষয়টি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত টাকার অংকে প্রকাশ পেত।

	১৯৪৫-৪৬ সাল (লীগ আমল)	১৯৪৮-৪৯ সাল (কংগ্রেস আমল)
সরকারী সাহায্য	৭·৬	১০·০
স্থানীয় সংস্থার সাহায্য	১·১	০·৮
ছাত্র বেতন মারফত আদায়	২২·৩	৩০·১
অন্যান্য সূত্রের আয়	৫·১	৬·১
মোট—	৩৬·১	৪৭·০

এই ধরনের আলোচনা থেকে সচেতন হতে থাকে ছাত্র-শিক্ষকেরা। শিক্ষাক্ষেত্রের সাধারণ ভূমির দুই কৌণিক অবস্থানে একদিকে ছাত্র অপর দিকে শিক্ষক। দুয়ের লক্ষ্য শিক্ষা যেন শীর্ষবিন্দু। ছাত্র শিক্ষকদের মিলিত সমান ভাবনার মধ্য দিয়ে রাজ্যে যেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসরে নতুন শিক্ষা জগৎ সজ্জিত হয়ে থাকলো। ছাত্ররা অনেকে শিক্ষকতায় এলেন। শিক্ষকেরা ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ হলো। শিক্ষকদের আর্থিক দুর্দশা ছিল সর্বজনবিদিত। অবস্থার উত্তরণ না ঘটলে রাজ্যে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা চালু হতে পারে না, সবাই জানতেন। সমাজের একটা অংশের মানুষের আর্থিক দাবীর ক্ষেত্রে দলমতনির্বিশেষে এত গণসমর্থন দেখা দিল যার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নতুন নেতৃত্ব নিজেদের আর্থিক দাবীকে তুলে ধরলো শিক্ষার অব্যবস্থা দূরীকরণের তালিকার মধ্যে। তাঁরা বললেন—

(ক) জাতীয় পুনর্গঠনে শিক্ষার দাবী অগ্রগণ্য বলে স্বীকার করতে হবে।

(খ) জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার চাই।

(গ) উদ্দেশ্যানুগ শিক্ষাখাতে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত জীবনে অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থায় পড়তে না হয় এমন ব্যবস্থা চাই।

(ঘ) জনসাধারণের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত সরকারী সাহায্য চাই। সেই সংগে ছাত্রদের বৃত্তি, টিফিন ইত্যাদি দিতে হবে।

(ঙ) মাধ্যমিক শিক্ষকদের কমপক্ষে ২০০ টাকা বেতন এবং ৩৫ টাকা ডি. এ. দিতে হবে এবং

(চ) রাজস্বের অন্ততঃ কুড়ি ভাগ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে।

শিক্ষকদের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা তখন ২৫৪৫টি। তার মধ্যে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্যা ১৩২২। ৮৬০টি বিদ্যালয় সাহায্যপ্রাপ্ত। বাকী ৪৬২টি কোন সাহায্য পায় না। সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৪৭২ এবং ৬,৫২৬ জন। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ১২২৪টি। ৬৪৫টি বিদ্যালয় সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ৫৭৯টি বিদ্যালয় সাহায্যবিহীন। নিম্ন মাধ্যমিক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গড়ে ৮ জন এবং সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ে গড়ে ২ জন শিক্ষক কাজ করতেন। এই স্তরে ছয় হাজার শিক্ষক ছিলেন বলে জানা যায়। সরকার যখন সংশোধিত বেতনক্রম প্রকাশ করেন অর্থাৎ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের বেতন ৫০—৮০ টাকা। গ্র্যাজুয়েটদের ৬০-১০০ টাকা, এম, এ, অনার্সদের ৭৫-১৫০ টাকা করলেন তখন নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সারা দেশের শিক্ষকদের বেতন হার পাশাপাশি তুলে ধরতে পেরেছিল। তথ্যগুলি চমৎকার যে—

বোম্বাই প্রদেশে একজন ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েট ৮০-২০০ ; ট্রেইনড্ ইন্টারমিডিয়েট ৬২-১৪০ এবং প্রধান শিক্ষক ৩৫০/১৫০—৫০০/২৫০ টাকা বেতন পান। মাদ্রাজ

সরকার একজন ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েটকে দেন ১৬৫/৮৫—২৪৫/১২৫ টাকা। উত্তরপ্রদেশ সরকার একজন গ্র্যাজুয়েটের বেতন দেন ৮০-১৩২ টাকা। হায়দ্রাবাদ সরকার ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েটদের ১৮০-৩২৫ এবং সিলেকশন গ্রেডে ৩২৫-৪০০ আর আন-ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েটদের ১৫০-২২৫ টাকা বেতন ধার্য করেছিলেন। সেখানে প্রধান শিক্ষকেরা বেতন পেতেন ৩০০-৪০০ টাকা।

নিজ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারী এমন কি সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর বেতন হারে কী অসামঞ্জস্য ছিল নীচের সারণী থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল—

সরকারী কর্মচারী			
(লোয়ার ডিভিশন)	বেতনক্রম	মহার্ঘভাতা সহ	গড় বেতন
সেক্রেটারিয়েট	টাকা	বেতন (টাকা)	(টাকা)
পর্য্যায়ে	৮০-১৮০	১২৭-২৫২	১৮৯ টাকা ৫ আনা
ডাইরেক্টরেট	৭০-১৫০	১১৬-২০৯	১৬২ টাকা ৫ আনা
জেলা পর্য্যায়ে	৫৫-১৫০	৯৪-১৭৪	১৩৪ টাকা
সরকারী কর্মচারী			
(আপার ডিভিশন গ্র্যাজুয়েট)			
সেক্রেটারিয়েট			
পর্য্যায়ে	১৮০-৪০০	২০৯-৫১৪	৩৬১ টাকা ৫ আনা
ডাইরেক্টরেট	১৩০-২১০	২০৯-২৮৫	২৪৭ টাকা
	২০০-২৫০	২৫৯-৩২৫	৩২২ টাকা
জেলা পর্য্যায়ে	১০০-১২৫	১৪১ টাকা ৫ আনা—২৪০	২০৭ টাকা ৭ আনা
সরকারী বিদ্যালয়ে			
আই-এ/ম্যাট্রিক ট্রেইনড্	৭০-১৫০	১০৬ টা. ৫ আনা-১৯৫	১৫০ টা. ৭ আনা
ভাষা শিক্ষক	৮০-১৪০	১১৬ টা. ৫ আনা-২২৫	১৭০ টা. ৭ আনা
আনট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট	৬০-১০০	৭০-১১০	৯০ টাকা
ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েট	৭৫-১৫০	৮৫-১৬০	১২২ টা. ৫ আনা
আন-ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েট	৫০-৮০	৬০-৯০	৭৫ টাকা
ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েট	৬০-১০০	৭০-১১০	৯০ টাকা

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অন্যান্য রাজ্যে যে মহার্ঘভাতা পেতেন, তার তথ্য—

বোম্বাইঃ—সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা। যাঁরা ৪০০ টাকার বেতন পান তাঁদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা পর্যন্ত।

মাদ্রাজ ঃ—৬০-১৫০ টাকা বেতনের জন্য ২৪ টাকা, ১০০-২০০ টাকার জন্য সাড়ে সতেরো টাকা + ৬ টাকা। ২০০ টাকার উর্ধ্ব বেতনের জন্য শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা হারে।

উড়িষ্যা ঃ—১০০ টাকা বেতন পর্যন্ত ২০ টাকা, ১৫০ টাকায় ২২ টাকা, ২০০ টাকায় ২৪ টাকা, ২৫০ টাকায় ২৬ টাকা এবং ৩০০ টাকার ক্ষেত্রে ৩০ টাকা।

ত্রিবাঙ্কুর ঃ—শতকরা ১৫ টাকা হারে।

বিহার ঃ—শতকরা ১২ টাকা হারে।

এসব আলোচনা থেকে দৈনিক সংবাদপত্রগুলি শিক্ষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তথ্যগুলি প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়। নামী পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে নিবন্ধ রচিত হতে থাকে। বিশেষ করে অল্পকালের মধ্যে "সত্যযুগ পত্রিকা" এক সমীক্ষা ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মতামত ধারাবাহিকভাবে বের করে। কলকাতার ১৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৬৩৭ জন শিক্ষকের অবস্থা সম্পর্কে এক নমুনা সমীক্ষা চাঞ্চল্যকর সংবাদ-দেয়। এগুলি—

একজন শিক্ষক ৪১ বছর শিক্ষকতা করে বেতন পাচ্ছিলেন ৭৫ টাকা। ত্রিশ বছরের আর এক অভিজ্ঞ শিক্ষকের বেতন ছিল ৩০ টাকা। শতকরা ৮৩ জন শিক্ষকের বেতন ১০০ টাকা। এঁদের অর্ধেকের বেশী ১০ বছর এবং সিকি ভাগ ২০ বছর চাকরী করবার পর ঐ বেতন পান।

রাজ্যের শতকরা ৫৮ জন শিক্ষক গ্র্যাজুয়েট বা ততোধিক শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। শতকরা ৪২ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা শতকরা আটজন। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের শতকরা ৫০ ভাগ ৭০ টাকারও কম বেতন পান। মাসিক ৬০ টাকা বেতন পান শতকরা ৩·৩ জন শিক্ষক। হিসাবে হাজার করা ১৪ জন শিক্ষকের বেতন ২০১ থেকে ২৫০ টাকা। হাজার করা ৩ জন শিক্ষকের বেতন ২৫০ টাকা, তাঁরা প্রধান শিক্ষক।

সমীক্ষায় স্বীকৃত হয়—কলকাতার সাহায্যপ্রাপ্ত, সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই বেতন পান গড়ে ৬১—৮০ টাকা। এ ছাড়া যাবতীয় শিক্ষকদের বেতনের গড় ৪১—৬০ টাকা। মহার্ঘভাতা স্বতন্ত্র। এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। দেখা যায় কলকাতার পাঁচটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ টাকাও মহার্ঘভাতা দেন না।

কলাকাতার ১২৪টি শিক্ষক পরিবারের অর্থনৈতিক তথ্য সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে মাত্র ৭ জনের ২০১ থেকে ২৫০ টাকা যার মাত্র ৪ জনের আয় ২৫০ টাকার উর্ধ্বে জানা যায়। ২৪ জনের আয় ৬১ থেকে ৮০ টাকা এবং ৯৩ জনের আয় ৪১ থেকে ৬০ টাকা। এক শিক্ষক পরিবারের এতে গড় আয় দাঁড়ায় ২১৫ টাকা। বেতন ও গৃহ শিক্ষকতার দরুন হয় ১১৫ টাকা। পরিবারের লোক সংখ্যার গড় ৮·২ জন। ১·৮ জন উপার্জন করে। ৬·৪ জন পোষ্যর মধ্যে ১·১ জন বেকার। শিক্ষক পরিবারের মাসিক ব্যয় মাসিক আয় অপেক্ষা ২২ শতাংশ বেশী। তাই শতকরা ৮৬টি পরিবার ঋণগ্রস্ত। এই ঋণের গড় ৭৬৪ টাকা। পরিবারের ব্যয়ের ৫০ ভাগ অথবা আয়ের ৬৪ ভাগ শুধু খাদ্য সংগ্রহের জন্যই ব্যয় হয়। আর একজন শিক্ষককে ঐ ১১৫ টাকা আয়ের জন্য মোট ২৩৪·৮ ঘন্টা মাসে পরিশ্রম করতে হয়। তাতে প্রতি ঘন্টায় তাঁর শ্রমমূল্য দাঁড়ায় সাত আনা আট পাই। যা বর্তমানে ৪৮ পয়সা মাত্র। যে কোন মজুর ঘন্টায় এর চাইতে বেশী রোজগার তখন করছিল।

শিক্ষার দাবী জাতির দাবী

শিক্ষকদের অন্তর্জ্বালা বড় তীব্র। বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজছে তখন। শিলিগুড়ি সম্মেলনে ন্যূনতম ২০০ টাকা বেতন ও ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবী গৃহীত হয়েছে। সমিতির নেতৃত্বের কিছু পরিবর্তন সেখানে হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় আগামীদিনের কর্মসূচী এক সংগে গ্রথিত করে প্রচার পত্র তৈরী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্ভূত হলো। মনে হবে ঐ কর্মসূচীতে সাড়া জাগাতেই যেন সেগুলি জন্ম নিয়েছিল। সংগঠন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসূচী রূপায়িত করলো। অবশ্য স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ইংরাজীতে ফেলের বিরুদ্ধে তার আগে থেকেই আন্দোলন চলছিল। ছাত্র ও শিক্ষক একই ভাবে

প্রতিকারের জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের আন্দোলনগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত শিক্ষা-আন্দোলনের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া গেল। এর কিছুদিন আগে রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক বিধানসভা ও বিধান পরিষদে নির্বাচিত। সমিতি ১৯৫২ সালের ২২শে জুন ভারত সভা ভবনে শিক্ষক সভায় তাঁদের আহ্বান করলো। ১৮ জন এম-এল-এ এম-এল-সি উপস্থিত হলেন। সভায় সভাপতিত্ব করলেন সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। শিক্ষা জাতীয় জীবনের অংশ এবং এ রাজ্যে শিক্ষা কিভাবে উপেক্ষিত তার বর্ণনা দিয়ে তিনি সম্মেলন উদ্বোধন করলেন। স্মারকলিপি উত্থাপন করে কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় বললেন—এ দেশের ১৪ শতাংশ মানুষ মাত্র সাক্ষর। জাতীয় পুনর্গঠনে শিক্ষার স্থান যথাযথভাবে করা হয়নি। দেশের প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ। অথচ তাদের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র ১৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর স্থান হতে পারে যতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে প্রতি ২০ হাজার অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ২০ টাকা, একজন মাধ্যমিক শিক্ষকের ৫০ টাকা এবং কলেজ শিক্ষকের বেতন ১০০ টাকা। এই স্বল্প বেতনে কারো পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। তিনি অন্যান্য রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের কুড়িভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে আহ্বান জানান। কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য জে· সি· গুপ্ত এখানে ভাষণ দেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন বাজেট অধিবেশন প্রসংগে বলেন, এবারেও অবস্থা পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত নাই। শিক্ষা সর্বদলীয় ও জাতীয় সমস্যা। এ কারণে কংগ্রেস সদস্যদের এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য বিধান পরিষদের ভেতর ও বাইরে থেকে শিক্ষকদের মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু। তিনি বললেন, "শিক্ষকেরা কেবল নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবী করেননি, তাঁরা দেশকে শিক্ষিত করবার দাবী করেছেন। অধিবেশনের প্রথম দিনই মন্ত্রীদের মাহিনা বাড়াবার প্রস্তাব সরকার তুলেছে। অথচ শিক্ষা ও শিক্ষকদের দিকে তাকাবার সময় তাদের নাই।" নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষকদের মিলিতভাবে শিক্ষা সংস্কারের এবং শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীতে জনমত গড়ে তুলবার আন্দোলন করতে বলেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা দরকার—সেবার সরকার মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বছরে ১০ লক্ষ টাকা বাড়তি ব্যয়ের প্রস্তাব আনেন। এর প্রতিবাদে ২৬শে জুন বিধান সভার সম্মুখে পাঁচ হাজার মানুষ সমবেত হয়। সেখানে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। তাতে ১০ জন আহত হন এবং ১৬ জন গ্রেপ্তার হন। ঠিক এই মুহূর্তে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ খসড়া স্কুল কোড উত্থাপন করলে শিক্ষাজগতে মহা সোরগোল উঠে গেল। পর্ষদের অনুমোদন ও সাহায্যদান উপ-সমিতি তৈরী এই কোড কার্যনির্বাহক কমিটিতে ফেলা হলো। কোড ছিল মহাভারত। স্কুলের কোন কিছুর অনুল্লেখ ছিল না। বিদ্যালয় অনুমোদন বিষয়টিতে কড়াকড়ি ছিল। প্রতি ছাত্রের জন্য ১০ বর্গ ফুট জায়গা না থাকলে নয়। স্কুল কমিটি তৈরী হবে তিনজন হিতৈষী বা বেনিফেক্টর, দাতা আর প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্য থেকে ৩ জনকে দিয়ে। তা ছাড়া যে সব অভিভাবক ১০ টাকা ফি দিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করবেন তাঁদের ভোটে তাঁদের মধ্য থেকে ২ জন অভিভাবক হিসাবে নির্বাচিত হবেন। পরিচালন কমিটি গঠনের লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় কিভাবে পরিচালিত হবে তার নকশা ছিল। স্থানীয় বিত্তশালীরা স্কুল গড়ে দেবার অর্থ জোগাবেন। আর করিৎকর্তা লোকেরা অভিভাবকদের কাছ থেকে বছরে

দশ বিশ হাজার টাকা জোগাড় করে স্কুল চালাবেন। স্কুল কোডে অনেক নিয়ম নীতি থাকলো প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকদের জন্য। তাঁদের একটা বেতনক্রম দেওয়া হলো। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ৫০ টাকা এবং গ্র্যাজুয়েট ৬০ টাকা থেকে শিক্ষকতা জীবন শুরু করবেন। শিক্ষক সংসদের সম্পাদক নির্বাচনের অধিকার তাঁদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হলো। প্রাইভেট টিউশনির অধিকার বিলুপ্ত হলো। স্কুল কোড ছাত্র শাসনের কড়াকড়িতে ভরপুর ছিল। ভর্তির ব্যাপারে নানা বাধা এমন কি সেখানে অভিভাবকদের সম্মান হানির ধারাও ছিল। ছাত্র ধর্মঘটকারীদের শাস্তি দানের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হলো। তাঁর অনুমতি ছাড়া ছাত্রদের ক্লাব ও সভা সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করা হলো।

স্কুল কোডের নাম দেওয়া হলো স্কুল পেনাল কোড। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিভাবকদের হেনস্থা করবার উদ্দেশ্যে ঐ ধারাগুলি বাতিলের দাবীতে জনমত দেখা গেল। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বোর্ডের শিক্ষক সদস্যদের একত্রিত করলেন। আপত্তিকর ধারাগুলি প্রতিরোধের জন্য সদস্যরা— বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, কামিনী কুমার ঘোষ, বামনদাস মণ্ডল, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেন, ফুলরেণু গুহ এবং অনিলা দেবী ৪ঠা জুলাই থেকে শুরু করে আগষ্ট মাস পর্যন্ত অন্ততঃ চারটি সভা করলেন। প্রথমেই নিজেদের ঐক্য গড়ে পর্ষদের অভ্যন্তরে শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রাচীর খাড়া করা হলো। বাইরে গড়ে তোলা হলো প্রবল প্রতিবাদের ঝড়। ছোট বড় সভা ছাত্র ও শিক্ষকরা ডাকলেন। ৯ই থেকে ১৬ই জুলাই সর্বত্র সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশ সমিতির শাখা সংগঠনগুলি পেয়ে গেল। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় সভা হলো। ২২শে জুলাই সমিতির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বহু সাংবাদিক উপস্থিত হলেন। কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় সমিতির আপত্তিগুলি তীক্ষ্ণভাবে কারণসহ তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, স্কুল কোডে বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষকের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। পরিচালন কমিটি এমন হবে "এরপর থেকে কেবলমাত্র অর্থশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা যাঁরা আসলে শিক্ষার কিছুই বোঝেন না, তাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনার নামে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারবেন।" কোডে শিক্ষকদের উচ্চ বেতন বা উন্নতির কোন আভাস নাই। শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশনি না করা সম্পর্কে একই বক্তব্য যে তাঁদেরকে বাধ্য হয়েই এটা করতে হয়। এই 'বিশ্রী রকমের' নিম্ন বেতন নিয়ে 'মানুষের মত' বেঁচে থাকা নিতান্তই অসম্ভব। তাঁদেরকে কমপক্ষে দুইশত টাকা বেতন ও শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে। ছাত্র শাসনের যে বিষয়গুলি সেখানে রয়েছে তা কার্যকর হলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটবে। সেখানে অহেতুক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। রাজ্যের বিদ্যালয় অঙ্গনে যেখানে মদ খাওয়া বা জুয়া খেলা হয় না সেখানে এ সব ধারার উল্লেখ করা কি দরকার। তিনি সরকারকে আহ্বান জানান তড়িঘড়ি করে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেন। পরদিন বেলা সাড়ে পাঁচটায় ভারত সভা হলে সমিতির পক্ষ থেকে এক সভা হলো। সেখানেও পুলিশী রাষ্ট্রের মতো আইন শৃংখলার প্রশ্নটি গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে কোডের সমালোচনা করা হলো। কোন বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ গঠনতন্ত্রের সুযোগ ছিল। সেগুলি বাতিল করে সব স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একই বেতন ও ভাতার দাবী করা হলো। শিক্ষক সংসদ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার, পরিচালন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টি করতে বলা হলো। কমিটিতে ধনিকদের সুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক কাঠামো চালু করতে যাচ্ছেন বলে নিন্দা করা হলো। আপত্তিকর ধারাগুলি দূরীকরণের জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের তীব্র সংগ্রামে চালাতে আহ্বান

দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হলো 'শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটি'-র মাধ্যমে সভা, বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলে একে প্রতিরোধ করতে হবে।

সবাই ব্যাপক কর্মসূচীতে সামিল হতে লাগলেন। ৩রা আগষ্ট ভারত সভা হলে আবার প্রতিবাদ সভা হলো। ৪ঠা আগষ্ট সত্যপ্রিয় রায় ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বোর্ডের সভাপতিকে সমিতির মনোভাব জানিয়ে দিয়ে আসলেন। কলকাতাতে ৯ই আগস্ট হাজরা পার্কে, ১০ই আগস্ট ওয়েলিংটনে এবং ১৭ই আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বড় বড় সভা হলো। ১৮ই আগস্ট স্কুল কোড চূড়ান্তভাবে গ্রহণের দিন ; আগে থেকেই ধার্য ছিল। শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে সেদিন সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক ছিল। উত্তরে দার্জিলিং থেকে শুরু করে সুদূর দক্ষিণের সুন্দরবনের স্কুলটিও তাতে বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত প্রতিরোধ কলকাতায় অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। হাজার হাজার ছাত্র ওয়েলিংটনে জমা হয়। সেখান থেকে সুশৃংখলভাবে রওনা দিয়ে সুরেন ব্যানার্জী রোডে বোর্ডের অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সেখানে প্রায় লক্ষ মানুষের কণ্ঠ স্কুল কোড প্রত্যাহারের দাবীতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। সে কম্পন পর্ষদের কার্য নির্বাহক কমিটির সভায় ধ্বস নামায়। শুরুতেই কোড স্থগিতের প্রস্তাব তুললেন শিক্ষক নেতা শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সমর্থনে একে একে এগিয়ে আসেন নলিনাক্ষ সান্যাল, ডঃ ফুলরেণু গুহ, অনিলা দেবী, বি· এম· মুখার্জী এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি যে সব আপত্তি তুলেছে তার রেশ ধরে তাঁদের আলোচনা (১) পরিচালন কমিটি গঠন, (২) শিক্ষকদের বেতনক্রম, (৩) শৃংখলা এবং (৪) প্রাইভেট টিউশনিকে কেন্দ্র করে চলে। নলিনাক্ষ সান্যাল বললেন, রাজনৈতিক দলগুলি বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করছে। বাইরে রয়েছে প্রচণ্ড উত্তপ্ত প্রতিবাদ। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে জনসাধারণ ভুল বোঝে। দিল্লী থেকে নেমে সরাসরি সভায় উপস্থিত হলেন অন্যতম সদস্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি বললেন, বাইরে থেকে মনে হচ্ছে পর্ষদ কোন অভিসন্ধিমূলক ব্যাপার করতে চাচ্ছে। তিনি দেখেছেন সর্বত্র স্কুল কোড নিন্দিত হচ্ছে। পর্ষদ স্কুল কোডের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু করতে যাচ্ছে না। এতে গোপনীয়তার কি আছে? অতি সহজেই গঠনমূলক বক্তব্যগুলি জানা যেতে পারে। শিক্ষার কোন ক্ষতি হবে না একথা বোঝানোর দায়িত্ব বোর্ডের। "আমাদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে যে কোন ব্যক্তির গঠনমূলক প্রস্তাব আমরা চাই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বোর্ড একটা আইনানুগ সংস্থা, আমরা সরকারের ক্রীড়নক নই।" তিনি শিক্ষকদের বেতনক্রম নিয়ে যে বক্তব্য সেদিন রেখেছিলেন তার গুরুত্বও অসীম। শিক্ষকদের বেতনক্রম যেভাবে ধার্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে পর্ষদ ভাববে যে শিক্ষকদের ভাল বেতন দেবার সঙ্গতি তার কোথায়? কিন্তু তার জন্য পর্ষদ এঁদের ন্যায্য বেতনদানের প্রসংগ অবজ্ঞা করতে পারে না। বেতনক্রম অবশ্যই স্থির করতে হবে। তারপর সরকারের কাছে সেগুলি অনুমোদনের জন্য যেতে হবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তো এমনি ব্যাপার ঘটেছে। শিক্ষকদের বাড়তি বেতনের জন্য ডাঃ রায়ের কাছে যাওয়া দরকার। সরকারের উপর চাপ রাখতে হবে। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের মধ্য দিয়েই সমস্যার মীমাংসা করা দরকার। পর্ষদের উপ-সভাপতি জে· এম· সেন জানালেন, স্কুল অনুমোদনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নির্ধারিত বেতন দেওয়া হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই দেখা হবে। স্কুল কোড আপাততঃ প্রত্যাহারের ব্যাপারে সকলে একমত হলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হলো একটি বিশেষ কমিটি স্কুল কোড সংশোধনের দায়িত্ব পাবে। সত্বর সংশোধিত স্কুল কোড উপস্থিত করা হবে। ২২ জনের ঐ বিশেষ কমিটিতে নির্বাচিত হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডঃ শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি সাত জন পর্ষদ সদস্য। সভার পর ছাত্র প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হলো। পর্ষদের সভাপতি ও উপসভাপতি সভার সিদ্ধান্ত তাঁদের বুঝিয়ে বললেন। ছাত্র সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করলো বিশাল বিজয় গৌরবে।

ঘটনাক্রম নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে উল্লসিত করলো। কিন্তু স্কুল-কোডের দাবী তাঁদেরই দাবী। একে শিক্ষক স্বার্থে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদের কাজ। সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। বাস্তবতার পথ ধরে নিজেদের অনেক দাবীকেই সংশোধিত আকারে পেশ করলেন। স্বভাবতঃ কয়েকটি ব্যাপারে নীরবতা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকল না। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সিলেক্ট কমিটি স্কুল কোডের সংশোধনীর কাজ শেষ করলো। এই ব্যাপারে সামগ্রিক আলোচনার জন্য এবং কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ৯ই নভেম্বর ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে শিক্ষক কনভেনশন আহ্বান করা হলো। তার আগের দিন সমিতি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত হয়েছেন সমিতির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। সাংবাদিকদের সত্যপ্রিয় রায় জানালেন, খসড়া স্কুল কোডের অনেকগুলি ধারা সম্পর্কে এর আগে আপত্তি উঠেছিল। এ নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রচণ্ড আন্দোলন করে। তার ফলে সিলেক্ট কমিটি সংশোধনের দায়িত্ব নেয়। এ কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশ গ্রহণ করেছে। তার ফলে বিতর্কমূলক ও আপত্তিকর বিষয়গুলি বিদূরিত। জনমতের জয় হয়েছে। স্কুলের পরিচালন কমিটির প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যাপারে ভোটাধিকারের জন্য ১০ টাকা চাঁদা আর দিতে হবে না। ছাত্রদের ক্লাব সমিতিতে যোগদানের বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। স্কুল কোডে শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতনহার অন্যূন ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিলেক্ট কমিটি শিক্ষকদের বেতনহারের যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য এই স্তরের অনুমোদিত শিক্ষকেরা ৭০ টাকা, গ্র্যাজুয়েট বা ট্রেইনড্ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ৮০ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ. বা ট্রেইনড্ গ্র্যাজুয়েট ১০০ টাকা, অনার্স, এম. এ, এম. এস. সি ১২৫ টাকা, প্রধান শিক্ষকেরা ১৫০ টাকা বেতন পাবেন। ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষকেরা যোগ্যতা লাভের জন্য তিন বছর সময় পাবেন। যাঁরা এর মধ্যে ৫০ বছর বয়স প্রাপ্ত তাঁদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীযুক্ত রায় জানান, শিক্ষকদের সর্বনিম্ন ২০০ টাকা বেতনের দাবী ও পর্ষদ ঘোষিত ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবী সমিতির রয়ে গেল। এক বছরের বেশী হলো এ সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নীরব। তার পরদিন অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষক সম্মেলন। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। সভাপতিত্ব করলেন সত্যপ্রিয় রায়। সেখানে এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়। (১) মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে খসড়া স্কুল কোডের নানা বিতর্কমূলক ধারায় সংশোধন করে যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। (২) আর্থিক উন্নতি বিধানের অজুহাত করে পর্ষদ ছাত্র বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা শিক্ষা প্রসার নীতি বিরোধী এবং অসঙ্গত এবং (৩) শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন ও ভাতার দাবী সরকার ও বোর্ডের কাছে আবার পেশ করা হোক। সংশোধিত স্কুল কোড ১৭ই নভেম্বর কার্য নির্বাহক কমিটিতে পাশ হলো। সেদিন সাংবাদিকদের পর্ষদের সভাপতি জানালেন, "অর্থ সাহায্যের বিষয়টি শিক্ষকদের বেতনের সংগে যোগ করে যে নতুন নীতি নেওয়া হলো, তা কাজে পরিণত হলে স্কুলে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ বেড়ে যাবে। নতুন নীতির ভিত্তিতে শহর ও পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলি অন্ততঃ দ্বিগুণ আর্থিক অনুদান পাবে।" দুরাশার মধ্যেও পর্বতারোহণ প্রক্রিয়ায় একটা ভাল অবস্থা শিক্ষকেরা তৈরী করে ফেললেন। তাঁরা জানতেন, এ জয় নৈতিক জয়।

সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এগুলি কার্যকর হতে পারে না। তবু এটুকুর মূল্য সেদিন ছিল অপরিসীম।

সংগে সংগে দ্বিতীয় ধাপের লড়াই শুরু হয়ে গেল। বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করবার জন্য সমিতির নেতৃত্ব ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন তৈরী হলো। ৬০ বছর বয়সে অবসর সম্পর্কে সমিতি স্পষ্টতঃ জানালো গ্র্যাচুইটী বা পেনসন না দিলে অবসর নেওয়া যায় কি করে? স্কুলের কেরাণীদের বেতনক্রম স্থির করতে সমিতির দাবী ছিল। এইসব দাবী নিয়ে স্বাক্ষর অভিযান চালানো হলো। তাতে ১১ হাজার শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সই দিলেন। সমিতির নেতারা সেগুলি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হাজির হলো। নেতারা বললেন স্কুল কোডে যে বেতন রয়েছে শুধু তাই দিন। শিক্ষামন্ত্রী বললেন—আগামী আর্থিক বছর থেকে দেখা যাবে। ওদিকে চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বোর্ড-এর কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক করলেন। প্রতিনিধিদল আশা নিয়ে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দরবারে সেদিন উপস্থিত হলেন। ডাঃ রায় সব শুনলেন। তারপর তাঁরা তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "টাকা, টাকা কোথা থেকে আসবে?" হতাশা কাটিয়ে শিক্ষকেরা এগিয়ে চলবার সংকল্প নিলেন। তখন ছাত্র সমাজও এগিয়ে চলছিল। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিশেষ করে শিক্ষা সংকোচের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাগুলিতে ফি বৃদ্ধির প্রতিরোধে, কলেজে নৈশ ক্লাশ বন্ধের সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম চলছিল। ৫২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আন্দোলন তীব্রতর হলো। হাজার হাজার ছাত্র জমায়েতের নেতৃত্ব দিলেন শ্রীনৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন্দু মজুমদার, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছাত্র ঐক্য গড়ে তুললেন। উপাচার্য ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হলো। সরকার ছাত্রদের দাবী মানতে বাধ্য হলো। ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। স্কুল কোড সম্পর্কে তিনি জানালেন, পর্ষদে দু বছর পরিশ্রম করে যা তৈরী করা গেল তা এখন সরকারের আলমারির তাকে তুলে রাখা হয়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। কোডের অভাবে এখন বিদ্যালয়ে সাধারণ প্রশাসনের কোন নিয়মকানুন নাই। শিক্ষকদের বেতনক্রমের সুরাহা এখন পর্যন্ত হলো না। ইন্টারমিডিয়েট ও ভি এম শিক্ষকদের ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারের নীরবতা যন্ত্রণাদায়ক। স্কুল কোড সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত সভা ভবনে শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে কোন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

এই বিশেষ সম্মেলনে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাতে শিক্ষার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তাকে সরকার অযৌক্তিক, অসমীচীন ও লজ্জাস্করভাবে উপেক্ষা করছেন বলা হলো। স্কুলকোড রূপায়িত করতে, গ্র্যাচুইটি না দিয়ে ৬০ বছরে অবসর না করবার জন্য এবং সর্বস্তরের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের কর্মচ্যুত না করবার দাবী তোলা হলো। সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয়ে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে দিচ্ছেন। রাজনৈতিক মতবাদবিশিষ্ট জনপ্রিয় শিক্ষকদের অবাঞ্ছিত বা অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। এতে সরকারের দমননীতি নগ্নভাবে নেমে এসেছে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি রয়েছে অনাহার। "সানুনয় আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। সভা-সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব উপেক্ষিত। সুতরাং এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে বিধানসভায় ব্যয়-বরাদ্দ আলোচনার সময় শিক্ষকদের এই দাবী সরকার ও

বিধানসভার সমক্ষে উপস্থিত করতে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ৫টার সময় সমিতির কার্যালয় থেকে শিক্ষক সাধারণের এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা বের করা হোক।" সমিতির নেতারা সুষ্ঠুভাবে এটি পরিচালনা করবেন। সুদূর গ্রাম ও শহর থেকে যাতে শিক্ষকেরা দলে দলে এ শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারেন তার জন্য জেলা শাখাগুলিকে কাজ করতে হবে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষকদের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন এক অদ্ভুত ঘটনা বলে স্বাক্ষরিত হলো। কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলের, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার শিক্ষক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হলেন। শিক্ষকেরা শান্ত, সংযত ও সুশৃংখল শোভাযাত্রার সূচনা করছেন। বহুসংখ্যক পোষ্টার হাতে বিধানসভা অভিমুখে রওনা দিল। ৫টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে বের হয়ে কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন, ধর্মতলা স্ট্রীট হয়ে পেঁছিল এসপ্লানেডে। সেখান থেকে অকল্যান্ড রোডে। শোভাযাত্রা দেখে পথচারীরা স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকেই নতুন ইতিহাসকে স্বাগত জানালেন। পরদিন সমস্ত সংবাদ পত্রগুলি চিত্রসহ একই বিবরণ প্রকাশ করেছিল। শোভাযাত্রায় ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রীর উপস্থিতিও তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। শোভাযাত্রা বিধানসভার পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথে রাজপথের উপর বসে পড়লে আর এক অভিনব দৃশ্যের সেদিন অবতারণা হয়। এই মিছিলে বহু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা "বুভুক্ষু প্রাথমিক শিক্ষক" ব্যাজ ধারণ করে নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করছিলেন। পোষ্টারগুলি থেকে বিভিন্ন দাবী ধ্বনিত হচ্ছিল। সমিতি থেকে স্মারকলিপি বিধানসভা ও পরিষদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল ৫৩-৫৪ সালের বাজেটে শিক্ষাখাতে ৫৫ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হয়েছে বটে কিন্তু সমস্যা অনুপাতে এটা হচ্ছে অপ্রতুল। অন্যান্য রাজ্যের অনুসরণ করে আমাদের বাজেট বরাদ্দ শিক্ষা খাতে বেশী করা উচিত। রাজস্বের বিশ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হবে। সরকারী প্রেসনোটে ৫ টাকা বাড়তি মহার্ঘভাতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে হাস্যকর ও বেদনাদায়ক। পর্ষদের তৈরী স্কুল কোড ধামাচাপা অছে। মাত্র ২৬টি সরকারী স্কুলের জন্য সরকার যদি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহলে রাজ্যের বারোশত বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব অন্যায় নয় কি? স্মারকলিপিতে ধনী ও বিত্তশালীদের উপর কর ধার্য করে সম্পদ সংগ্রহের প্রস্তাবও দেওয়া হয়।

বিধানসভায়ও এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ডেপুটি স্পীকার সভা পরিচালনা করছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে। পুলিশ শোভাযাত্রীদের গতি রুদ্ধ করেছে। সভা মুলতুবী রেখে ওঁদেরকে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকার মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটানো হোক। তিনি বলেন শিক্ষকদের শোভাযাত্রা এক নজিরবিহীন ঘটনা।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—আমি ওঁদের নেতা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যকে বলেছি। ওঁদের এখানে আসবার প্রয়োজন কি ছিল?

জ্যোতি বসু—বিধানসভা ভবনের সম্মুখে সহস্রাধিক শিক্ষক এসেছেন। আর আপনি বলছেন মাত্র চারজনের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটে সাক্ষাৎ করবেন।

ডাঃ রায়—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীবসু—আপনার এত দেমাক কেন?

এক সময় কংগ্রেস পক্ষ থেকে 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন' বলে প্রচণ্ড চিৎকার চলে। স্পীকার হাতুড়ী ঠুকলেন।

ডাঃ রায়—আমি স্পষ্ট বলছি, আমি বাইরে যাব না। যতদিন আমরা এখানে আছি ততদিন পর্যন্ত বিধানসভার ইতিহাসে এ রকম ঘটেনি।

হেমন্ত বসু—শিক্ষকদের শোভাযাত্রা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। শিক্ষামন্ত্রীর উচিত সেখানে যাওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

চিৎকার। পালটা চিৎকার। 'শেম শেম' ধ্বনি এবং বিরোধীদের সভাকক্ষ ত্যাগ। এর পরে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ প্রসঙ্গে উঠলে—

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন পশ্চিমবঙ্গ ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা এমন কি আসামের চাইতেও শিক্ষাখাতে কম ব্যয় করছে।

শ্রীগণেশ ঘোষ সরকারের শিক্ষানীতির প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। তিনি বলেন রাজ্যে যেখানে স্বাক্ষরের হার নিতান্তই সামান্য সেখানে সরকার শিক্ষা বিস্তারের নীতিকে বর্জন করে চলেছেন। এখানে শিক্ষকদের বেতন স্বল্প এবং স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ছে। তা সত্ত্বেও শিক্ষাখাতে ১১ লক্ষ টাকা বিনা ব্যয়ে পড়ে থাকছে। অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে অসমর্থ। কলেজগুলিতে নৈশ ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে।

ওদিকে বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা শিক্ষক সমাবেশে তখন পৌঁছে গিয়েছেন। হেমন্তকুমার বসু, ডঃ অতীন্দ্রলাল বসু, জ্যোতিষ চন্দ্র জোয়ারদার, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতি বসু, ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জী, লুৎফুল হক, জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী পর পর বক্তব্য রাখলেন। সভা এক ঘন্টা চললো। সমাবেশে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে ললিতকুমার সিংহ এবং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অনিলা দেবী ও সত্যপ্রিয় রায় বক্তব্য রেখেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্যেরা যখন শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাজী হয়নি—এ সংবাদ দিচ্ছিলেন তখন শোভাযাত্রী শিক্ষকদের মাঝখান থেকে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি উঠছিল। সেদিনের মিছিল তো ছিল সম্পূর্ণই নীরব। কিন্তু শেষ অবধি এই নীরবতা অক্ষুণ্ণ থাকলো না। ঘটনাক্রম শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ ও ত্যক্ত করে তুলেছিল।

ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার সংবাদ এবং সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য শিক্ষা আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। ওগুলি—"সেই মৌন মুখ, শান্ত, শান্তিপ্রিয় শিক্ষক সমাজকেও পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসন অবশেষে মুখর করিয়া তুলিয়াছে" (যুগান্তর ২৫।২।৫৩)। "কিন্তু বিধানসভায় তাঁহার ও তাঁহার দলের হাবভাব দেখিয়া সন্দেহ হয়। শিক্ষা ও শিক্ষক এই দুয়েরই প্রতি তাঁহার ও তাঁহার দলের তাচ্ছিল্য অসীম" (সত্যযুগ ২৬।২।৫৩)। "শিক্ষা ও শিক্ষকদের ভাগ্যে উদ্বৃত্ত উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু জুটে না এই প্রচলিত ব্যবহার সংস্কার নহে, আমূল পরিবর্তন ব্যতীত শিক্ষক ও শিক্ষার দুর্গতি ঘুচিবে না।" (আনন্দবাজার ২৬।২।৫৩)। "কিন্তু অভাব-অভিযোগের প্রতিকার যখন কিছুতেই আর হয় না, আবেদন-নিবেদন যখন সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, দুঃখদুর্দশার চাপে জীবন যখন দুর্বিসহ হইয়া উঠে, তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া মানুষ যদি প্রতিকারের একমাত্র শেষ উপায়কেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তা হইলে উহা বিস্ময়ের বিষয় হয় না" (বসুমতী ২৫।২।৫৩)। "মঙ্গলবার সহরে ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। ডাঃ রায় পরিষদ ভবনের সম্মুখে পুলিশ আমদানীতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদপদ হন নাই" (লোকসেবক ২৫।২।৫৩)। "ডাঃ রায় শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মত। শিক্ষকদের দুর্দশা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না কিন্তু ইহা জরুরী। স্বীকার করা দরকার শিক্ষকদের বেতনদান প্রসঙ্গ রাজ্যের কর্মসূচীতে তালিকাভুক্ত" (স্টেটস্‌ম্যান ১১।৩।৫৩)। "এটা সাধারণ ব্যাপার যে শিক্ষা পরিকল্পনা যতই উচ্চাকাঙ্ক্ষার হোক না কেন এর সাফল্য নির্ভর করে শ্রম ভারাক্রান্ত

অর্ধভুক্ত নগ্ন-প্রায় শিক্ষকদের উপর" (অমৃত বাজার পত্রিকা ২৬।৩।৫৩)। "বাংলার ক্ষুধাতুর শিক্ষকরা বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখান। পাঁচ হাজার স্ত্রী-পুরুষের চমৎকার মিছিল। হাজারো লোক এই অভাবনীয় সমাবেশ দেখতে থেমে গিয়েছিল। একই সারিতে এগিয়ে চলছিল শুভ্রকেশমণ্ডিত শিক্ষকের সাথে সদ্যানিযুক্ত এই জীবিকার লোক" (নয়াদিল্লীর ক্রস রোডস্, ৮।৩।৫৩)। "কংগ্রেসী শাসকেরা শিক্ষকদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তু সারা জাতি উহাকে গ্রহণ করিয়াছে নিজের দাবী রূপে" (স্বাধীনতা, ২৬।২।৫৩)।

সমিতির মুখপত্রে শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী লিখিলেন—"অভাব বেদনাক্লিষ্ট শিক্ষক সমাজের আশা ও সান্ত্বনা ছিল বিদেশী শাসক কর্তৃক উপেক্ষিত শিক্ষা ও শিক্ষক স্বাধীন সরকারের দরবারে যোগ্যমূল্য ও মর্যাদালাভ করবে। কিন্তু পাঁচ বছরে স্বাধীন সরকারের শাসনব্যবস্থায় তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের সে আশা, সে সান্ত্বনাকে রূঢ় আঘাতে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। জাতির কল্যাণের প্রতিশ্রুতিমূলক সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে শিক্ষা সংকোচনের অপকৌশলই সরকারী ব্যবস্থার গ্রহণ করা হচ্ছে। এমন কি, শিক্ষকেরা বাঁচবার অধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হতে চলেছেন।"

"প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার মহান ব্রতের সহিষ্ণু সাধকেরা আজ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছেন,—দুঃশাসনের দরবারে আবেদন-নিবেদনের কোন মূল্য থাকে না! জাতির স্রষ্টা যদি তাঁদের ভূমিকা ভুলে যান—ভবিষ্যত তাঁদের ক্ষমা করবে না। তাই শিক্ষা বাঁচাও, শিক্ষককে বাঁচতে দাও— সমগ্র জাতির সামনে এই আবেদন এবং শাসকদের কাছে নিজেদের দাবী পেশ করবার জন্য ২৪শে ফেব্রুয়ারী অনভ্যস্ত কিন্তু সুসংবদ্ধ এবং দৃঢ় পদক্ষেপে রাজপথ ধরে যাত্রা করেছেন পরিষদ ভবন অভিমুখে।

উপবীতধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন ফেজ মাথায় মুসলমান মৌলবী ও পাগড়ী মাথায় শিখ শিক্ষক, লাঠি হাতে ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ শিক্ষকের হাত ধরে চলেছেন সদ্য-পাশকরা তরুণ শিক্ষক, প্রবীণা শিক্ষিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নবীনা শিক্ষিকা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অপূর্ব সমন্বয় ও প্রেরণায় সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মিলিত মিছিল—প্রত্যেকটি অভিভাবকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে তুলবার কামনায় এবং সরকারের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংকোচনের ঘৃণ্য নীতিকে আঘাত করবার দৃঢ়তায় দুর্জয় হয়ে দাবী তুলেছে।"

তিনি আরও লিখলেন, "বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে অবহেলিত থেকেও যাঁরা বিরাট বিশ্ব পরিচয়কে সংহত করে এনে শিশু মানবের কাছে পরিবেশন করেন, ইতিহাসের কোন পাতা তাঁদের অজানিত নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁরা জানেন, ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ দুর্বলতার পরিচায়ক সেখানে ক্ষমাহীনতায় কঠোর হয়ে উঠতে হয়। বুনো রামনাথের আদর্শের স্তোক প্রচারকদের মিথ্যা ধোঁকাবাজি ও উপেক্ষা বাস্তবের সামনে নগ্ন হয়েই ধরা পড়ে গেছে। মোহমুক্ত মন বলিষ্ট চেতনায় উপলব্ধি করেছে দাবী আদায়ের পথ, একতা ও সংগ্রামের পথ ; না হলে শিক্ষা ও শিক্ষকের ভবিষ্যৎ ধোঁকাবাজদের কালো হাত ক্রমাগত মসীলিপ্ত হতেই থাকবে। তাই শিক্ষক মিছিল প্রাণধারণের দাবীটুকু জ্ঞাপন করতে এসে বাধা পেলেও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল না। —পরিষদ ভবনের রুদ্ধদ্বারের বাইরে রাজপথ পরিবর্তিত হলো জনসভায়। নৈরাশ্যের প্রকাশ নয়, ধ্বনিত হলো এগিয়ে চলবার দৃঢ়বদ্ধ আন্দোলনের কঠিন শপথ। উদ্ধত কংগ্রেসী সরকার অপমান করেছেন জাতির স্রষ্টাদের, শিক্ষার দাবীকে করেছে প্রত্যাখ্যান, কিন্তু সর্বসাধারণ পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে তাঁদের দাবীকে নিজেদের দাবীর একই সারিতে।"

অচিরে এমন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়াজ উঠলো—"শিক্ষকের দাবী জাতীয় দাবী", "শিক্ষার দাবী জাতির দাবী"—"জাতির দাবী মানতে হবে", এই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে "শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী, জাতীয় দাবী মানতে হবে" উচ্চারণে মুখরিত যা আজ সর্বস্তরের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সংস্কৃতি কর্মী, শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, এক কথায় সবারই বহু উচ্চারিত প্রিয় স্লোগান।

পাঁচ

সংগঠন ও সংগ্রাম

১৯৫২ সালে শিলিগুড়ি সম্মেলন শিক্ষক সংগ্রামের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়। এ কারণে সম্মেলনের আগে ও পরে সাংগঠনিক অবস্থাগুলি লক্ষণীয়। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জন্মলগ্নে বাংলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সাড়ে আটশত। একশত থেকে শুরু করে ২৬০ এবং পরে ১৯২৫ সালে ৪৬২টি বিদ্যালয় সমিতির সদস্য হয়: তারপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করা হয় "সমিতির বিগত পাঁচ বছরের কার্যের ফলে অসাড় শিক্ষক সমাজে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। প্রথমে সমিতির উপকারিতায় অধিকাংশ শিক্ষকের আস্থা ছিল না। অনেকেই প্রকাশ্যেই বলিতেন যে এই সমিতির দ্বারা শিক্ষকদিগের কোনও হিতসাধন হইবে না—সর্বাঙ্গে যার ক্ষত, তার প্রলেপ দিবে কোথায়? সুখের বিষয় যাঁহারা এইরূপ সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দূরে ছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই ইহার সার্থকতা স্বীকার করিতেছেন এবং সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। সভ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরে প্রায় সাড়ে সাতশত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে।......ভ্রাতৃগণ স্মরণ রাখিবেন যে আমাদের সহায় অপর কেহ নাই—আত্মশক্তির দ্বারা আমাদের কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।" এর অব্যবহিত আগে কলকাতা ও নোয়াখালিতে গান্ধীজীর আগমন ঘটলে সমিতি থেকে তাঁকে উভয়স্থানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই সুর সম্পাদকের বিবৃতিতে উচ্চারিত হয়েছিল। গান্ধীজীর বিবৃতি সমিতির মুখপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল— "আপনাদের অদৃষ্ট দেশের অদৃষ্ট আপনাদের হাতে", "যদি আমাদের স্বরাজ বহুলাংশে আমাদের প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়, তাহলে শিক্ষকদের উন্নতিও তাদের নিজেদের চেষ্টায় সম্ভব।" বিভিন্ন কর্মসূচীতে এবং শিক্ষকদের প্রতিরক্ষায় সমিতি ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে। ত্রিশ দশক থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা করে এবং টেস্ট পেপার চালু করে সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। আবার দুর্গত শিক্ষক পরিবারকে সাহায্যের জন্য "টীচার্স বেনিফিট ফাণ্ড" তৈরী হয়। অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সদস্যেরা সাহায্য দেন। এ ছাড়া দুর্গত মানুষের সাহায্যে সমিতির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। দুঃস্থ শিক্ষকেরাও প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিতে এগিয়ে আসতেন এবং নিজেদের চাঁদা দিয়ে সমিতির সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতেন। ৩১ সালে বাংলার প্রবল বন্যায়, ৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায়, পরবর্তীকালে কয়েকবার অজয় দামোদরের বন্যায়, দুর্ভিক্ষে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে সমিতি ভূমিকা নেয়। শিক্ষা সংস্কার ক্ষেত্রে সমিতি কতকগুলি দায়িত্ব নিজে পালন করতে থাকে। বিদ্যালয় শিক্ষায় শারীর শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সমিতি শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সাল থেকে কয়েক বছর শারীর শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ২৯ সাল থেকে সমিতির জেলা শাখা সংগঠন গড়বার কাজ শুরু হয়। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে প্রতিটি জেলায় এই সংগঠন গড়ে উঠে। এসময়ে সাড়ে বারো শত বিদ্যালয় সমিতির সদস্য হয়। চল্লিশ দশকে মহকুমা সমিতি গঠনের প্রক্রিয়া আসে। প্রতি বছর এক এক জেলায় সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হতো। জেলা শাখা অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে জেলা স্তরে সংগঠনটিকে নিয়ে নড়াচড়া শুরু করতো। এ সব কাজকর্ম পঁচিশ বছরের মধ্যে সমিতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। দেশবিভাগের পর সদস্যসংখ্যা কমে যায়। পূর্ববাংলা থেকে সমিতির কর্মীরা ক্রমান্বয়ে এদিকে চলে আসেন। পূর্ববাংলা থেকে আগত সমিতি সদস্যদের এদিকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে যোগাযোগের এক কর্মোদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁদের চাকুরীলাভে এদিকে সমিতিতে নতুন শক্তি সঞ্চার হয়। জেলা সমিতিগুলি সক্রিয় হতে শুরু করে। সমিতির শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে কলকাতা জেলা শাখা সবচেয়ে বেশী ভূমিকা নেয়। ৪৮ সালের প্রতীক ধর্মঘটের পর সমিতি কর্মীরা দৈনিক বৈঠক শুরু করেন। শিক্ষক স্বার্থে লড়াইয়ের সাথে সাথে সদস্য সংগ্রহে তৎপর হন। তাতে কেন্দ্রীয় সমিতির নেতৃত্ব অন্যান্য স্থানে সমিতির শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা ও প্রস্তাব নিতে থাকেন। সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন জেলায় বাড়াবার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। সমিতির প্রখ্যাত নেত্রী বহরমপুরের পুষ্পময়ী বসুকে বিভিন্ন জেলায় যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি সম্মেলনের আগে সদস্য-বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯৯। দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষক সদস্য হলে সেই বিদ্যালয়কে সদস্য বিদ্যালয় বলা হতো। ২৪ পরগনা, কলকাতা ও বর্ধমানে সদস্য ছিল সব চেয়ে বেশী। চল্লিশের মত সদস্য বিদ্যালয় ছিল মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া তিন জেলার প্রতিটিতে। তথাপি কতকগুলি শাখা সমিতির নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে সমিতিতে আলোচনা চলছিল। সম্মেলনের অব্যবহিত আগে (বহুদিন পরে) আবার মহকুমা স্তর থেকে কার্যকরী সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলে। শিলিগুড়ি সম্মেলনে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর কার্যকরী সমিতি থেকে অন্যান্য পদাধিকারীরা নির্বাচিত হয়ে এলেন। দু'জন মহিলা প্রতিনিধি, সংখ্যালঘু শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে এ্যামিয়েল রঞ্জিত রায় (স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল) এবং মৌলভী আবদর রহমান (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল) কার্যকরী সমিতির সদস্য হলেন। সমিতি সদস্যদের কাছে কয়েকমাসের কর্মসূচী পেঁছল। কেন্দ্রীয় সমাবেশের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করতে কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় আবেদন রাখলেন। বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী অনুমোদন বা অনুদান প্রত্যাখ্যান করতে নিষেধ করলেন। সমিতির আন্দোলনের সাথী হতে আর সদস্য হয়ে সমিতিকে শক্তিশালী করতে তাঁর বিবৃতি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে পেঁছল। ৫২ সালের জুলাই মাস থেকে সাংগঠনিক তৎপরতা প্রবলভাবে শুরু হয়ে গেল। সব এলাকা সমানভাবে সংগঠিত করবার দিকে নজর দেওয়া হলো। মহকুমা শাখাকে ভিত্তি করে কাজ এগিয়ে চললো।

এ জন্য প্রতি জেলায় অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। জেলা নেতাদের সাথে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা এই কমিটির মারফত এগিয়ে চলেন। জেলা ও মহকুমা সমিতির গঠনতন্ত্র তৈরী করে কাজের ধারা নির্দিষ্ট হয়। স্থির হলো, জেলা সমিতি-র কাজ হবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য মহকুমা সমিতিগুলির সমন্বয়ের কাজ করা। তাদের আর্থিক দায় মেটাবার জন্য স্কুল প্রশ্নপত্র তৈরী ও বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়। মহকুমা সমিতির গঠনতন্ত্রে কাজের তালিকা থাকে। থানা এলাকা থেকে প্রতিনিধিরা মহকুমা কার্জকরী সমিতিতে নির্বাচিত হবেন। আর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য নির্বাচনে স্কুলগুলিতে ভোটের কাজ চালাতে হবে। মহকুমা সমিতির দায়িত্ব এভাবে স্থির করবার মধ্য দিয়ে সমিতির সম্বন্ধ শাখা সংগঠনের মাধ্যমে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে সর্বস্তরে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ১১২টি বিদ্যালয় নতুন করে সদস্য হয়। আংশিকভাবে সদস্য হয় ২৩১টি বিদ্যালয়ে। এ সময়ে সদস্যহারের

বিপুল বৃদ্ধি ঘটে কলকাতা ও ২৪ পরগণায়। অবশ্য সেই সময়ও ২০০টি বিদ্যালয় সদস্য করা যায়নি।

“নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১৯২১ এ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ সমিতির একটি মুখপত্র প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।” †[২৭] এই ব্যাপারে অগ্রগামী ও গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলেন সনাতন ধর্ম স্কুলের হেমদাকান্ত চৌধুরী। তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন যে সমিতি স্থাপন করে অথবা বাৎসরিক সম্মেলন করে অল্প সংখ্যক শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হবার সাথে সাথে যোগাযোগের ধারাবাহিকতার স্বার্থে মুখপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এরূপ পত্রিকা প্রকাশ করা যায় যা শিক্ষকদের মুখপত্র হবে অথচ গল্প, উপন্যাস, কথিকা সহ সাধারণের সুখপাঠ্য হবে। এর জন্য এর নাম হয় “শিক্ষা ও সাহিত্য।” “টীচার্স জার্নাল” নামে তার সাথে ইংরাজী অংশ জুড়ে বাংলা ইংরাজী উভয় ভাষাতে প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রেস অ্যাক্টের কড়াকড়ির মধ্য দিয়ে পুলিশী পরীক্ষার চূড়ান্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পত্রিকা বের হতে শুরু করে।

“সে যুগে শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য মনোবিজ্ঞান, পাঠনরীতি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের রচনা দ্বারা পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই পত্রিকার লেখকদের অন্যতম ছিলেন।” †[২৭] চল্লিশ দশক অবধি সমিতির নেতারা যেমন চাইতেন মুখপত্র ঠিক তেমনিভাবে চলছিল। কোন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থাকতো না, সমিতির সংগ্রামের বিষয়বস্তুগুলি তেমন করে প্রকাশ পেত না। শিলিগুড়ি সম্মেলনের পর অনিলা দেবী সহকারী সম্পাদক হলে অবস্থার পরিবর্তন হলো। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক সমাবেশ শিক্ষক সমাজকে মানসিকভাবে নিয়ে এলো সংগ্রামের কুলে। এর প্রতিফলন দেখা গেল নিবন্ধ, গল্প, কবিতা সৃষ্টির মধ্যে। শিক্ষকেরা নিজেদের অবস্থা বিবৃত করতে শুরু করেছেন, মুখপত্রে তার ছাপ পড়ে। শাসক কংগ্রেসের নির্মম উপেক্ষা তাদেরকে ঘৃণিত করে তুলছিল। “দয়া কর” কবিতায় এক শিক্ষক বললেন—

হে অমিত বীর্য বিনয়াবনত রাজাধিরাজ,
হে পরম দয়ালু দরদী ভাগ্য বিধাতা!
যারা বলে তোমার দম্ভের সীমা নেই,
যারা বলে তুমিও ছোট ছিলে—ছাত্র ছিলে একদিন
দীক্ষা গ্রহণ করেছিলে শিক্ষাগুরুর কাছে,
তারা তোমার বিরোধী পক্ষের লোক—
অযথা খুঁত ধরে বেড়ানই তাদের কাজ,
তারা সংকীর্ণমনা! তাদের ক্ষমা করো।

হে গুরুদেব!
পৃথিবীর আদিমতম গুরুর মূর্তিমান বিগ্রহ।
করুণার শান্তিজলে ধুইয়ে দাও
আমাদের পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতা।
সমাজের হিতসাধনে তোমার পুষ্ট কলেবর
তিলে তিলে নিঃশেষিত।
কি গভীর কৃচ্ছ্র সাধন তোমার!
আমরা অন্ধ। হে চক্ষুষ্মান্,
আমাদের দয়া কর।

আমরা বিভ্রান্ত, আমরা বুভুক্ষু,
আমরা বুঝিনি তোমার সহানুভূতির বিশালতা
তোমার তপোবনের শান্তিভঙ্গ করেছি অন্যায় বিক্ষোভে
আমরা অধৈর্য।
হে ধৈর্যের হিমালয়, আমাদের ক্ষমা কর।"

এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন নিবেদন নয়, রাজপথই প্রকৃষ্ট—এই উপলব্ধিতে পৌঁছে বারিদবরণ ঘোষ তৈরী করলেন,—

"রাজপথ! তুমি উঁকি দিয়ে কভু দেখেছ কি মোর ঘরে?
রিকেটি শিশুর কংকাল আর আবর্জনার স্তূপ
সঞ্চিত ব্যথা পাষাণ পাথরে, মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরে
গুমরিয়া কেঁদে ঘরে মোর প্রিয়া একদম নিশ্চুপ।"

তাঁর চিত্তগ্রাহী কবিতাটি চুঁচুড়া সম্মেলনে পঠিত হয়।

দীর্ঘ কবিতা শেষে হতাশা কাটিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর এই আহ্বান ছিল—

"ওঠ জাগ ভাই, হুমকী ওদের দুই পায়ে দলি চল
উদ্ধত শিরে ফিরায়েছে যারা শিক্ষক মহাজনে
তাদের গর্ব খর্ব করিতে রাজপথ তুমি বল
নিপীড়িত তাই একতা মোদের হাতিয়ার আজি রণে।"

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক ও সত্যপ্রিয় রায়, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পদাধিকারী হিসাবে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর প্রতি সমিতির অভিনন্দন শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশ করলেন—

শিক্ষক ও শিক্ষিকা ভ্রাতা ভগ্নিগণ,

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পতাকাতলে দাঁড়াইয়া শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবী মুখরিত যে ঐতিহাসিক ২৪ শে ফেব্রুয়ারী আপনারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য দেশের সমস্ত মানুষ আপনাদের অকুন্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে নতুন মর্যাদা দান করিয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে আমরাও আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোবৃত্তি ও ঔদাসীন্যের প্রতি কঠিন আঘাত দিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজন দুর্বার শিক্ষক আন্দোলন।"

সংগঠন ও সংগ্রাম এবং সংগ্রাম ও সংগঠন। সংগঠন ছাড়া শক্তি সঞ্চয় করা যায় না এবং শক্তি ছাড়া কোন সংগ্রাম জয়লাভ করা যায় না এই ভাবধারায় মুখপত্র চালিত হতে লাগলো।

সমিতি সংগ্রামমুখী হবার সাথে সাথে শিক্ষকদের উপর প্রতিক্রিয়ার আঘাত নতুন কায়দায় নেমে আসে। হুগলী জেলার ভদ্রকালী স্কুলের সম্পাদক তো সমিতি গড়ার অধিকারের প্রশ্নকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। মিছিলে অংশ নেবার অপরাধে শিক্ষক বরখাস্ত হলো। স্কুলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রের পরিপন্থী কার্যকলাপ বন্ধের নামে সচেতন শিক্ষকদের সন্ত্রস্ত করে তোলা হলো। সরকারের দমন নীতি চললো স্কুল কলেজে সরকারের অমনোনীত রাজনৈতিক মতবাদ বিশিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন জনপ্রিয় শিক্ষকদের উপর। কোন ক্ষেত্রে তাঁকে অনভিপ্রেত, কোন ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত আখ্যা দিয়ে এঁদের তাড়াবার ষড়যন্ত্র চললো। বেলেঘাটা হাই স্কুলে সমিতির কর্মী শ্রীশিবপ্রসাদ দাস যিনি পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁকেও বিপন্ন হতে হলো।

পরিচালন কমিটিগুলিকে জানানো হলো শিক্ষক সম্পর্কে কোন আপত্তিজনক অভিমত থাকলে সরাসরি ডি-আই-জি এবং লর্ড সিনহা রোডে আই-জি বিভাগে খবর পাঠান। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা হননে এত নগ্ন ও ব্যাপক হয়ে উঠলো যে গোয়েন্দাগিরির কাজ বিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

ভয়ভীতি অতিক্রম করে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা তাঁদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে ২৮তম সম্মেলন চুঁচুড়াতে সমবেত হবার প্রস্তুতি নিলেন। ৫৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রস্তুতির কথা বলা হলো। শিক্ষক আন্দোলন যে চূড়ান্ত গতি ও বাঁক নিয়েছে এই সম্মেলন তার বহির্গমনের সবুজ সংকেত দেবে সাংবাদিক সম্মেলনে সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৩ই এপ্রিল পৌনে বারোটায় তিন হাজার প্রতিনিধির সম্মুখে মংগলাচরণ ও বন্দেমাতরম সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘটলো। সভাপতি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণের অধ্যক্ষ জে. এম. সেন। অভ্যর্থনা সমিতির সুধীর চন্দ্র রায়ের ভাষণের পর সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, অডিটেড একাউন্টস্ এবং বাজেট পেশ করেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা, স্কুল কোড, শিক্ষকদের দুরবস্থার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য, শিক্ষার আন্দোলন এবং সমিতির সংগঠনের বছরওয়ারী তথ্য উপস্থিত করলেন।

পরদিন ১৪ই এপ্রিল সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে, বিনা বিচারে আটক আইনের মেয়াদ বাড়াবার বিরুদ্ধে, উত্তর প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে, স্কুল কোড সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করে সার্কুলার আকারে আংশিক রূপায়ণের প্রতিবাদে, রাজনৈতিক কারণে শিক্ষক ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে পৃথক প্রস্তাব দেওয়া হয়। আন্দোলনের কর্মসূচী মূল প্রস্তাব হিসাবে উত্থাপন করেন সত্যপ্রিয় রায়। সমর্থন করেন অনিলা দেবী। এই প্রস্তাবে বলা হয় জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষার অগ্রগণ্য দাবী আমাদের জাতীয় সরকার স্বীকার করেন নি। অজস্র অর্থ ব্যয়িত হলেও তাতে শিক্ষার গুরুত্ব কম করা হলে পরিকল্পনাগুলি শূন্যগর্ভ হতে বাধ্য। এতে পুরোটাই অপব্যয় হয়ে যাবে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিক্ষাখাতে ব্যয় ক্রমশঃ কমিয়ে আনা হচ্ছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য দরিদ্র শিক্ষকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার কোন প্রতিফলন, সে প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই। মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধির পর্ষদ সুপারিশ বিষয়ে সরকার নির্বাক। শিক্ষা সম্পর্কে তারা নির্লজ্জনীতিহীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী পাঁচ হাজার শিক্ষকের, মিছিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে তাঁরা যে ঔদ্ধত্য ও অহমিকার পরিচয় দিয়েছেন তাকে শিক্ষকেরা কখনই ক্ষমা করতে পারে না।

"এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, শিক্ষকদের দাবী অবিলম্বে গৃহীত না হইলে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ আগামী ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকবর্গকে বেতনহার ও ৩৫ টাকা দুর্মূল্যভাতা দিবার সুপারিশকে কার্যকরী করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য হইতে বিরত থাকিবেন। শিক্ষকদের এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত সরকারকে অবিলম্বে জানাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছে এবং আশা করিতেছে এরপর অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার পূর্বেই শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবী মানিয়া লইয়া সরকার দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিবেন।" উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা নির্দ্বিধায় বাহু উত্তোলন করে আগত সংগ্রামকে স্বাগত জানান। আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের কাজে এবং অভিভাবক, শিক্ষাব্রতী মাত্রেই সমস্ত দল ও মতের চিন্তাশীল মানুষদের

ঐক্যবন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় এই উদ্দেশ্যে (১) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে কর্মপরিষদ গঠন করতে হবে, (২) সমর্থনে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে, (৩) সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে, (৪) শিক্ষকেরা সংগ্রাম তহবিলে ৫ টাকা চাঁদা দেবেন ও জনসাধারণের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাও নেবেন এবং (৫) ৩রা আগষ্ট থেকে ৯ই আগষ্ট ১৯৫৩ অবধি একটা শিক্ষা সপ্তাহ পালন করতে হবে।

আন্দোলনের ইতিহাসে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চুঁচুড়া সম্মেলনের গুরুত্ব অনবদ্য। সুবিশাল মন্ডপে বৈশাখের রৌদ্রতাপে দার্জিলিংয়ের পর্বত থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার শিক্ষকেরা এক জাঁকজমক পূর্ণ সম্মেলনে সমিতির পতাকাতলে মিলিত হয়েছিলেন যেখানে মূর্ত হয়েছিল শিক্ষকেরা এক ও ঐক্যবন্ধ, আব তাঁদের দাবী আদায়ে সমস্ত পরীক্ষা যখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তখন সময় এসেছে আঘাত হানার। সংহতি আর পারস্পরিক বিশ্বাসের চরিত্রে সম্মেলন একটা মাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যাতে ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে তাঁদের বাধ্য হয়েই চূড়ান্ত পথ নিতে হবে এই ঘোষণাকে দীপ্ত করেছে।

সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো পদাধিকারী নির্বাচনে। সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। ১৮৮৮ সালে বর্ধমান জেলার ন পাড়া নাদনঘাটে তাঁর জন্ম হয়। অপর দুভায়ের মত তিনি উচ্চ সরকারী চাকুরী না করে দেশপ্রেমের তাগিদেই শিক্ষকতা বৃত্তি নিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুলে এলেন। এখানে তাঁর সহশিক্ষক মধুসূদন দত্তকে পরিচালন কমিটি অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করলো। কোন প্রতিকারের উপায় বের করতে না পেরে শিক্ষকদের সংঘবন্ধ হওয়া দরকার এই অনুভূতি নিয়ে কলকাতায় এলেন। ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে থেকে তখন সমিতি গড়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছিলেন এবং যথাসময়ে তাতে অংশ নেন। শিক্ষক ঐক্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড আশা। তাই প্রথম থেকে সমিতির যে কোন দ্বন্দ্বেই একটা মাঝামাঝি পথ নিতে চাইতেন। তাঁর সততা ও বিনম্র ব্যবহার তাঁকে বরাবর জনপ্রিয় করে রেখেছিল। মুসলিম লীগ সরকারের মধ্যশিক্ষা বিল প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তিনি জনমত জাগ্রত করেন। প্রথম থেকে সম্পাদক বা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। ১৯৫৪ সালে অবসর নেবার পর দীর্ঘদিন সমিতি সদস্য হতে পারেননি বটে কিন্তু সমিতির সঙ্গে তাঁর ছিল নিরন্তর সংযোগ। গঠনতন্ত্র সংশোধনের ফলে তাঁর সদস্য হবার যোগ্যতা হলে সহযোগী সদস্য হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমিতিতে থাকবার সুযোগকে সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং তার জন্য গর্ব করে বলতেন, "আমি এ. বি. টি. এ-র সদস্য থেকেই মরতে চাই।" সম্মেলনের পরে কার্যকরী সমিতি সত্যপ্রিয় রায়কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করলো। অনিলা দেবী হলেন মুখপত্রের সম্পাদক। তাঁর সহকারী ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ হলেন। নৈহাটি মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মল চন্দ্র গুপ্ত ও কালীধন গার্লস-এর প্রধান শিক্ষিকা ডঃ ফুলরেণু গুহের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পরিচয় দিয়েছিল।

সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে

শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী মাত্রেই চুঁচুড়া সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের স্রোতে চালিত হলেন। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ৪৮ ও ৪৯ সালের শিক্ষক আন্দোলন শিক্ষকদের চেতনায়

আঘাত করেছিল। ঐ সময়ে সমিতির মুখপত্রে বর্ধমানের প্রখ্যাত শিক্ষক নেতা তারাকুমার মিশ্র লিখেছিলেন "আমাদের এই নবজাগরণের দিনে আসুন সকলে একতাবন্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপন করি। একথা ভুলিলে চলিবে না—আমরা রাজনীতি না করিলেও রাজনীতি আমাদের স্কন্ধে আসিয়া চাপিবেই। কারণ সমুদ্রে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের ঢেউ লাগিবে না—এ অতি অবান্তর যুক্তি।" পূর্ববাংলা থেকে গৃহহারা হয়ে কাতারে কাতারে মানুষ আসছিল। মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, নিবর্তনমূলক আইনের প্রতিবাদে সরকার বিরোধী সমাবেশ ঘটছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতো। রাজ্যে ১৯৪৮ সাল থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়। তখন থেকে পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের উপর ব্যাপক দমননীতি চলতে থাকে। গ্রেফতার হয় অসংখ্য সংগঠকেরা। প্রকাশ্যে পার্টির কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গেলেও জনমতের সমর্থনে তার আদর্শ প্রচার অব্যাহত থাকে। বাধা পেয়েও সমর্থনের আকার বেড়েই চলে। ১৯৫১ সালে হাইকোর্ট পার্টির বে-আইনি ঘোষণাকে নাকচ করে দেয়। পর পরই দেশের সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে এই নির্বাচনে অংশ নেয়। জনগণের আশু দাবী সহ শিক্ষার অধিকার লাভের আন্দোলনে অংশ নেবার প্রতিশ্রুতি তাতে রয়েছিল। নির্বাচনে প্রার্থী হলেও কমিউনিস্ট নেতাদের ও অন্যান্য কর্মীদের তখনও জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ কিভাবে অগ্রসর হতে চাইছিল তার প্রমাণ নির্বাচনে ফলাফলে প্রকাশ পায়। বিধানসভার ২৩৮টি আসনে নির্বাচন হয়। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও ১১টি কংগ্রেস-বিরোধীদল আসন পায় ৮৭টি। বিভিন্ন জেলা থেকে ২৮ জন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হন। দমন পীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বুদ্ধিজীবী মহলকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রভাব শিক্ষকচিত্তেও পড়েছিল। তাই চুঁচড়া সম্মেলন ও তার মূল প্রস্তাব প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিল এবং ধর্মঘট সময়োচিত পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দেবার কাজে সবিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। মে মাসের প্রথমে কৃষ্ণনগরে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ২৪ পরগণা জেলা সমিতির সম্মেলনে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। চুঁচুড়া সম্মেলনের প্রস্তাব এই সম্মেলনগুলিতে স্বীকৃতি লাভ করলো। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে শিক্ষা সংস্কার কমিটির পক্ষে কয়েকজন প্রার্থী জয়লাভ করলেন। এর মধ্যে শ্রীযুক্তা অনিলা দেবীর জয় সংগ্রামের পক্ষে জনমত তা প্রতিপন্ন করছিল।

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন না দিলে শিক্ষাখাতে ব্যয় না বাড়ালে শিক্ষা তথা জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এই মর্মে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রচারিত হল। তাতে শিক্ষার দাবীগুলির সাথে শিক্ষকদের বেতনভাতার কথা স্পষ্ট করেই ছিল। জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হলো—"কেবল শিক্ষকদের দাবীতেও নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণের দাবিতে এই আন্দোলনে জাতির কল্যাণকামী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য আমাদের কাম্য। আমাদের ভরসা আছে আমাদের এই আন্দোলন আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করিবে।" মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, বীণা মজুমদার (সেনগুপ্ত), বেলা ঘোষ ও অজিত দাস প্রচার উপসমিতির সভায় শিক্ষা সপ্তাহের কর্মসূচী তৈরী করলেন। ৯ই আগস্ট কলকাতায় বৃহত্তর সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এ উপলক্ষ্যে। সপ্তাহ উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে প্রদর্শনযোগ্য ৩৩০০ পোস্টার, বাইরে প্রচারের জন্য ১৫

হাজার পোস্টার, এক লক্ষ প্রচারপত্র আর আড়াই হাজার সমিতির দু রঙা সূর্য পদ্মকোরক লাঞ্ছিত পতাকা তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পরে পতাকার সংখ্যা আরও ছয়শত বাড়াতে হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের সমস্যা জনসাধারণের সমস্যা। এই সমস্যাগুলি কি সে সম্পর্কে সমিতির মুখপত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রচার শুরু করেছিল। আদর্শ কি হতে পারে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা পত্তনের কথা বলা হচ্ছে কেন এ বিষয়গুলি উপস্থিত হয়। তার সম্পাদকীয়তে লেখা হলো—মুষ্টিমেয় কতকগুলি বিদ্যালয়ে সরকার ঘাটতি সাহায্য দিচ্ছেন। দেশের আর্থিক অবস্থা এমন যে অভিভাবকেরা ছাত্র বেতন দিতে পারে না। ম্লানমুখে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নাম কাটিয়ে চলে যায়। আর ছাত্র সংখ্যা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট আর একটু বেশী করে ঘনীভূত হয়। উদ্বাস্তু ছাত্রদের শিক্ষায় সরকারী সাহায্য দেবার কথা। কিন্তু তা এত শর্তকন্টকিত ও বিলম্বে প্রাপ্ত হয় যাতে অযথা সংকট বাড়ে। তার উপরে চলছে শিক্ষক ছাঁটাইয়ের কারবার। শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা নিন্দা করা হয়। চুঁচুড়া সম্মেলন এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে চায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়। দেশ গড়ার স্বার্থে শিক্ষকদের দাবীকে সমর্থন করতে আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য মুখপত্র বলে, 'শিক্ষকদের দাবী শিক্ষার দাবী, শিক্ষার দাবী জাতির দাবী, জাতির দাবীর সামগ্রিকতার মধ্যে শিক্ষকেরাও তাঁদের স্থান নিশ্চয়ই করে নেবেন।' ক্রমশঃ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলি আরও ভাস্বর হয়ে উঠলো। সম্পাদকীয়তে লেখা হলো—'যে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন ১৯৪৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর সংগ্রামী চেতনায় আত্মপ্রকাশ করেছে, যে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী জনসাধারণের পাশে রাজপথ চিনে নিয়েছে, ৯ই আগষ্টের মহান সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক, ১০ই ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় আকারে। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় একজন মাত্র সব্যসাচীকে তৈরী করে, একজন মাত্র দ্রোণাচার্য' যদি লক্ষ লক্ষ সব্যসাচী তৈরী করবার এবং লক্ষ লক্ষ একলব্যের 'বাস্তব গুরু' হবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে ওঠেন, নতুন বাংলা তথা নবভারত রচনায় তাঁদের সমিতির সংগ্রামী ভূমিকাকে সেদিন কোন অন্ধকারে, কোন অধর্ম, কোন দর্পী শক্তি অস্বীকার করবে।'

এ সময়ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে শিক্ষক ছাটাই চলছে। পেনশন বা গ্র্যাচুইটী ছাড়া ষাট বছরের শিক্ষকদের বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। করণিক ও অধস্তন কর্মীদের দুরবস্থার বিরুদ্ধেও সমিতি সোচ্চার হয়েছিল। মুসলীম লীগ আমলেও সরকারী মহার্ঘ-ভাতার ব্যাপারে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীর কোন বৈষম্য করা হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস সরকার শিক্ষাকর্মীর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করছে। অথচ অর্থ তাঁদের নিতান্তই কিঞ্চিৎ। একই বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকেরা যেটুকু পান এঁদের তাও মেলে না। সমিতি থেকে করণিক ও অধস্তন কর্মীদের প্রতি এই নিদারুণ অবহেলা দূর করবার আবেদন বরাবর ব্যর্থ হয়ে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের মত দেশের অভ্যন্তরে গণ-অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধিতে। বৃটিশ মালিক পরিচালিত ট্রাম কোম্পানীর এই প্রস্তাব কার্যকর করতে কংগ্রেস সরকারের সমর্থনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন হলো। সরকার এই আন্দোলনের প্রথম দিকেই শত শত নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। গুলী চলেছে। মৃত্যু ঘটেছে। মিলিটারী নামানো হয়েছে। কিন্তু মানুষকে দমানো যায়নি। বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছে। ছাত্রেরা ধর্মঘট করেছে ও প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। জনসভা হয়েছে, সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে এবং রাস্তায় প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। ১লা

জুলাই থেকে ২২শে জুলাই অবধি এসব চলেছে। সর্বশেষে সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ষাট বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক শৈলেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। মধ্য কলকাতায় তাঁকে পুলিশ লাঠি পিটিয়ে মারে। ১৫ই জুলাই স্টুডেন্টস্ হলে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সভা আহ্বান করেছিল। সেখানে শৈলেন্দ্র মোহনকে শহীদ আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২রা থেকে ৯ই আগস্ট শিক্ষা সপ্তাহ পালনের ঘোষণা ছিল। সমিতি থেকে ৩রা আগস্ট দিনটি 'শৈলেন্দ্র হত্যা প্রতিবাদ দিবস' হিসেবে পালন করা হবে স্থির হয়। ৭ই আগস্ট ছিল পতাকা দিবস। প্রতি স্থানে পতাকা উত্তোলন ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত অর্থ সংগ্রহের দিন। ২রা থেকে ৮ই পর্যন্ত জেলা ও মহকুমা সমিতি জনসভা বা শিক্ষক সভা করে সমিতির দাবীকে সোচ্চার করে তুলবেন এই নির্দেশ ছিল। মুদ্রিত ফরমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বাক্ষর জোগার করা এবং দাবীর সমর্থনে জনসাধারণের স্বাক্ষর নেবার কর্মসূচী দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের আর্থিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে দু আনা, চার আনার কুপন বিক্রয় অভিযান ছিল। আহ্বান ছিল সমিতি সদস্যেরা পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিয়ে সংগ্রাম তহবিল গড়ে তুলবেন। ৯ই আগস্ট ছিল শিক্ষা দিবস। ঐ দিন বেলা ১টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে মফঃস্বল থেকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়া সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।

শিক্ষা সপ্তাহ সফল করবার দায়িত্বে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সাথে সাথে এগিয়ে এলেন শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায়, সুধা রায় ও নাসিরুদ্দীন মেমোরিয়াল স্কুলের কালীপদ কুণ্ডু। যাতায়াতের পাথেয় কোনক্রমে সংগ্রহ করে তারপর ছুটে চললেন দিক দিগন্তরে। কলকাতায় শ্রীঅজিত দাস, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন চক্রবর্তী, ফুলরেণু গুহ সংগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন। হাওড়ার ব্যাঁটরা স্কুলের, বিজয়রত্ন বক্সী, বীণা মজুমদার (সেনগুপ্ত), ঋষিকেশ চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গোষ্ট চ্যাটার্জী ও অসীম হালদার, হুগলীর দেশবন্ধু স্কুলের (সমিতির সহকারী সভাপতি) বলাইচাঁদ চ্যাটার্জী, শ্রীরামপুরের ষষ্ঠীচরণ সেন, চুঁচুড়ার অনিল বসু, কোন্নগরের শ্রীকেদারনাথ চ্যাটার্জী, বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীচন্দন সুর, শ্রীমতী সুহাসিনী সেন, মদন চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, তারকেশ্বর-এর পঞ্চানন বেলিয়াল, ২৪ পরগণায় নির্মল চন্দ্র গুপ্ত ও বামন দাস মণ্ডল, মেদিনীপুরের জগদীশ চন্দ্র দাস ও কালোবরণ চ্যাটার্জী, বর্ধমানে তারা কুমার মিশ্র (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল), ধীরেন পতি, তাপস নাগ, ধর্মদাস চৌধুরী ও অম্বুজা ভূষণ বসু, মুর্শিদাবাদে সুশীল ঠাকুর (মণীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠ), সন্তোষ ভট্টাচার্য, নদীয়ার বীরেন আচার্য, জলপাইগুড়িতে চুনীলাল সাহা, সুরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী, পশ্চিম দিনাজপুরে শ্রীধীরেন ভট্টাচার্য, শ্রীহেম প্রসন্ন চক্রবর্তী ও অমলেন্দু চক্রবর্তী, মালদহে রানু দাস, রেনু লাহিড়ী ও কমলা চৌধুরী, বীরভূমে শরৎ চন্দ্র প্রামাণিক ও বাঁকুড়াতে ভোলানাথ ঘোষ ও তারাপদ সিকদার-এর নেতৃত্বে সারা রাজ্য জুড়ে মফঃস্বল বাংলায় সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হলো। সাহসী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও স্বার্থত্যাগী নেতাদের পাশাপাশি এক বিরাট কর্মীবাহিনী গড়ে উঠলো। সমিতির দপ্তরে বিভিন্ন জেলার শিক্ষা সপ্তাহের খবর এভাবে এসেছিল—

কলকাতা—৪ঠা আগস্ট হাজরা পার্কে দেবজ্যোতি বর্মনের সভাপতিত্বে ও ৬ই নির্মল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু পার্কে জনসভা হয়। ৭ই আগস্ট শিক্ষক সভা হয় কেশব একাডেমীতে, ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনে, ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমী ও বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে। ঐ দিন চেতলা বয়েজ স্কুলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিলিত সভা হয়।

হাওড়া—৫ই আগস্ট আমতা পীতাম্বর বিদ্যালয়ে কলেজ অধ্যক্ষ, ৬ই আগস্ট সেবাসংঘ ময়দানে পৌরপতি কার্তিক দত্তের এবং ৭ই আগস্ট ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন হলে ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে জনসভা হয়। ৮ই শালকিয়া আর্য সমাজ হলে জনসভা হয়। শিক্ষক সভা হয় হাওড়া বালিকা বিদ্যালয়ে, সাঁত্রাগাছি ভানুমতী বালিকা বিদ্যালয়ে এবং গড় বালিয়া আর. সি. মান্না ইন্সটিটিউশনে।

২৪ পরগণা—ব্যারাকপুর মহকুমা শিক্ষক সম্মেলন—১লা আগস্ট ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ২রা আগস্ট যাদবপুর বাস্তুহারা বিদ্যাপীঠের জনসভায় বিজয়গড় কলেজের অধ্যক্ষ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন কাঁচড়াপাড়া বীজপুর এলাকার শিক্ষক সভা ও বরাহনগর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ জে. কে. চৌধুরীর সভাপতিত্বে জনসভা হয়। ৫ই বজবজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে বজবজ ও মহেশতলার শিক্ষকদের সভা হয়। বেলঘরিয়া বিদ্যালয় ময়দানের সভায় সত্যপ্রিয় রায় বক্তৃতা দেন এবং হিজলপাড়া ইউনিয়ন বোর্ড প্রাঙ্গণে জনসভায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন। ৬ই বাহাদুরপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনসভায় উপস্থিতি ছিল ১৫০ লোক। ঐ দিন ডায়মণ্ডহারবার বিদ্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই আগস্ট খড়দহে জনসভায় ভাষণ দেন অনিলা দেবী। ঐ দিন গার্ডেনরীচ কবরডাঙ্গা ময়দানে জান বক্সের সভাপতিত্বে সভা হয়। বনগাঁ হরিপদ ইন্সটিটিউশনে আরও একটি সভা হয়। ২৫০ লোকের উপস্থিতিতে বীজপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সভা হয়। ৮ই ব্যারাকপুর এ. বি. মডেল বিদ্যালয়ে ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এবং মহেশতলায় অনিলা দেবীর সভাপতিত্বে সভা হয়। ঐদিন বনগ্রাম বিদ্যালয়ে ও সরিষা বিদ্যালয়ে শিক্ষক সভা হয়। ইকড়া বিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত হন একশত জন। হাড়োয়ায় জনাব সনিফুল্লা সভার সভাপতি হন। রহড়া, ইছাপুর নর্থল্যাণ্ডে, গড়িয়া বরদা প্রসন্ন স্কুলে, গারুলিয়াতে, বরাহনগরে, কাঁচড়াপাড়া, গয়েশপুর, কলোনীতেও জনসভা হয়েছিল। ৯ই আগস্ট তপসী উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে সভা হলো।

বর্ধমান—২রা আগস্ট বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন হলো শিক্ষক সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ৩রা তারা কুমার মিশ্রের সভাপতিত্বে বর্ধমানে সভা হয়। পাটুলী উচ্চ বিদ্যালয়ে আর একটি সভা হয়। ৪ঠা সভা হয় বাণীপীঠ বিদ্যালয়ে। ৭ই শহরের শিক্ষকেরা এক শোভাযাত্রা বের করে। এইদিন রাণীগঞ্জে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই কাটোয়ার সূর্যনারায়ণ মেমোরিয়াল হলে ও ১৬ই কাটোয়া টাউন হলে জনসভা হলো। এই সপ্তাহ উপলক্ষে গুসকরা, ভাতার, সেহারা, মেমারি ও হীরাপুরেও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নদীয়া—৭ই আগস্ট আড়ংঘাটা ও শিকারপুরে সভা হলো। ৮ই আগস্ট কৃষ্ণনগরে পৌরপতির সভাপতিত্বে সভা হয়। ঐ দিন মাজদিয়া রাজুবালা ভাদুড়ী হলে এবং নবদ্বীপ বড় আখড়ায় দুটি জনসভা হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ—৩রা আগস্ট বহরমপুরে এবং ৬ই আগস্ট মণীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠে শিক্ষক সভা হলো। ৮ই বহরমপুর গ্রান্টস হল ময়দানে, জংগীপুরে লোড়া পার্কে, ধুলিয়ানে এবং লালবাগে পৌরসভা প্রাঙ্গণে জনসভা হয়। রাজারামপুর বিদ্যালয়ে ও পাঁচ গ্রামেও এ সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বীরভূম—৮ই আগস্ট রামপুরহাট জিতেন্দ্র লাল পৌরমন্দিরে, সিউড়ি বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ অরুণ সেনের সভাপতিত্বে এবং সবদলপুর রেল ময়দানে স্থানীয় এম. এল. এ-র সভাপতিত্বে জনসভা হয়। ঐ দিন বোলপুরে শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলিত হয়ে শিক্ষার দাবীতে এক

মিছিল বের করেন। নলহাটি বিদ্যালয়েও সভা হয়। ১১ই আগস্ট সাঁইথিয়া স্কুলে সভা হয়।

হুগলী—৮ই আগস্ট চুঁচুড়া ময়দানে জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নেতা বলাই চাঁদ চ্যাটার্জী। শ্রীরামপুর মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক সমাবেশে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিং ভাষণ দেন। কিংকরবাটী কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়ে, গরলগাছা, ডি-হি বাগাশাল এবং কে. বি. রায় স্কুলে সভা হয়।

বাঁকুড়া—৮ই আগস্ট বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে সভা হয়। ৯ই তিসুড়ী কাছারী প্রাঙ্গণে এবং বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়ে জনসভা হয়।

মেদিনীপুর—পেডকি মেমোরিয়াল হলে ৩রা ও ৮ই আগস্ট সভা হয়। ৮ই রামনগর ও কৃষ্ণলাল শিক্ষায়তনে সভা হয়। ৯ই আগস্ট ঝাড়গ্রাম মহকুমা শিক্ষক সমিতির ডাকে ননীবালা বিদ্যালয়ে সমাবেশ হয়।

জলপাইগুড়ি—৭ই আগস্ট আলিপুর দুয়ারে পুরাতন দুর্গাবাড়ীতে এবং ৯ই আগস্ট চেঙ্গমারীতে সভা হয়। ঐ দুদিনই জলপাইগুড়ি শহরে সভা হয় সুনীতিবালা চন্দের সভাপতিত্বে। ৯ই জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষকেরা ফণীন্দ্র দেব হাই স্কুলে সভা করেন।

পশ্চিম দিনাজপুর—৭ই আগস্ট বালুরঘাটে সুরেশরঞ্জন পার্কে, ৫ই ও ৯ই আগস্ট কালিয়াগঞ্জ মহেন্দ্রগঞ্জ ময়দানে ও নজমুনাট্য নিকেতনে এবং ৮ই হরিরামপুরে সভা হয়।

মালদহ টাউন হলে, দার্জিলিং জেলার শিক্ষকদের সভা শিলিগুড়িতে এবং কোচবিহারের দিনহাটায় ক্ষিতীশ মুস্তাফীর সভাপতিত্বে ৮ই আগস্ট শিক্ষা সপ্তাহের কর্মসূচী উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

শিক্ষা সপ্তাহের শেষ দিনে ৯ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা দিবস ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পাঁচশত শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ মোট তিন হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর জমায়েত হলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ইতিপূর্বে শুধু শিক্ষার দাবীতে এতবড় সমাবেশ ভারতে কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐতিহাসিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ছাত্র সংগঠনগুলি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থা, শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটি, কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, শ্রমিক সংগঠন, কলকাতা করপোরেশন, বার এসোসিয়েশন, ভারতখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং পত্রিকা সম্পাদকেরা এই সম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন। পাঁচ ঘন্টা ধরে আলোচনা চলছিল। বক্তাদের মধ্যে কৃষক নেতা বগলা গুহ, শিক্ষাব্রতী ত্রিগুণা সেন, গোপাল হালদার ও আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের মত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

প্রখ্যাত জননেতারা আগেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছিলেন। এরা হলেন—সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু, জ্যোতি বসু, ত্রিদিব চৌধুরী, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদা মুকুটমণি, মোহিত মৈত্র, মৃণালকান্তি বসু, রণেন সেন, যতীন্দ্র নাথ মিত্র এবং বঙ্কিম মুখার্জী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রাধাবিনোদ পাল সম্মেলনে সরকারী শিক্ষানীতির প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন। অকুণ্ঠভাবে শিক্ষার সংস্কার ও শিক্ষকদের জীবিকার উন্নয়ন দাবীকে তিনি সমর্থন জানালেন। মূল প্রস্তাবের উত্থাপক সত্যপ্রিয় রায় এবং সমর্থক ছিলেন অনিলা দেবী। প্রস্তাবে আটটি বিষয় ছিল। এগুলি রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি ও সাহায্যদান, আধুনিক সাজসরঞ্জাম বিদ্যালয়ে দেওয়া এবং অনগ্রসর এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে, স্বয়ংসম্পূর্ণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের উদ্দেশ্যে, শিক্ষাখাতে রাজ্যের ১০ শতাংশ ও কেন্দ্রের ২০ শতাংশ রাজস্ব ব্যয়ের

জন্য এবং তার সঙ্গে শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও ৩৫ টাকা ডি. এ. সহ মাসিক অন্যূন দুশত টাকা বেতন দেওয়া সম্পর্কে।

সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে ৩০শে আগস্ট সমিতির কার্যকরী সমিতির সভা বসলো। বিভিন্ন এলাকার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ৩১শে আগস্ট হলো মহকুমা সম্পাদকের সভা। প্রায় সকল মহকুমায় সে সময়ে সমিতি তৈরী হয়ে গিয়েছে। সদস্য সংখ্যা বেড়েছে বিপুলভাবে। সদস্য বিদ্যালয় সংখ্যা বছরের শেষ অবধি দাঁড়ায় ৯৪৮-এ। মাত্র একশতটি বিদ্যালয় বাদে সমস্ত বিদ্যালয় সদস্য হয়েছিল। নতুন নতুন কর্মী সৃষ্টি হয়েছে। সমিতি সদস্য হয়ে যাঁরা অন্যত্র রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন তাঁরাও সমিতির কাজে সক্রিয় হলেন। হাওড়া শ্রীদুর্গা বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্তা নীলিমা সেন সমিতির কাজে নামলেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। কলকাতায় এলে উইমেন্স কলেজে অধ্যাপিকার কাজ শুরু করেন। রাজনৈতিক আদর্শের জন্য সেখানে তাঁকে বহু নির্যাতন সইতে এবং অবশেষে ছাঁটাই হতে হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে নিজেকে ব্রতী করেন। আন্দোলন ও সংগ্রাম-এ অংশগ্রহণের জন্য বার বার কারাভোগ, লাঠি গুলীর মুখে পড়েছেন। কিন্তু কোন সময় নতি স্বীকার করেননি। চট্টগ্রাম থেকে একই আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন শ্রীশশিমোহন ভট্টাচার্য। সেখানকার শিক্ষক আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দেশে প্রবর্তিত প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে ঘনিষ্টভাবে দেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষার সঙ্গে সমাজ উত্তরণের প্রশ্নটি কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তার জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। হুগলী জেলায় শিক্ষকতা করবার সময় শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিলেন। পরবর্তীকালে সমিতির প্রথম সারির নেতা ও মুখপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘকাল নির্বাহ করেন। হুগলী জেলার ব্যাপক এলাকায় প্রচার আন্দোলনকালে এদিকে সমিতিজীবনে তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন গোলকপতি রায়। মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ—কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে কলকাতায় প্রথমে সাংবাদিকতার জীবন চালাতেন। নেতাজীর বামপন্থায় গভীর আস্থা ও দরিদ্র মানুষের প্রতি প্রবল অনুভূতি-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত রায় প্রথমে সারদাচরণ এরিয়ান স্কুল ও পরে কমলা হাই স্কুলে শিক্ষকতায় আসেন। ছাত্র ও শিক্ষক সহকর্মীদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ তাকে অনতিকালের মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত করে। দীর্ঘকাল তিনি নিরলসভাবে শত অত্যাচার ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শীর্ষ নেতা বলে পরিচিত হয়েছেন। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে তাঁকে একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠকরূপে পাওয়া গেল। এরপর এলেন শোভাবাজার রাজ পরিবারের রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব সংগ্রামী চেতনা নিয়েই। প্রথম জীবনে অমৃতবাজার পত্রিকার একজন সাংবাদিক। সেখানকার কর্মীদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে ছাঁটাই হন। তখন শ্রীবিদ্যানিকেতন নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছেন। তিনি উত্তর কলকাতা শিক্ষক সংগঠনে নামলেন। এঁদের সঙ্গে এলেন কমলা হাই স্কুলের সমরেশ সেন, দেশবন্ধু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমূল্য নাথ লাহিড়ী, সুশীল কুণ্ডু (পরে দার্জিলিং জেলা শাখার সম্পাদক) প্রভৃতি কর্মীরা। সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীআমোদ বিহারী বসু তখন বর্ধমানে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সমিতির কাজ তাঁকে শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলো। নদীয়া জেলার প্রখ্যাত শিক্ষক নেতা সরোজ গোস্বামী (কৃষ্ণনগর সি. এম. এস. স্কুল) এইভাবে সমিতিতে এলেন। এঁদের মত আরও অজস্র কর্মী সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের অনেকে এই বৃত্তি ত্যাগ করেছেন, কেউ কেউ নিজেদের আরও শিক্ষিত করে অন্য কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। অথবা সাধারণ সদস্য হিসাবে চিরকাল থেকে গেছেন। এই

আন্দোলনে যাঁরা নিজেদের পদাতিক বলে বর্ণনা করেছেন তাঁরা বর্তমানে সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন—সমিতির সভাপতি শ্রীঅজিত বাগ, সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণ চৌধুরী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তী প্রভৃতি। তাছাড়া এ সময়ের ছাত্র আন্দোলনের ফসল শ্রীহীরেন দাসগুপ্ত (সভাপতি, কলকাতা জেলা শাখা) শ্রীঅমিতাভ সেন (মুখপত্রের যুগ্ম সম্পাদক), জলপাইগুড়ির শ্রীসুবোধ মিত্র (সমিতির সহকারী সভাপতি), বালুরঘাট থেকে শ্রীতুষার পঞ্চানন (বর্তমানে মেদিনীপুর এবং সমিতির সহকারী সাধারণ সম্পাদক) প্রভৃতি সমিতির নেতৃত্বে এসেছেন।

সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বিরামহীন প্রচেষ্টা চললো। ৫ই সেপ্টেম্বর বীজপুর থানার শিক্ষকদের চেষ্টায় কাঁচড়াপাড়া সার্কাস ময়দানে দু'হাজার লোকের এক সভা হলো। সভাপতিত্ব করলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী ছিলেন বক্তা! ৬ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর সদর মহকুমা সমিতির ডাকে গ্রান্টস ময়দানে সভা হলো। বিশিষ্ট জননেতা সতীনাথ বাগচী সভাপতিত্ব করলেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় ভাষণ দিলেন অনিলা দেবী। ১৩ই সেপ্টেম্বর বারাসতে কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে সত্যপ্রিয় রায় বক্তব্য রাখলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুর মহকুমা সমিতির ব্যবস্থাপনায় শুধু শিক্ষকদের সভা হলো। দশটি বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষিকার সভায় ভাষণ দেন অনিলা দেবী। ২৫শে সেপ্টেম্বর বর্ধমান শহরে বিশিষ্ট জননেতা ফকির চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সভা হলো। মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষার দাবী উপস্থিত করলেন। এ মাসে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠে মেদিনীপুর সদর মহকুমা সম্মেলন হলো। হাওড়ার উলুবেড়িয়া স্কুলের সভায় মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ রায় ও কালীপদ কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর আলিপুর মহকুমা সমিতির ডাকে কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ে ৭০ জন শিক্ষক ও ১৫০ জন অভিভাবক সমবেত হলেন। কালীপদ কুণ্ডু বক্তৃতা দিলেন। কলকাতা মহকুমা শাখাগুলির ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিনই সভা হতে লাগলো। ৯ই সেপ্টেম্বর ভবানীপুর এলাকার একশত শিক্ষক সাউথ সুবার্বন স্কুলে সমবেত হলেন। বক্তব্য রাখলেন কালীপদ কুণ্ডু ও সত্যপ্রিয় রায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর কালীঘাট এলাকার শিক্ষকদের সম্মুখে কালীধন ইন্‌সটিটিউশনে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী বক্তৃতা দিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর খিদিরপুর এলাকার ৬০ জন শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের কথা শুনলেন সেন্ট বার্ণাবাস স্কুলে। বেলতলা এলাকার ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা মডেল স্কুলে সভা করলেন। বক্তব্য রাখলেন অনিলা দেবী, কালীপদ কুণ্ডু ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। চেতলা বয়েজ হাই স্কুল-এ ৪৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায় ও শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির কথা বললেন। ঐদিন তালতলা এলাকার শিক্ষক সভায় সত্যপ্রিয় রায়, কালীপদ কুণ্ডু ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ এলাকার ৫০ জন শিক্ষকের সমাবেশে অনিলা দেবী সত্যভামা স্কুলে এবং উত্তর কলকাতার জুবিলী হাই স্কুলে ৪০ জনের উপস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায় ও কালীপদ কুণ্ডু বক্তৃতা দিলেন। ১৯শে হাজরা পার্কে জনসভা ডাকা হলো। চারশত নরনারীর ঐ সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন সভাপতি। সত্যপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও কালীপদ কুণ্ডু আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। ২২শে পার্কসার্কাস অঞ্চলে শিশু বিদ্যাপীঠে কালীপদ কুণ্ডু, ২৩শে শ্রীবিদ্যানিকেতনে সত্যপ্রিয় রায়, গোলোকপতি রায় ও কালীপদ কুণ্ডু, ২৪শে বেলগাছিয়ায় মনোহর একাডেমীতে সত্যপ্রিয় রায় এবং ২৫শে বাগবাজার বিদ্যালয়ে কালীপদ কুণ্ডু সমিতির কথা এলাকার শিক্ষকদের জানালেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফল দেখা দিল ২৬শে সেপ্টেম্বর কলকাতা জেলা শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠানে। সেদিন সারাদিন বর্ষণ। তবু তিনশত

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হলেন এবং ধৈর্য সহকারে নেতাদের বক্তব্য শুনলেন। পরদিন সকালে অনিলা দেবীর বাসভবনে রাজা বসন্ত রায় রোডে পুলিশ উপস্থিত হলো। তিনি নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেফতার হলেন। তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। শিক্ষক সমাজ প্রবল প্রতিবাদে গর্জে উঠলো প্রিয় নেত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে। সত্যপ্রিয় রায় বললেন, "সরকার সমগ্র শিক্ষক সমাজকেই অশোভনভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। ......শিক্ষা ও শিক্ষকের এরূপ একজন সংগ্রামী প্রবক্তাকে গ্রেপ্তার করিলেই ক্রমবর্ধমান শিক্ষক আন্দোলনকে ধ্বংস করা যাইবে তাহা হইলে তাহারা সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন।" গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর নিজের স্কুলের প্রিয় ছাত্রীরা পথে নেমে অভূতপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করলো। কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ে, রামরিক স্কুলে, সারাঙ্গাবাদ স্কুলে, খিদিরপুর একাডেমীতেও ছাত্র ধর্মঘট হলো। সত্যপ্রিয় রায় বিবৃতি দিলেন, আন্দোলন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ সোচ্চার। এর প্রতিবাদে সর্বত্র শিক্ষক সভা হবে। তাঁর মুক্তির দাবীতে ১লা অক্টোবর বিকাল পাঁচটায় ভারত সভা হলে হবে কেন্দ্রীয় প্রতিবাদ সভা। ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দেড়টায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো। তাঁর মুক্তি কর্মীদের চিত্তে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করলো। প্রমাণিত হলো দমন-পীড়ন দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না। সংগ্রামের প্রথম ধাপেই সরকার পরাস্ত হলো।

সমিতির সর্বস্তরের কর্মীরা একান্তভাবে প্রতিটি মুহূর্ত সংগঠনের কাজে ব্যয়িত করলেন। ৩রা অক্টোবর বনগাঁ মহকুমা সমিতির ডাকে টাউন হল ময়দানে বড় সভা হলো। অনিলা দেবী ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বক্তব্য রাখলেন। লালবাগে ও বুরুলে জনসভা হলো। বাঁকুড়া সদর মহকুমার ডাকে ৪ঠা অক্টোবর শহরে এক জনসভা হলো। বক্তা ছিলেন সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী। ৬ই ইন্টালী মথুরানাথ বিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত হলেন কালীপদ কুণ্ডু ও হীরেন্দ্রনাথ রায়। ৭ই রাজারহাট এলাকার সভায় হাজির হলেন কালীপদ কুণ্ডু। ৯ই হাওড়া সদর মহকুমার সভায় বি. কে. পাল ইনস্টিটিউশনে উপস্থিত থাকলেন সত্যপ্রিয় রায়। ১১ই সেপ্টেম্বর আড়িয়াদহ এলাকার শিক্ষকদের সভায় মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সত্যপ্রিয় রায় বক্তৃতা দিলেন। ঐ দিন খড়গপুরেও জনসভা হলো। বক্তা সন্তোষ বাগচী ও অনিলা দেবী। ৪ঠা নভেম্বর জিয়াগঞ্জ লোড়া পার্কের জনসভায় মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বীরেন আচার্য ও সুশীল ঠাকুর বক্তৃতা করেন। ৬ই নভেম্বর ঝাড়গ্রাম মহকুমা সমিতির ডাকে বীনপুরের সভায় সত্যপ্রিয় রায় ভাষণ দেন। ৮ই নভেম্বর নদীয়া জেলা সমিতির আহ্বানে কৃষ্ণনগরে শিক্ষকেরা সমবেত হলেন ও আইনসভার সদস্যদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন। ১৫ই নভেম্বর নবদ্বীপ বড় আখড়ায় শিক্ষক সম্মেলন হলো। বীরেন আচার্য, সুশীল ঠাকুর সহ অনিলা দেবী ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ভাষণ দিলেন। ১৯শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় সমিতির আহ্বানে এম-এল-এ, এম-এল-সি-দের এক সভা হয়। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতি বসু, সুবোধ ব্যানার্জী, আবদুল হালিম এবং শ্রীহেমন্ত ঘোষাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেন এবং তাঁরা সমিতির দাবীপত্রে স্বাক্ষর দেন। দাবীপত্র ৮০ জন বিধায়কের স্বাক্ষরিত হয়ে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। সমিতি দপ্তরে সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক সভা আহূত হয়। ২৯শে নভেম্বর এই ঘরোয়া সভায় মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সমিতির দাবীগুলি উপস্থিত করলেন। সম্পাদকদের পক্ষ থেকে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কেন্দ্রীয় নেতারা যে কাজের সূচনা করেছিলেন সে কাজ এবারে জেলা শাখাগুলি নির্বাহ করতে লাগলো। গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচার চললো, সংগঠন তৈরী হলো। গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয়

ঘটলো। উভয় শ্রেণীর কর্মীদের সমবেত উদ্যোগে জনসভাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ইতিপূর্বেই তৈরী করেছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্য থেকে নীরেন্দ্র নাথ রায়, সন্তোষ মিত্র, গোপাল হালদার, পীযূষ দাশগুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতি বরাবরই ছিলেন। ঘনিষ্টতা এদের ছাড়িয়ে অন্যদের সঙ্গেও বিস্তৃত হলো। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নেতৃত্ব বিশেষভাবে শ্রীমন্মথ নাথ অধিকারী আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার হিসেবে এগিয়ে এলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ভারত সভা হলে শিক্ষক সমিতির মিলিত সভা হলো। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাথে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, কলকাতা করপোরেশন শিক্ষক ইউনিয়নের যুক্ত সভা হলো। বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে যোগদানের কাজ শুরু হয়। মার্কেন্টাইল ইউনিয়ন ও এল-আই-সি-র সমিতিগুলির সাথে দ্রুত সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সাহায্যের আহ্বান দেওয়া হলো। এই প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সংগ্রামই প্রকৃত শিক্ষক এই মার্কসবাদী সত্যটি কমরেড সত্যপ্রিয় রায় উপলব্ধি করেছিলেন ও পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে এ. বি. টি. এ.-র মধ্যে সংগঠিত করেছিলেন ও দক্ষতার সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কমরেড সত্যপ্রিয় বুঝেছিলেন, ১৯৫৪ সালের আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তির সহায়তা প্রয়োজন।" †[২৮] বিপুলভাবে শিক্ষকদের আহ্বানে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এ সম্পর্কে অনিলা দেবীর বক্তব্য, "বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সম্প্রদায়কে এতদিন ধরে ভাবতে ও দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের কর্মজীবী মানুষ। সংগ্রামের রাজপথে এসে বসা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে তাঁরা নূতন চোখে দেখলেন। এগিয়ে এলেন সহযোগী যোগসূত্র রচনায়।" †[৮]

সর্বস্তরের কর্মীরা যৌথ দায়িত্বে সংগঠনকে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া গেল ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমাবেশে। পার্শ্ববর্তী জেলা ও কলকাতা থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা হাজারে হাজারে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সমিতির দীর্ঘজীবী হবার আশা আর শিক্ষার দাবীগুলি। ২৮শে ডিসেম্বর থেকে হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত হলো নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ২৮-তম অধিবেশন। সর্বভারতীয় শিক্ষাবিদ্ ও ভারত সরকারের শিক্ষা আধিকারিকদের মিলিত সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ রাধা বিনোদ পাল বললেন, "আমাদের দেশের শিক্ষকগণ যে দাবী ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন সমাজের তাহা বহু পূর্বেই পূরণ করা উচিত ছিল। —এই দাবী পূরণের জন্য আমাদের সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধভাবে কাজ করার যথেষ্ট সময় হইয়াছে। উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরিয়াদের যে হারে মূল বেতন নির্ধারিত হয় সমস্ত শিক্ষকদের বেতনও সেই হারে নির্ধারণ করিতে হইবে।" সমিতি এই

সম্মেলনের আহ্বায়ক ও উদ্যোক্তা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষায়তনের প্রায় ১৩ শত শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এখানে উপস্থিত ছিলেন। আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ন্যূনাধিক ১৭০০ প্রতিনিধি। অধিবেশনের মঞ্চ থেকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্ম বিরতির প্রস্তাবকে এবং এর প্রস্তুতিকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানানো হয়। শিক্ষক সমিতির এই অভিনব সংগ্রাম সারা ভারতের শিক্ষক সমাজকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে। এই অধিবেশনের সফল অনুষ্ঠানের মূলে সমিতির প্রচেষ্টা ও অবদান নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পরিচিতিকে সারা ভারতব্যাপী প্রসারিত করে। তাই বছরের শেষে সমিতির কর্মীকে প্রস্তুতি কেমন এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, যিনি সূর্য ও পদ্মকোরক লাঞ্ছিত সমিতির পতাকা বহন করছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ঠিক এই পতাকার মত, সংগ্রাম যতই এগিয়ে আসছে আমরা ততই বিকশিত হচ্ছি যেমন রবির কিরণপাতে পদ্ম ফুটে উঠে। সর্বত্রই সমিতির পদ্মকোরকের ফোটার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছিল।

ছয়

প্রচার আন্দোলন

১৯৫৩ সালের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা ও নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের সংগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী স্লোগান ছিল—দেশে বৃটিশ-পুঁজির বিলোপ, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা সম্পর্কে। দেশের অবস্থা সাপেক্ষে দাবীগুলি উপস্থিত করা হয়। এর মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী, শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধি এবং ছাত্রদের ফি-এর পরিমাণ কমানোর দাবী ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সাধন গুপ্ত বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। অল্প কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফলের চাইতে নবদ্বীপ কেন্দ্রেও কমিউনিস্ট পার্টি এবারে ভাল ফল করে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে সচেতন মানুষের কাছে। "সারা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি, ঐক্য ও সংগ্রামের নির্যাস যেন এই বিশেষ সংগ্রাম (নির্বাচনী লড়াই) মধ্যে সংহত হয়ে উঠেছিল," এই ধারণা প্রসারিত হয়। ফলত নির্বাচনের বিজয় উৎসবের মধ্য দিয়ে নববর্ষ চুয়ান্ন সালের আগমন হলো। রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র গণ অসন্তোষ। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে সংগ্রামমুখীন ভাব। শিক্ষক আন্দোলন চলছে। ধর্মঘট আসন্ন। সংগ্রাম সার্থক করতে পারলে সেটি নিশ্চয় সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সময়ের দর্পণে এই ভবিষ্যত ছায়া দেখা দিয়েছিল।

দৈনিক পত্রিকাগুলি শিক্ষক সংগ্রামের সংবাদগুলি পরিবেশন করছিল প্রতিদিন। সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠকদের চিঠিতে শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে ও সরকারের করণীয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে জনমত প্রকাশ হচ্ছিল। শিক্ষক আন্দোলনের প্রেরণা সাংস্কৃতিক জগতকে স্পর্শ করছিল। শিক্ষকদের সংস্কৃতিতেও ছোঁওয়া লেগেছিল। গণতন্ত্রের পতাকা বিশেষ করে শিক্ষার ভূলুন্ঠিত পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার দায়িত্ব সাধারণ মানুষকেই নিতে হবে, এই বোধ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল চারিদিকে। সেদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক আজকের ডঃ সুধীর করণ লিখেছিলেন 'ফেব্রুয়ারী ডাক'।

"ফাঁকা জীবনের কামনা ভগ্নপাখা ঝাঁপটায় আজ
সোনালী স্বপ্ন হাওয়ায় নিরুদ্দেশ— :
থামবো না তবু জীবনের এই মৃত্যু শিবিরে এসে
আমরা পেয়েছি বাঁচবার সংকেত,
তাই ধরে আছি শিক্ষা'তরীর এই নড়বড়ে হাল
ধরে আছি সারা দেশের ভবিষ্যৎ—।
একদিন কতো স্বপ্ন দেখেছি, কতো কল্পনা রঙে—
স্বাধীনতা ঃ সে তো কতো কামনার ধন!
কতো সংগ্রামী জীবন রক্ত দিয়ে
পূজার বেদীতে আঁকলো আলিম্পন!
তারপর কি যে হলো—

আমাদের তরী জীবন-সাগরে ঝন্‌ঝায় টলমল!
তবুও রুদ্ধবাকের কন্ঠে আমরা যোগাই ভাষা—
আমরা, জীবনে ফসল ফলাই কতো;
কে দিল হাজার নিরাশ-জীবনে বেঁচে থাকবার আশা?
আমরাই শুধু, আমরা দলিত আত্মা-শিল্পী যতো।
আমাদের চালে খড় নেই আজ,
প্রদীপে নেইকো তেল—
ঘরে ঘরে কচি কাঁচাদের মুখে এক ফোঁটা দুধ নেই;
আমার স্বাধীন কণ্ঠও শেষে বুলেটের ঘায়ে ছেঁড়ে—
হায় স্বাধীনতা, শেষে কি ডোবালে শিক্ষার সূর্যকে!
তাই আজ এই সংহতি শুধু সংগ্রামী চোখ জাগে,
আমাদের দাবী—, জনতার দাবী—
হাজার কন্ঠে ওঠে;
আমরা শুনেছি আহবান আজ হৃদয়ের কোণ থেকে
ডাক দিয়ে যায় দশই ফেব্রুয়ারী;
তাই আজ তুলে ধরি আমাদের বন্ধমুঠির হাত—
সম্মুখে আসে বাঁচবার সংঘাত।
আমরা ছড়াই দিকে দিকে আজ অগ্নির কণা তা'রই—
আগামী দিনের ভরসার বাণী শোনায় ফেব্রুয়ারী।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন শিক্ষার ব্যাপারে চরম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে তখন ভারতের কিছু কিছু রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া গেল। শিক্ষাপ্রসারেও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বোম্বাই রাজ্য সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তবু তারা ২১টি জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করতে চায়। পরিকল্পনা ৭ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। শুধু শিক্ষার দুরবস্থা নয় পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক সংকটও ঘনীভূত হচ্ছিল। গত বছরের মাঝামাঝি জিনিসপত্রের বাজার-দর ঘোষণা প্রসংগে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় লেখা হলো :—

"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক সংকট অবস্থা

কলিকাতায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সাধারণ মানুষের দিন চলা দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে। নগরীর বিভিন্ন বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার বাজার সমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য-এর বর্তমান মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মফস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। কলিকাতায় জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলের ক্রয় ক্ষমতা বহুলাংশে কম। বিভিন্ন স্থান হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ও জনসাধারণের অবস্থার যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাও অত্যন্ত শোচনীয়।"

সরকারের স্বভাবসুলভ নীরবতাকে অগ্রাহ্য করে শিক্ষক আন্দোলনের প্রস্তুতি অবিরাম ছিল। সহসা এই নীরবতা ভংগ হলো মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে ১৬ই জানুয়ারী। ঐ দিন দুপুরে মহাকরণে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মাধ্যমিক স্কুলগুলির অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধোত্তরকালে ব্যবসায়ী ও পেশাদার লোকেরা তাদের আয় বাড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু শিক্ষকদের আয় সব সময়ই কম। বর্তমানে অত্যাবশ্যক

পণ্যাদির মূল্য কমে যাচ্ছে। তথাপি সরকার তাদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির কথা যত্নের সংগে বিবেচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি প্রয়াসী, এই ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে বি. এ. অনার্স অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ৯০ স্থলে হবে ১২৫ টাকা। অভিজ্ঞতা নাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ.-দের বেতন ৭৫ স্থলে তাঁরা ১০৫ টাকা করতে ইচ্ছুক। সরকার তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ. বি. এ. অনার্স এবং বি. টি. সহ বি. এ. শিক্ষকদের বেতন ৭৫ থেকে ১০০ করতে চান। অন্যান্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতন ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হলো বলে তিনি জানালেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন যে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। এ কারণে মাসিক ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা দেবার প্রশ্ন কোন মতেই বিবেচনা করা যায় না। বে-সরকারী স্কুলগুলি যদি নিজেদের তহবিল থেকে এ বাবদ দিতে পারেন তাহলে সরকার তার অর্ধেকটা দিতে পারেন কিনা বিবেচনা করে দেখতে পারে। ন্যূনতম বেতনবৃদ্ধি ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষকদের আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার মনোযোগী। শিক্ষক সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, হাসপাতালে শিক্ষকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, শিক্ষকদের জীবনবীমা, সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ, সম্মেলনে সুলভে যাতায়াতের ব্যবস্থাদির প্রশ্ন আগামীতে বিবেচনা করা হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্কুল কোডের মাধ্যমে যে বেতন কাঠামোর সুপারিশ করেছে এ সম্পর্কে সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন জনসাধারণের বোঝা উচিত পশ্চিমবাংলার বে-সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সকল ঘাটতি সরকার বহন করেন। কিন্তু ভারতের কোন কোন রাজ্যে এর এক তৃতীয়াংশ সরকার বহন করেন মাত্র। বেতনবৃদ্ধির ফলে সরকারে পৌনঃপুনিক অতিরিক্ত ১৫।১৬ লক্ষ টাকার আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে। দীর্ঘ ও বিপুল বাক্যব্যয়িত সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ রায় আরও বলেন, শিক্ষকদের নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র উচ্ছৃংখলতা বেড়ে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি শিক্ষক সমাজের মধ্যে কোন রেখাপাত ঘটাতে পারেনি। বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছিল। ২৪শে জানুয়ারী সকল সংবাদপত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হলো। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু, এস-ইউ-সির সুবোধ ব্যানার্জী, জনসংঘের সত্যেন্দ্র নাথ বসু, হিন্দু মহাসভার নীহার দাস, ডি-ভি পার্টির সুদর্শন দাস, এম-এম-এল-এর নির্মল সমাজপতি, আর সি পি আই-এর সুধাময় দাশগুপ্ত, আর এস পির মাখন পাল, বি পি-র শ্যাম চক্রবর্তী ও সত্য গুপ্ত. ফরোয়ার্ড ব্লকের নানু ঘোষ, এস আর পির জ্যোতিষ জোয়ারদার। বিবৃতিতে তাঁরা জানালেন—শিক্ষকেরাই মনুষ্যজাতির নির্মাতা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির দাবী যুক্তিসম্মত। এজন্য অর্থের অভাবের কথা অজুহাত মাত্র। "আমরা জনসাধারণকে শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে তাঁহাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিবার জন্য আহবান জানাইতেছি।"

২৫শে জানুয়ারী হাজরা পার্কে একটি বড় জনসভা হলো। সভায় সত্যপ্রিয় রায় তাঁর ভাষণে সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন। সরকারের টাকার অভাব যে ভ্রান্ত তার ব্যাখ্যা করলেন। প্রবীণ নাগরিক সত্যেন দত্ত অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে বললেন। সভার সভাপতি ছিলেন শিক্ষক নেতা শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, "আপনাদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা আপনাদের সন্তানদের গঠনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু

জীবনযাত্রায় ক্ষত-বিক্ষত পঙ্গু শিক্ষক দ্বারা কি এই গুরুদায়িত্ব বহন সম্ভব?" তিনি শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থা বিবৃত করেন এবং শিক্ষকদের লড়াই-এ জনসাধারণের সমর্থন দাবী করেন। কেন এই আন্দোলন এ সম্পর্কে তিনি বলেন "আমরা শিক্ষকরা প্রথমে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ২০০ টাকা বেতন দাবী করি। কিন্তু বোর্ডের তদানীন্তন সদস্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধক্রমে আমাদের দাবী মাত্র ৮০ টাকায় নামিয়ে আনি। কিন্তু এই সামান্য দাবিও যে সরকার স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হবে তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল।" পার্কের অপর দিকে ছেলেদের খেলা চলছিল। সভা শুরু হলে তাদের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। যতক্ষণ সভা চলে তারা গভীর আগ্রহে সেখানে অবস্থান করে। সভাশেষে ধ্বনি উঠলো, "নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ," "শিক্ষকদের দাবি মানতে হবে—মানতে হবে।" ছাত্রেরা শিক্ষকদের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে সভা শেষ করলো। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নেতার যুগ্ম বিবৃতি ২৭শে জানুয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। ছাত্র কংগ্রেস, এস আর ছাত্র ব্যুরো, ভি-ভি শাখা, সমাজবাদী ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ব্লক এবং ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে হীরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত স্বাক্ষরকারী ছিলেন। আন্দোলনের সমর্থন করে বিবৃতিতে তাঁরা বললেন, "বাংলার ছাত্র সমাজ শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে এবং বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষা সংকোচননীতি পর্যুদস্ত করে তুলবে। অনিচ্ছুক কংগ্রেসী সরকারকে দাবীগুলি মানতে বাধ্য করতে হবে।"

সারা রাজ্য জুড়ে সমিতির এই দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হবার সংবাদ আসতে শুরু করেছিল। হয়েছিল বড় বড় সমাবেশ। তার সামান্য কিছু সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। ২০শে জানুয়ারী ইন্টালী-বেনেপুকুরে সভা হলো। সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। ২১শে জানুয়ারী উত্তর কলিকাতার দক্ষিণাংশের শিক্ষক-শিক্ষানুরাগীদের সভায় সভাপতিত্ব করলেন গুণদা চক্রবর্তী। সেখানে বক্তা ছিলেন মদন মোহন বিদ্যাভূষণ ও হীরেন্দ্র নাথ রায়। বালীগঞ্জ এলাকার শিক্ষকেরা মিলিত হলেন লেকভিউ স্কুলে। ২৪শে জানুয়ারী আড়িয়াদহের শিক্ষক সভায় অধ্যাপক সীতাংশু মৈত্র সভাপতিত্ব করলেন। দক্ষিণেশ্বরে সভা হলো। বেলগাছিয়া মনোহর একাডেমীর সভায় হীরেন্দ্র নাথ রায় ও কালীপদ কুণ্ডু বক্তব্য রাখলেন। যাদবপুর অঞ্চলের ২২টি স্কুলের শিক্ষকেরা মিলিতভাবে সভা করলেন। খিদিরপুর মিলনী হাইস্কুলে, কালীঘাট ও লেক অঞ্চলের শিক্ষকেরা তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে, চেতলায়, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে সভা হলো। ঢাকুরিয়া মাঠে ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে যে বড় সভা হলো তাতে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী বক্তব্য রাখলেন। বেলতলা ল্যান্সডাউন অঞ্চলের শিক্ষকেরা মিলিত হলেন সাউথ সুবারবন স্কুলে। টালিগঞ্জ-যাদবপুর অঞ্চলে শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। বেহালায় বিশিষ্ট আইনজীবী নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা হলো। কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ ও ব্যবহারজীবী শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন। কলকাতার শিক্ষিকাদের পৃথক এক সমাবেশ হলো লিন্টন্ ষ্ট্রীটে। সভাপতিত্ব করলেন অনিলা দেবী। মধ্য কলকাতার শিক্ষক সমাবেশ হলো রাণী রাসমণি স্কুলে। উত্তর কলকাতার জুবিলী স্কুলে ধুমন সিংহের সভাপতিত্বে সভা হলো। বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্কে শিক্ষকদের সমাবেশে অসংখ্য হিন্দি ভাষী মানুষ যোগ দিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ এই সভার সভাপতি ছিলেন। আমতা বাজারে কৃষ্ণধন সিংহের সভাপতিত্বে সভা হলো। অনিলা দেবী, হীরেন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক শিবপ্রসাদ সিন্হা ছিলেন বক্তা। সাত্রাগাছিতে অধ্যাপক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জনসভা হলো। অনিলা দেবী বক্তব্য রাখলেন। বেলঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভায় শতাধিক ব্যক্তির সম্মুখে হীরেন্দ্রনাথ রায় বক্তৃতা দিলেন। বসিরহাটে

টাউন হলে বড় সভা হলো। ঘাটাল মহকুমা সমিতি শিক্ষা সম্মেলন করলো। রাজনগর স্কুলে সভা হলো। তারকেশ্বরে জংগীপাড়া হাই স্কুলে শিক্ষকদের সভা হলো। মুর্শিদাবাদের লালবাগে মহকুমা সমিতির ডাকে মিউনিসিপ্যাল ময়দানে সভা হলো। কৃষ্ণনগরে সদর মহকুমা আয়োজিত সভায় পাঁচ শতাধিক লোক সমবেত হলেন। সভাপতি ছিলেন সুধীরচন্দ্র মল্লিক এবং বক্তা অনিলা দেবী। শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে সভা হলো। ৩৫টি স্কুলের প্রতিনিধিরা বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে সমবেত হয়ে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিলেন। পশ্চিম দিনাজপুরের বিভিন্ন স্কুলে সংগঠন গড়ে সমিতির নেতা সুশীল ঠাকুর বালুরঘাট এলেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা করলেন।

২৮শে জনুয়ারী এক মহতী সভা হলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সভাপতি ছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, ডঃ জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য, অমূল্য ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, সত্যনারায়ণ মিশ্র বক্তব্য রাখলেন। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হয়েও সত্যনারায়ণ বাবু বললেন, "শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী টাকার অজুহাতে উপেক্ষিত হওয়া গুরুতর অন্যায়। শিক্ষার প্রসার ভিন্ন স্বরাজ মূল্যহীন। প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষকদের দাবী অবিলম্বে মেনে নেবার দাবী জানান। সরকারের মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে তিনি বললেন, "শিক্ষকদের দাবী মেটাতে মোট ব্যয় হবে ৩৫ লক্ষ টাকা। দেশে লোহা ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় কনসালটিং ফি বাবদ সরকার খরচ করেছে ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকা। টাটা কর্তৃপক্ষ বলছে এ টাকা বৃথাই খরচ করা হয়েছে। এভাবে দেশের অর্থ কম ব্যয়িত হচ্ছে না। অথচ সরকার শিক্ষার স্বার্থে ব্যয় করতে ইচ্ছুক নন। টাকার অভাবের জন্য শিক্ষকদের দাবী মেটানো হয় না এটা সত্য নয়। সরকারের এ অজুহাত ভুয়া।" তিনি শিক্ষক আন্দোলনকে প্রবলভাবে সমর্থন করতে জনগণকে আহবান জানান। সভায় কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষকদের কর্মবিরতি সুচিন্তিত ও যুক্তিসম্মত। জনসাধারণকে শান্তি ও শৃংখলার সঙ্গে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব অনুসরণ করে আন্দোলনে যুক্ত থাকতে আহ্বান দেওয়া হয়। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বিবৃতির প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। এটি বিভ্রান্তিকর ও শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করে শিক্ষার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একমত হয়ে দু'বার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেটি কার্যকর না করে অবজ্ঞা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে শিক্ষাখাতে ২০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে, এগুলি প্রস্তাবে নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ২৭শে জানুয়ারী প্রধান শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাত করেন। মহাকরণে এক ঘন্টা আলোচনায় শিক্ষা সচিব ডি. এম. সেনও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। প্রতিনিধিদল সাংবাদিকদের জানান যে শিক্ষকেরা আরও সুযোগসুবিধা পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়েছেন। সাহায্য চাইলেই বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা দিতে সমর্থ হলে সরকারও সম-পরিমাণ টাকা স্কুলগুলিকে দেবে। প্রাইভেট টিউশনি সম্পর্কে বোর্ডের সিদ্ধান্ত সরকার নড়চড় করবে না। গণ-সমর্থনের আরও সংবাদ পাওয়া গেল। ২৪ পরগণা জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বিবৃতি প্রচার করলো। নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে তাঁর হস্তক্ষেপে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান হবে। চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং বাস্তুহারা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্দোলন সমর্থিত হলো। শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশে শিক্ষা

আন্দোলন পূর্ণ সমর্থন লাভ করলো। ৩০শে জানুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও হিন্দ মজদুর সভার যুক্ত সভা হয়। সভায় টিটাগড় কাগজ কলের শ্রমিকদের দাবী, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামের দাবী এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণের দাবী সোচ্চার করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মৃণালকান্তি বসু ছিলেন ঐ সভার সভাপতি। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী নেওয়া হলো মেদিনীপুর জেলায়। ৩১শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর হলে জেলা সমিতির শিক্ষা সম্মেলন হলো। সভাপতিত্ব করলেন ঈশান মহাপাত্র। মদন খাঁ এম-এল-এ, নিকুঞ্জ চৌধুরী এম-পি এবং অনিলা দেবী বক্তৃতা দিলেন। ঐ দিন কালনা টাউন হলে শিক্ষক ও জনসাধারণ-এর জমায়েতে স্থানীয় কলেজ অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করলেন। হুগলী জেলার হরিপালে সভা হলো। স্থানীয় কলেজ ময়দানে সভা হলো। বর্ধমানে শহরের বাণী বিদ্যাপীঠে ও রায়নগরের সভার খবর বের হলো। সেখানে স্টীয়ারিং কমিটিও তৈরী হয়। পানিহাটীর শিক্ষকেরা সমবেত করলেন সমস্ত ছাত্র সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব আর অভিভাবকদের। গঠিত হল আন্দোলনের সাহায্যের জন্য স্ট্রাইক এইডস্ ও বিভিন্ন কমিটি। ঐদিন ডায়মণ্ডহারবার করঞ্জলি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও দাদরাহাটে সভা হলো। গোবরডাঙ্গায় অনুরূপ জনসভা হয়। সেখানকার হিন্দু কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও পৃথক এক সভা করে। কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত বহরমপুর গান্ধী ময়দানের সভার খবর আসে। প্রখ্যাত নেতা ত্রিদিব চৌধুরী শিক্ষকদের দাবীকে সোচ্চার করে তোলেন। ঐ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তালতলা নাগরিক সমিতির সভায় শিক্ষক ধর্মঘট সমর্থিত হয়। সভা হয় বিজয়গড়ে ও মেটিয়াবুরুজে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বর্ধিত সভায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট সমর্থিত হয়। প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য, শান্তি পরিষদ—এসব সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি শিক্ষকদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। দেশের শিক্ষা সংকটকালে সাংস্কৃতিক কর্মীরা নীরব থাকতে পারেন না এ কারণে শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আবেদন করেন—মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, নরেন্দ্র নাথ মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জনাব পারভেজ, কবি আবদুল ওদুদ, শম্ভু মিত্র, ধীরেন সেন প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা।

আন্দোলন যেন নদী-উপনদীর গণ্ডী কাটিয়ে সাগরে এসে পড়লো। ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার মনুমেন্টের নীচে (বর্তমান শহীদ মিনারে) সভা হলো। বিরাট সে সভা। কলকাতার বাইরে থেকে বহু শিক্ষক এসেছেন। সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতা থেকে শিক্ষকদের এক মিছিল দীর্ঘপথ মুখরিত করতে করতে ময়দানে এসে পৌঁছল। সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য। সভার শেষে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ফেস্টুন পুরোভাগে রেখে শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র ও জনসাধারণ মিছিল করে বের হলেন। অতুলনীয় সে মিছিল। রাজপথে মিছিলে ছাত্র ও শিক্ষক পাশাপাশি সারি করে দাঁড় হয়েছেন। তরুণ ছাত্র উদ্ভাসিত মুখে আওয়াজ তুলেছে "ছাত্র-শিক্ষক ঐক্য"—পরম উৎসাহে জবাব দিয়েছেন প্রবীণ শিক্ষক, "দীর্ঘজীবী হোক্"। এর কিছুক্ষণ আগে সভায় ছাত্র প্রতিনিধি ঘোষণা করছিলেন শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে ছাত্ররা ১০ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র ধর্মঘট পালন করবেন। সভার সভাপতি অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার ফলভোগ জনসাধারণকেই করতে হবে। এ কারণে জনস্বার্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিধানসভা ডাকা দরকার। তিনি এই মর্মে রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটি বিভিন্ন শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন সহ রাজনৈতিক দলের

নেতারা বক্তব্য রাখেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় বলেন, "শিক্ষকদের এই নগণ্য দাবীকে অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাখে। দেশবাসী এই কলঙ্কের উপযুক্ত জবাব দেবে।" সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, "সংগ্রামের পথ আমাদের অপরিচিত। অজানা পথে অগ্রসর হতে আশংকা নিয়ে আমরা ১০ই ফেব্রুয়ারী পথে অগ্রসর। কিন্তু আজ জনতার এই জাগ্রত সমর্থন আমাদের নতুন পথের নিশানা দিয়েছে। আমাদের বিপুল ভরসা দিয়েছে।" বলিষ্ঠভাবে কর্মবিরতির প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপস্থিত করেন সত্যপ্রিয় রায়। চিত্র সাংবাদিকেরাও বার বার তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন। সমুন্নত দেহে একটা পশমী চাদর জড়িয়ে দীপ্তভাবে যে বলিষ্ঠ ভঙ্গী প্রদান করেছিলেন তাতে তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত শিক্ষক-কুলের সে সময়ের চেহারা ও চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। শিক্ষক শ্রোতারা ও তাঁর সহকর্মীরাও উদ্দীপ্ত হচ্ছিল তাঁদের নেতা মনুমেন্টের নীচে মিনারের মতই দৃঢ়তা ও ঋজুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই ঐতিহাসিক সমাবেশের সংবাদ চিত্র সহ সকলের দৃষ্টিতে আসে। পরদিন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ময়দানের সংবাদ যখন পরিবেশিত হয় তখন অপর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দিল্লীর সংবাদ ভিন্ন ছন্দ সৃষ্টি করছিল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শাখার রামচন্দ্র কলেজ উদ্বোধন প্রসঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন "শিক্ষকদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তাঁদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে।"

প্রস্তুতি—ঘরে বাইরে

শান্ত নিরুপদ্রব জীবনযাপনে অভ্যস্ত শিক্ষককুলকে চূড়ান্ত সংগ্রাম ধর্মঘটে নিয়ে যেতে গেলে অত্যন্ত সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে তাকে নিয়োজিত রাখতে হবে কর্মবিরতির আগে পর্যন্ত, এই মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি সমিতির নেতৃত্বের ছিল। তাই তাঁরা কর্মবিরতির আগের দিন পর্যন্ত প্রসারিত হয় এমন এক সপ্তাহ সৃষ্টি করেছিলেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা সংগ্রাম সপ্তাহ। ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছিল ব্যাপ্তি। স্থির হয়েছিল প্রথম দিনে আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখাশোনা ও কথাবার্তা বলা হবে। পরবর্তী দু'দিনে হবে আঞ্চলিক ও মহকুমা শিক্ষক সম্মেলন। ৫ই ফেব্রুয়ারী হবে স্কোয়াড প্রচার। শহরে পথসভা এবং গ্রামে হবে হাটসভা। তার পরদিন হবে মহকুমার কোন এক স্থানে শিক্ষানুরাগী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে সভা। ৭ই ফেব্রুয়ারী ছিল শোভাযাত্রার জন্য নির্দিষ্ট। শিক্ষক ও জনসাধারণ মিলিতভাবে শোভাযাত্রা করবেন। ৮ই ছিল সরস্বতী পূজা। দিনটিকে প্রচারের কাজে লাগাতে স্থির হয়েছিল সারাদিন্ মাইকযোগে প্রচার চলবে। ব্যাপক মানুষ সেদিন বের হবে। তাঁরা শিক্ষা ও শিক্ষকদের অবস্থা জানবেন। তাঁদের সহযোগিতা চাওয়া হবে। ৯ই আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মীরা সমবেত হবেন এবং পিকেটিং-এর প্রস্তুতি নেবেন। গোটা সপ্তাহ জুড়ে কুপন বিক্রি ও গণ-স্বাক্ষর সংগৃহীত হবে। ব্যাপকভাবে প্রচারপত্র ছাড়া হয়েছিল। এতে ছিল সমিতির এই আন্দোলনের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে রাজস্বের উপর শিক্ষার অগ্রাধিকার, শিক্ষার বর্তমান ঘুণে ধরা অবস্থার পরিবর্তন, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি কথা। বলা হয় "ন্যায়পথের যাত্রী আমরা, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি এই আমাদের মূলমন্ত্র হোক।" সাংগঠনিক তৎপরতায় জনসাধারণের ৬ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যায় শিক্ষক ও শিক্ষিকা স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল। যতদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলে ততদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ অথচ কার্যকরী পিকেটিং চালাতে হবে কথা ছিল। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহানুভূতিশীল

করবার লক্ষ্য ছিল। তাঁদেরকে আন্দোলনের পাশে রাখতে উদ্যোগী হবার নির্দেশ ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাতে কর্মবিরতিকালে স্কুলের আশে পাশে না থাকেন এবং প্রধান শিক্ষকদের খুব জরুরী কাজে স্কুলে যেতে হলে স্বাভাবিক কার্যসময়ে না যান সে নির্দেশ ছিল।

২রা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে জ্যোতি বসু সহ বারো জন বিরোধী নেতার এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থন করে তাঁরা এ বিবৃতি প্রচার করেন। এর প্রারম্ভে লেখা হয় "রাজ্যের জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবী বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার এ দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে আসছেন। ফলে শিক্ষক সমাজ অপরিসীম আর্থিক দুর্গতি ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঐদিন দশটি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁরা বললেন, "পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে অপচেষ্টা চালিয়েছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।" পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে ললিত কুমার সিংহের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, "আসন্ন সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রাথমিক শিক্ষক বিশেষ করে সকল আঞ্চলিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে অনুরোধ করছি।......সর্বস্তরের শিক্ষকদের ঐক্যকে বলিষ্ঠতর করতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে অন্য কাহারো পশ্চাতে থাকিবে না, একথা আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।" নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহবানে বিভিন্ন দলমতের শ্রমিক সংগঠনগুলি একত্র হলো। স্টুডেন্টস্ হলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ মজদুর সভা, সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, প্রাদেশিক কিষান সভা, নিখিল ভারত ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, নিখিল বঙ্গ কলেজ কর্মচারী সমিতি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ডক মজদুর ইউনিয়ন, পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন। এঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হলো সমন্বয় কমিটি। সমন্বয় কমিটিতে তিনজন আহ্বায়ক হলেন। সভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, যতীন চক্রবর্তী, পরিতোষ চ্যাটার্জী ও মহম্মদ আবদুল্লা রসুল। সমিতির পক্ষে ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সত্যপ্রিয় রায়। ঐ সভায় আহ্বান দেওয়া হয় মহকুমা এমন কি আঞ্চলিক পর্যায়েও যেন এই ধরনের সমন্বয় কমিটি করা হয়। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক ও কলেজ অধ্যাপকদের নিয়ে নানা জায়গায় কাজ শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কংগ্রেস কর্মীদেরও আন্দোলনে নানা জায়গায় আহ্বান করা হতো। আন্দোলনের প্রস্তুতি প্রধান শিক্ষক সমিতিকে উদ্বেলিত করে। প্রধান শিক্ষক সমিতি ঘোষণা করে—"মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালালে বর্তমান শিক্ষা সংকট থেকে উদ্ধার পাবার সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবন করা যেতে পারে।" চাপে পড়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাদের সভায় বিস্তারিত আলোচনায় স্থির হয় শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই পরিণতির কথা বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাব আরও বিশদভাবে আলোচনা করে কর্মবিরতি এড়াতে প্রতিনিধিদল সচেষ্ট হবেন। প্রতিনিধিদল তৈরী হলো। তাঁরা যেদিন সাক্ষাৎকারের জন্য স্থির করেছিলেন তার পরদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীতে ছিলেন অধ্যক্ষ জে. এম. সেন, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বামনদাস মণ্ডল, অনিলা দেবী, ডঃ ফুলরেণু গুহ, মীরা দত্তগুপ্ত। তাঁরা ৫ই ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের

সঙ্গে বসলেন এবং সমস্ত অবস্থার কথা বললেন। ডাঃ রায় বললেন বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটি যদি আয় বাড়াতে প্রস্তুত থাকেন এবং শিক্ষকদের সাড়ে সতেরো টাকা মহার্ঘভাতা দেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই পরিমাণ অর্থদানের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। প্রতিনিধিদল আবার আসন্ন কর্মসূচীর গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করলে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে বেতনহার ঘোষণা করেছে তা সরকার মেনে নিতে পারে না। এর আগে তিনি যে বেতনহার ঘোষণা করেছেন তার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি ঐগুলি পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন না। প্রতিনিধিরা বলেন, বি. টি. পাশ নয় এমন শিক্ষক বা অবস্নাতকদের ব্যাপারে সরকার কোন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন না। ডাঃ রায় জবাব দিলেন, "এই ধরনের শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়াই ভাল।" মুখ ম্লান করে সদস্যেরা ফিরে এলেন। কয়েকদিন আগে বসুমতী পত্রিকায় এক ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম ছিল "একলব্যের গুরু দক্ষিণা।" শিক্ষক-এর সম্মুখে তাঁর বয়স্ক ছাত্র তার বুড়ো আঙুলটা চমৎকার ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে দেখাচ্ছে। শিক্ষক এইভাবে তার কাছ থেকে দক্ষিণা লাভ করছেন। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা তখন মোটামুটি এক হাজার। সরকারের ঘোষণা মাফিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী ছিলেন সর্বমোট চার হাজার। সমিতি স্পষ্টতঃই বলেছিল শতকরা ৯০ জন শিক্ষককে তাঁদের সর্বনিম্ন বেতন বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত করাই এই সরকারী ঘোষণার লক্ষ্য।

শিক্ষা সংগ্রাম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের সব এলাকা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জনসভা, গ্রুপ মিটিং চললো সব প্রান্তে। কলকাতা ল্যান্সডাউন অঞ্চলের সভা হয় সাউথ সুবারবন স্কুলে। টালিগঞ্জ যাদবপুরের শিক্ষকেরা জনসাধারণকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলেন। কালীঘাটে ডঃ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভা হলো। ভবানীপুরের শিক্ষকেরা মিলিত হলেন রামরিক স্কুলে। হাওড়ার কাছে শিবপুরে শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ালো সেখানকার সমস্ত ক্লাবের সদস্য প্রতিনিধিরা। কোচবিহারে পৌরপতির সভাপতিত্বে সভা হলো। রানাঘাটের গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দিরের সভায় প্রচুর জনসমাগম হলো। জলপাইগুড়িতে চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মিলিত উদ্যোগে শিক্ষক আন্দোলনের উপদেষ্টা পরিষদ তৈরী হলো। ২৪ পরগণার নানা জায়গা থেকে যেমন বড়োল, মহিরামপুর, রায়পুর থেকে সভার সংবাদ পাওয়া গেল। উত্তরপাড়া কোন্নগরের শিক্ষকেরা স্নেহলতা সেনের সভাপতিত্বে সভা করলেন। মাহেশে সভা হলো। কসবার চিত্তরঞ্জন স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হলেন অভিভাবকেরা। আসানসোলে ইখড়াতে বিরাট জনসমাবেশ হলো। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গুরুদ্বার পার্কের সভায় সুধা রায়, সত্যপ্রিয় রায় ও মণিকুন্তলা সেন বক্তৃতা দিলেন। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সভা করে শিক্ষক সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের সব জনপদেই সভা হলো। মালদহ টাউন হলে বৃহৎ সভায় মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বক্তৃতা দিলেন। ট্যাংরাখালি ও ক্যানিং হাই স্কুলে সভা হলো। খিদিরপুরে আবার জনসভা হয়। সোনারপুর অঞ্চলে সংগ্রাম পরিষদ আহূত সভায় প্রচুর জনসমাগম হলো। হাওড়া শ্যামপুর থানার শিক্ষকেরা সভা করলেন। বালীতে পাঁচশত লোক শিক্ষকদের ডাকে সমবেত হলেন। বালীগঞ্জ এলাকায় অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। শিক্ষক সংগ্রামের সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বাজার সমিতি ও ভারতীয় ওয়ার্কাস ইউনিয়ন। চেতলায় মণি সান্যালের নেতৃত্বে সভা হলো। হাওড়া টাউন হলে পৌরপতি কার্তিক দত্তের সভাপতিত্বে বিশাল সভা হলো। চুঁচুড়া পৌরসভার ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন পৌর-সদস্য শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃতি দিলেন। শ্রীরামপুরের শিক্ষকেরা আঞ্চলিক শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলেন। বিডন স্কোয়ারের সভায় ডাঃ নারায়ণ রায় ও রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ভাষণ দিলেন।

শ্যামপুকুরে সভা হলো। শশাংকশেখর বাগচীর সভাপতিত্বে ঝামাপুকুরে সভা হলো। দমদম নাগেরবাজার সভায় অনিলা দেবী ভাষণ দিলেন। আসানসোলে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক সংঘ ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মিলিত হলেন। সেখানে গঠিত হলো শিক্ষা আন্দোলনে সাহায্য সমিতি। ৬ই ফেব্রুয়ারী বেহালা মেন্টন মাঠে জনসভা বড় হলো। কারখানা থেকে শ্রমিকেরা সভাযাত্রা করে সভাস্থলে পৌঁছল। ইন্টালী জগদীশ বিদ্যাপিঠের গোষ্ঠবিহারী মুখার্জীর সভাপতিত্বে সভা হয়। অনিলা দেবী সেখানে বক্তব্য রাখলেন। নাগরিক কমিটির উদ্যোগে চেতলা পার্কেও বড় সভা হলো। বক্তব্য রাখেন সমিতির শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সত্যপ্রিয় রায় ও সুধা রায় এবং মণিকুন্তলা সেন। মেটিয়াবুরুজে ও বিজয়গড়ে জনসভা হয়। শিক্ষক সংগ্রামে সহযোদ্ধা হতে তালতলায় গঠিত হয় নাগরিক কমিটি। উত্তর কলকাতার ভূপেন বসু বিদ্যালয়ে সভা হলো। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীরা সহ কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত দুই শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাবেশ হল ও সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলো। মেটিয়াবুরুজ গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়ে কমলাপতি রায় শিক্ষক সংগ্রামের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন। বিজয়গড়ের সভায় সভাপতিত্ব করলেন সুকুমার চক্রবর্তী। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দাসের সভাপতিত্বে সভা হলো দুর্গাচরণ ডাক্তার লেনে। কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন সদস্য মেয়রের কাছে আবেদন করলেন আসন্ন শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে আগামী সভায় আলোচনা করা হোক।

পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর এক দীর্ঘ বিবৃতি সংবাদপত্র গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। তিনি বলেছিলেন, "দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, উন্নয়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষক সাধারণের অবস্থার উন্নতি বিধানের দাবী সার্বজনীন। পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজস্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় করা হয়, অপরাপর প্রদেশের তুলনায় তা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এমন কি সরকারের তরফ থেকে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাখাতে মোট যে ব্যয় হয়ে থাকে তা রাজস্বের ১৪ শতাংশের বেশী নহে। অথচ কমিশন রাজস্বের শতকরা ২০ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সুপারিশ করেছেন।......শিক্ষকেরাই আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরুদণ্ড স্বরূপ, কাজেই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আমার সনির্বন্ধ আবেদন, তাঁরা দুর্ভাগ্যজনক শিক্ষক সমাজের পাশে এসে দাঁড়ান এবং আসন্ন সংগ্রামে তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।"

সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের পক্ষে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, সুবোধ ব্যানার্জী ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃতি প্রচার করলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি থেকে আবার সমর্থন জানানো হলো। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক কেশবেশ্বর বসু মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে বললেন, "শিক্ষকদের দাবী পূরণ না হলে ভয়াবহ সংকট দেখা দেবে, এর জন্য সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে। কি অবস্থায় দুর্গত শিক্ষকেরা এই বেপরোয়া পন্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন সরকারকে তা সম্পূর্ণভাবে বোঝা উচিত।...... শিক্ষকদের দাবীগুলি শুধু যুক্তিসংগত নয়, অতি সামান্য—যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করবেন। আসন্ন সংকটে বাইশ হাজার শিক্ষক ও সাড়ে সাত লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে মীমাংসায় বসা উচিত।"

কলকাতা করপোরেশনের বারোজন কাউন্সিলর শিক্ষক স্বার্থে ও আসন্ন শিক্ষক আন্দোলনে শিক্ষাজগতের ক্ষতি এড়াবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক যৌথ বিবৃতি দেন। তাঁরা জনসাধারণকে তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে আবেদন করলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে বিশাল সমাবেশ হলো

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। এই সমাবেশে শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী সম্পর্কে সরকারী মনোভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। শিক্ষকদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে ও সেগুলি মেনে নিতে আবেদন করা হয়। সভাপতি ছিলেন মোহিত কুমার মৈত্র। সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষকদের দাবীদাওয়ার প্রতি সরকারের উপেক্ষার উদাহরণ তুলে ধরেন। এর ফলস্বরূপ শিক্ষার দিক থেকে রাজ্য পশ্চাদপদ হয়ে পড়ছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী ছাত্রেরা অকৃতকার্য হচ্ছে। এর কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে চরম উদাসীন। ভারত সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের কি ভূমিকা হবে তা বিবেচনা করবার জন্য খের কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের রায়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার বাজেটের ১০ শতাংশ অর্থ এবং রাজ্য সরকারকে ২০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা উচিত। অথচ দুঃখের কথা পশ্চিমবঙ্গ এখনও বাজেটের সাত শতাংশ মাত্র এ ব্যাপারে ব্যয় করছে। এই সময়ে অন্যান্য রাজ্য শিক্ষাখাতে ব্যয়ের মাত্রা বাড়াতে পেরেছে। শুধু রাজ্য না কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী অপ্রশংসনীয়। জাতীয় পরিকল্পনায় যেখানে দু'হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেখানে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের মাত্রা নগণ্য। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সরকার কৃষক ও শ্রমিকদের ফসল ও উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলছেন। কিন্তু এদের শিক্ষামানের কথা বলছেন না। শিক্ষার অভাবে সোনার দেশে আজ ফসল নাই। দুর্ভিক্ষ চিরসাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকদের পয়সা নিয়ে অর্থাৎ ছাত্র বেতনবৃদ্ধি করে শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সরকারকেই শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শিক্ষার জন্য যা করছে তা আমাদের দেশেও অনুসৃত হওয়া দরকার। শিক্ষার প্রসার ছাড়া এ জাতি তার পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। সর্বশেষে তিনি সমিতির আন্দোলনের কথা বললেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের মানুষের ব্যাপক সমর্থনকে ধন্যবাদ দেন। সরকার জনমতকে অগ্রাহ্য করে চলছেন। তবু কোন প্রকার ভয়ভীতির কাছে শিক্ষক সমাজ মাথা নত করবেন না। যে মুহূর্তে তাঁদের দাবী পূরণ করা হবে সেই মুহূর্তে তাঁরা কর্মবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু তার আগে সংগ্রামের পথ থেকে তাঁরা কোন মতেই সরে আসবেন না। সমাবেশে সুবোধ ব্যানার্জী বলেন, "শিক্ষকদের আন্দোলন আজ শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কারণ সমস্যাটি শিক্ষক সমাজের নয়। এটা জাতির সমস্যা।" সভায় আর-এস-পি-এর পক্ষে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বি. ডি. দলের পক্ষে রমেন দে, হিন্দু মহাসভার নীহার দাস, জনসংঘের সত্যেন বসু আর-সি-পি-আই-এর বিমলানন্দ মুখার্জী, বলশেভিক পার্টির তারা দাস, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড পার্টির অজিত সেন ও অধ্যাপক শান্তি দাশগুপ্ত ভাষণ দেন।

সভায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল জ্যোতি বসুর উপস্থিতি। দীর্ঘদিন আগে ভারত-সভা ভবনে সমিতি যখন আন্দোলনমুখী হবার প্রথম চিন্তা কার্যকরী করতে যাচ্ছে রাজ্যের এম. এল. এ, এম. এল. সি-দের সভা আহ্বান করেছে তখন শ্রীযুক্ত বসু তাঁদের সর্বপ্রথমে আন্দোলনের স্বার্থে জনমত গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমিতির ব্যাপারে জনসমক্ষে সেদিন তাঁর উপস্থিতি এক নতুন পদক্ষেপ বলে চিহ্নত হয়েছিল। তাঁর সেই পরামর্শ সমিতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক মিছিলের দিন বিধানসভা উত্তাল করে সমাবেশে এসে আবার তাঁদের তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর দল তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সেদিন পরিস্ফুট হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিবৃতির মধ্য দিয়ে বরাবর শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কর্মবিরতির তিনদিন আগে এই ব্যক্তিত্বের সর্বসমক্ষে

উপস্থিতি আন্দোলন সংগঠকদের মনে প্রবল ভরসা সৃষ্টি করে। জ্যোতি বসু বলেন, "বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী শিক্ষার বিস্তার করে যদি সত্যিই দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে চান, তাহলে শিক্ষার দাবীকে অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। ডাঃ রায় বিদেশ ঘুরে এসে বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলেন। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর কাছ থেকে কোন কথা শোনা যায় না। বিদেশে তো শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।" তিনি শিক্ষক আন্দোলনের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। সময় থাকতে সরকারকে সংকট এড়াবার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "শিক্ষকেরা অতি সামান্য দাবী উত্থাপন করেছেন। বৃটিশ শাসনের সময়ও শিক্ষকেরা কোনদিন দাবী আদায়ের জন্য রাস্তায় বের হননি। আর আজ কংগ্রেস আমলে তাও হচ্ছে। স্বভাবতঃ জনসাধারণ শিক্ষকদের পাশেই রয়েছে ও থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের লাঞ্ছনা না দেবার ইচ্ছা থাকলে সরকার এখনই এ ব্যাপারে মীমাংসা করতে পারেন।" সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মৈত্র বলেন, "সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করবার ফলেই আজকের আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে আজ তাঁদের অবস্থা চরমে উঠেছে।"

উল্লেখ্য শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে কোন কোন পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ পায় যেগুলি সমিতি সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়নি। শিক্ষকেরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করবেন বলে যে সংবাদ বের হয়, সমিতির পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়। কোন পত্রিকা প্রকাশ করে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুপারিশ কার্যকর হলেও শিক্ষকেরা ধর্মঘট করবেন, ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ কথার প্রতিবাদ করে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় বলেন, "কলকাতার কতকগুলি সংবাদপত্রে খবর যে সমিতির সব দাবী মেনে নিলেও ধর্মঘট হবে। কারণ সরকার বিরোধীরা এই ধর্মঘটের উদ্যোক্তা। এ প্রচারের মধ্যে কোন সত্য নিহিত নাই। সমিতি তাঁদের দাবী দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে আসছে। এর জন্য যথারীতি সরকারের কাছে দাবীপত্র পেশ করেছে। দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষার পর তাঁদের চূড়ান্ত কর্মসূচী নিতে বাধ্য করা হয়েছে। শিক্ষকেরা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির দাবী ও তাঁদের বাঁচবার দাবীতে একতাবদ্ধ হয়েছে।"

"আমরা সকলের সমর্থন কামনা করি। সরকারে অধিষ্ঠিত দলটিকেও সঙ্গে পাইলে আমরা খুশী হইতাম। শিলিগুড়ি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে বেতন ও মহার্ঘভাতার দাবী করিয়া সমিতি প্রমাণ করিয়াছে যে কোনরূপ সংঘাত এড়াইতে তাহারা কত ব্যগ্র। এই সামান্য দাবী প্রত্যাখান করিয়া সরকার ইহাই প্রমাণ করিলেন যে শিক্ষার প্রতি তাঁহারা কত উদাসীন। আমরা ঘোষণা করিতেছি যে পর্ষদের সুপারিশ মানিয়া লওয়ার সংগে সংগেই আমরা কর্মবিরতির কর্মসূচী প্রত্যাহার করিব।"

৫ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রীসভা বৈঠকে শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা চলে। আর্থিক দায়-দায়িত্ব স্বীকার না করে সাময়িক কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় কি না মন্ত্রীসভা এ বিষয়টি নিয়ে ভাবেন। শিক্ষকদের সন্তানদের বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাঁদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের সাময়িক সাহায্যদানের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। মহার্ঘভাতার ব্যাপারে নতুন কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার অধিবেশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে বলেন (১) যে সব শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত নন তাঁদেরকে তিন বছরের জন্য বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে। তিন বছরের জন্য তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতার অতিরিক্ত মাথাপিছু প্রতি মাসে পাঁচ টাকা বাড়তি পাবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে। (২) সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরাও ঘোষিত মহার্ঘভাতার সুযোগ পাবেন। কিন্তু যে সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সাড়ে

সাতশতের অধিক তাঁরা এ রকম সাহায্য পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান ব্যবস্থার ফলে সরকারকে বছরে ৩০ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় করতে হবে। বর্ধিতহারে দুর্মূল্যভাতা দেবার দায়িত্ব সরকারের পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। তবে শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতির কথা বিবেচনা করে তিন বছরের জন্য এই অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলো। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। সত্যপ্রিয় রায় বলেন যে ডাঃ বি. সি. রায় শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আর এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর বিবৃতির প্রারম্ভে দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের প্রতি কোন সুবিচার করা হয়নি। শিক্ষকদের বেতন মাগ্‌গীভাতা সম্পর্কে পর্ষদ্‌ যে সুপারিশ করেছে তা কাজে পরিণত করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। ঐ ঘোষণাপত্রে 'রাজনৈতিক বাকচাতুর্য' প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন, সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা মোট শিক্ষকসংখ্যার দশ শতাংশ মাত্র। বিদ্যালয়ে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষক হলেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন এমন গ্র্যাজুয়েট। এঁদের জন্য পর্ষদ যে সুপারিশ করেছে সরকার তার ধারপাশ দিয়েও যাননি। সেই সঙ্গে শিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট যাঁরা সংখ্যায় বিদ্যালয়ে ৪৫ শতাংশ তাঁদের জন্যও কোন চিন্তাভাবনা হলো না। এমতাবস্থায় তিনি জানান, "আমরা বলিতে চাই যে ডাঃ রায় যদি সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মনোভাব লইয়া এ সম্পর্কে ব্যবস্থা না করেন, নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।"

শিক্ষকদের সংগ্রামী মেজাজকে অটুট রাখতে কতকগুলি দৈনিক পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এ প্রসংগে "স্বাধীনতা" পত্রিকার ৬ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয় লক্ষ্যণীয়। তাঁরা লিখলেন "শিক্ষকদের সংগ্রামের সমর্থনে বহু খ্যাতিসম্পন্ন কংগ্রেসী কর্মকর্তাগণও মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ, পশ্চিম দিনাজপুরের কংগ্রেসী কর্মকর্তাদের দ্বিধাহীন সমর্থন ঘোষণা প্রভৃতি দেখিয়াও কংগ্রেসী শাসকেরা যদি হাওয়া চিনিতে না পারেন তবে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের বিপুল ধাক্কায় তাঁহাদের দাম্ভিক ঔদ্ধত্যের সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্য দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে।" "ডাঃ রায় যে সরকারের প্রধান পুরোহিত, তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে অন্ততঃ আমাদের কোন মোহ নাই। তবু আশা করা গিয়েছিল যে দেশের দরিদ্র, বঞ্চিত শিক্ষক সমাজের প্রতি তিনি সামান্য একটু সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। বরং জনমতের সম্মুখে শিক্ষকদের দাবীকে অন্যায় ও অসংগত প্রতিপন্ন করিয়া পরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরী করতেই যেন তিনি আজ অধিকতর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।" এক চাঞ্চল্যকর সংবাদও প্রকাশিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী বোলপুর রেল ময়দানে শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, "তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং অন্য কোন দলের লোক নহেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকদের দাবী ও শিক্ষার আন্দোলন সমর্থন করেন।" কলকাতার মতই হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা উত্তাল হয়ে ওঠে। আসানসোলে ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা মিছিল বের করে। হাওড়ার শিবপুরেও নরসিংহ দত্ত কলেজে জনসভা হয়। সেখানে ষোলটি গণ-সংগঠন ও ক্লাবগুলিতে মিলিত মিছিল শিক্ষকদের সমর্থনে বের হয়। অনুরূপ মিছিল হয় ২৪ পরগণার সোনারপুরে ও ইছাপুরে। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর বাজারে, চুঁচুড়া দাসপাড়ায়, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। শুধু যৌথ কর্মসূচীতে নয় এককভাবে সংগঠনকে শিক্ষক

সংগ্রামের পাশে নিজেকে শক্তিশালী করতে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন জানুয়ারী মাস থেকে আরও কর্মসূচী নিয়েছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী উত্তর ও মধ্য কলকাতার ছাত্রদের সাধারণ সভা হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী বোলপুর ধর্মশালায় ৩০০ ছাত্র সভায় যোগ দেয়। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও ভাবতা বাজারে সভা হলো। বর্ধমান জেলার দাইহাটাতেও বড় ছাত্র সভা হলো। কলকাতার ছাত্রেরা ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গবাসী কলেজ কমন রুমে সমবেত হলেন। পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামে শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে কৃষকদের জমায়েত করা হলো। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা জানুয়ারী মাসের শেষভাগে কাউন্সিল সভায় শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সম্মানিত সমাজের নির্দিষ্ট দাবীগুলি পূরণের আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন "পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল শিক্ষক সমাজের এই সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং সংগ্রামী শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও সংগ্রামের সাফল্য কামনা করিতেছে।" সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের জায়গাগুলি থেকে সভা সমাবেশের যেমন তারকেশ্বরের চার পাঁচটি গ্রামে যে সভা করেন তাতে ষোলশত কৃষক যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার বিভিন্ন স্থানে সভা হয়। বর্ধমান জেলার মশাগ্রাম, মাজদিয়া প্রভৃতি গ্রামের সভায় ব্যাপক সংখ্যায় কৃষকেরা যোগ দেন। শেষ দিনে দেশবন্ধু পার্কে কলকাতার বড় বড় শিল্প কারখানার শ্রমিকদের আর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। সকল বক্তাই মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতিকে 'অন্তঃসারশূন্য' বলে অভিহিত করেন। সভাপতিত্ব করেন বড়বাজার হিন্দি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভুবন মোহন সিং। সত্যপ্রিয় রায় বললেন, ডাঃ রায় যোগ্যতাসম্পন্ন নন এমন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির পক্ষপাতী নন। তিনি যোগ্যতার বিচার কি ভাবে করতে চান তা বুঝতে বক্তা অক্ষম।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ইন্টারমিডিয়েট ও ম্যাট্রিক ট্রেন্ড শিক্ষকদের যোগ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। ঐ শ্রেণীর শিক্ষকেরা চাকরী ছেড়ে গেলে বহু স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি সার্থক হয়ে উঠবে। ডাঃ রায় বলছেন যে ট্রেনিং নাই এরকম শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। তিনি প্রশ্ন করতে চান, এ রকম ব্যাপক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা কোথায়? ট্রেনিং কলেজ যাও আগে ছিল সেগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকার শিক্ষা সংকোচন সাধনে আগ্রহী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত প্রারম্ভিক বেতন ১৯৪৮ সাল থেকে বকেয়া ধরে দেওয়া হবে। শিক্ষকেরা বর্ধিত বেতনের সুযোগ ১৯৪৮ সাল থেকে পাবেন। অথচ তিনি আগে বলেছিলেন নিয়োগের সময় থেকে দেওয়া হবে। এ কারণে অনেক শিক্ষকেরা যাঁরা ১৫।২০ বছরের অভিজ্ঞ তাঁদের বঞ্চিত করা হবে। সভায় শিক্ষক নেতা শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে শিক্ষকেরা কর্মবিরতির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আকস্মিক নয়। বহুকাল আবেদন-নিবেদন করার পর ব্যর্থ হয়ে তাঁরা এই চরম পথ নিতে বসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা একেই ব্যয়সাধ্য। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি বেসরকারী স্কুলগুলির খেয়ালখুশীর উপর ছেড়ে দিলে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করে এই অর্থ সংগ্রহ করা হবে। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাথে সাথে জনসাধারণ মনে করে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা কোনমতেই চলবে না। শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক সুবোধ ব্যানার্জী বলেন, সরকারের নীতি শিক্ষা সংস্কার নয়। তাদের শিক্ষা সংহার নীতি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সম্প্রতি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া গেল বলে

যে ঘোষণা করছেন তা যথার্থ নয়। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যত সংখ্যক ট্রেনিংবিহীন শিক্ষক আছেন তাঁদের সকলকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে গেলে চল্লিশ বছর সময় লাগবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির পক্ষে ডঃ মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষকদের এই সব দাবী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এর উপর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সভায় ডঃ জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য বক্তৃতা দেন। সমিতির নেত্রী শ্রীযুক্তা সুধা রায় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শিক্ষকেরা এই আন্দোলনে ব্রতী হয়েছেন। বিশিষ্ট কৃষক নেতা মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল কৃষক সমিতির সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। সভাপতির ভাষণে ভুবন মোহন সিং বলেন, "স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এই দেশে কোন সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন ক্রমেই শিক্ষা বলা চলে না। স্বাধীন সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করা। অথচ এই কাজ করা হয়নি"। তিনি বলেন, "গত ১০।১২ বছরের মধ্যে ছাত্রদের বেতন তিন চার গুণ বেড়েছে, অথচ শিক্ষকদের বেতন বাড়েনি। শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য শিক্ষকদের বেতনক্রম ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। বার বার আবেদন-নিবেদন করেও এইসব দাবীর প্রতি সরকারের সহানুভূতি লাভ করা যায়নি।"

এই দিন ছিল প্রচারের শেষ দিন। সাধারণ নির্বাচনের আগের দিন যেমন প্রচার কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তেমনি ৯ই ফেব্রুয়ারী সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট ছিল সাংগঠনিক কাজের জন্য। এই দিন কর্মীরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন তার নিশানা ঠিক করবেন লড়াইয়ের আগে যে প্রস্তুতি দরকার। প্রচার কর্মসূচী কত ব্যাপকতালাভ করেছিল ৯ই যখন স্তব্ধতা নিয়ে আছে সেদিন অনুমান করা যেত, সমিতির এক কর্মী সে কথা লিখেছেন; কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে যে কোন পথেই কোন যাত্রী লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন, ছজন শিশু কিংবা কিশোর একত্র হওয়া মাত্র সারি দিয়ে এগিয়ে চলছে—তারা ধ্বনি দিচ্ছে "শিক্ষকদের দাবি মানতে হবে—জাতির দাবি মানতে হবে"।

সাত

কর্মবিরতি

শিক্ষক আন্দোলনে ময়দানের সভায় যোগদানকারী ৪৫ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে দিলেন, "যাই ঘটুক, দশই ফেব্রুয়ারী আমি কাজ বন্ধ করব।" এর কিছুদিন পরে আর এক প্রবীণ শিক্ষক অবনী ভট্টাচার্য বললেন "কে বলে ইহা কর্মবিরতি! আমি বলি উহা উচ্চ কর্ম।" ৮ই ফেব্রুয়ারী এক গাদা পোস্টার নিয়ে পরনে আধ ময়লা পাঞ্জাবী আর উঁচু করে পরা ময়লা ধুতি ষাট বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক হরেন্দ্র রায় চৌধুরী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, "চিরজীবন যে বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা সহ্য করেছি আজ বৃদ্ধ বয়সে তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি।...দশই ফেব্রুয়ারীর মিছিলে এই বৃদ্ধকে দেখবেন সবার আগে।" কর্মবিরতি যে ধর্মঘট এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম এ কথা সবাই স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন। স্কুলের যৎসামান্য বেতন তাও ছিল অনিয়মিত। শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত এবং অতিশয় কৃতী ছাত্ররা যাঁরা এই বৃত্তিতে আসতেন তাঁদের নিতান্ত হেয়ভাবে জীবনযাপন করতে হতো। অনেককে উঞ্ছ বৃত্তি নিতে হতো। এ নিয়ে নিজের মনে দ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। আর ঐ দুর্বলতার জন্য নিজেরাই উপলব্ধি করতেন যে তাঁরা 'অমনুষ্যোচিত জীবনযাপন করছেন। কর্মবিরতির আগে এঁরা এক সফল সংগ্রামের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। বর্তমানের সীমাবদ্ধ ক্লেদ-ক্লিষ্ট জীবন থেকে বাইরে যাবার দরজা খুঁজে পেয়েছিলেন। কর্মবিরতির প্রস্তুতিতে তাই ভয়ভীতি নয়, উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যাপারে বয়োবৃদ্ধ শিক্ষকদের দৃঢ়তা আর সদর্প ঘোষণা অন্যান্যদের মনে জোগাতো অফুরন্ত উৎসাহ। সারা জীবন বঞ্চনার শেষে এসে এঁরা আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন তা নয়। হৃত সম্ভাবনা তাঁদের জীবনে ফিরে আসবে না তাঁরা জানতেন। কিন্তু বহু ব্যর্থ আবেদন আর বহু আশাভঙ্গ একটা সার্থক পথ ধরেছে তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁদের জীবনে করা ছোট ছোট লড়াইগুলো এক বিশাল সমরে রূপান্তরিত হয়েছে এই আনন্দে তাঁরা বিভোর হয়ে পড়েছিলেন। এই মানসিকতা এ সময়ে বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এঁদের একজন কবিতা লিখেছিলেন—

"আমাদের সেই যন্ত্রণার আর্তনাদ
আজ তোমাদের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে।
জীবনের নির্ভীক দাবী আজ বেজে উঠেছে দিকে দিকে।
চিরকালীন পুরাতন উপদেশে ভোলোনি তোমরা
মুগ্ধ হওনি মিথ্যা স্তোকবাক্যে।
আমরা যে কথা বলতে পারিনি কখনো
তোমরা বলেছ সে কথা—
বলেছ, 'কর্তব্য যাঁর আছে, তাঁর অধিকারও আছে।
যাঁর দায়িত্ব আছে, দাবীও আছে তাঁরই।'
নিজেদের ভাগ্যসৃষ্টির কাজ তোমরা নিজ হাতে তুলে নিয়েছ,
মুখোস খুলে দিয়েছ ছদ্মবেশী ভণ্ডদের।
অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ে মিলেছ এসে পথের মিছিলে।
তাই তোমাদের অভিনন্দন জানাই,
জানাই আমার আশীর্বাদ।"

শিক্ষকেরা দেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং তার চূড়ান্ত ধারা ধর্মঘটের সঙ্গে অনেক ভাল করেই পরিচিত ছিলেন। মাঝখানে শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ শুরু হয় ৪৭ সালের প্রথম থেকে। স্বাধীনতার পর দেশের শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মনে অন্যভাব সৃষ্টি হয়। তারা ভাবতে থাকেন দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য তাদের আর কষ্টকর পথে যেতে হবে না। ঠিক এর আগে কংগ্রেসের আই. এন. টি. ইউ. সি-র জন্ম হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে এ সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে এ. আই. টি. ইউ. সির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকদের একই অভিজ্ঞতা হলো। তাঁরা দেখলেন শ্রমিকবিরোধী নীতিতে শুধু মালিকেরা একা নন, তাঁদের পাশে রয়েছে শাসক শক্তি। সরকার আহূত আপস বৈঠকগুলিতে শাসকশক্তি মালিকদের উপর চাপ রাখতে অসমর্থ হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে আই. এন. টি. ইউ. সি-র ঝাণ্ডার নীচে থেকেও শ্রমিকেরা অন্য সংগঠনের আন্দোলনে অংশ নিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির উপর বে-আইনি ছাপ উঠে গেলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হলো। ৫২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি হলো। যুদ্ধোত্তর কাল থেকে ছাটাই চলছিল অবিরাম গতিতে। তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মানসিক প্রস্তুতি ছিল। এ নিয়ে আন্দোলন হল। সংগঠিত শিল্প শ্রমিকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করলেন। তখন ছোট ছোট আন্দোলন নয় প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে বিরাট আন্দোলন জন্ম নিল। সুতাকল শ্রমিকেরা সংগঠিত আন্দোলন চালালেন। চটকল শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন পরে আন্দোলনে নামলো বোনাসের দাবীতে। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শ্রমিকেরাও এই পথ ধরলেন। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ লড়াই এর-সূচনা করলো। স্টেট বাস শ্রমিক, ট্রাম মজদুর, দেশরক্ষা শিল্প শ্রমিকেরাও সংগ্রামমুখী হলেন। ছাঁটাই ও বেকারীবিরোধী আন্দোলনে কৃষক, যুব, ছাত্র, শিক্ষক-মহিলা, বস্তীবাসী-সংগঠন ও উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি যোগ দিল। বড় বড় সমাবেশ হলো। ১৯৫৩ সালে ১৩ই মার্চ কলকাতায় বেকারী ও ছাঁটাইবিরোধী বিশাল শোভাযাত্রা হয়। এরপর থেকে যথেচ্ছ ছাঁটাই করতে মালিকেরা কিছুটা পশ্চাদ্ধাবন করেন। এ বছর জুন মাসে শিল্প ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শ্রমিকেরা ধর্মঘট করলেন। বার্নপুর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকেরা মালিক স্যার বীরেনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছিলেন। লড়াইয়ে জিততেই হবে এই মানসিকতা নিয়ে বার্নপুর থেকে কলকাতা পদযাত্রা পরিচালনা করলেন। ২২শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর এই দীপ্ত অভিযানে শ্রমিকেরা এক নতুন ইতিহাস তৈরী করলো। দীর্ঘ পথে তাঁরা কৃষকদের দ্বারা ও মহিলাদের অভ্যর্থনায় সম্বর্ধিত হলেন। এ বছরে ১৯শে আগষ্ট কৃষক সমিতি কলকাতায় বড় খাদ্য সমাবেশ করে। দ্বিতীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর। তার আগে গ্রামাঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। তবু ঐদিন প্রায় বিশ হাজার কৃষক সমাবেশ কলকাতাকে চমকিত করে তোলে। তার আগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। জুলাই মাসে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভ মিছিল, জনসভা ও ট্রাম বয়কটে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যায়। সরকার সব রকমের পুলিশী ব্যবস্থা নেন। জুলাই মাসে হরতাল ও প্রতিরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে সরকার জনসাধারণের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরিণামে ময়দানের জনসভায় ঘোষিত হয় "এই আন্দোলন শুধু ট্রামভাড়া দিয়ে চলবে না, ভবিষ্যতে খাদ্য, চাকরী, আশ্রয়, শিক্ষা ও ন্যূনতম প্রয়োজনের দাবীতে এই আন্দোলন চলবে।" স্বাভাবিকভাবে এই সব সংগ্রাম ছিল শিক্ষক আন্দোলনের প্রেরণা। ১৯৫০—৫১ সাল থেকে 'সংকেত' নাটক বিভিন্ন বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ ও অন্যত্র অভিনীত হয়ে আসছিল। একটি গল্প অবলম্বনে শ্রীসলিল চৌধুরীর দেওয়া নাট্যরূপ এটি। বহুবার

পুলিশ এর অভিনয়ে মঞ্চে যেয়ে বাধা দিয়েছে। কোন সময় তার 'প্রতিধ্বনি' বা 'ইংগিত' নাম নিয়ে পুলিশকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বলা-বাহুল্য শ্রমজীবী মানুষের জীবনাদর্শে রচিত নাটকটি সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অভিনয় করলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, করুণা ব্যানার্জী ইন্দিরা কবিরাজ বীরেশ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, উমাপ্রসাদ মৈত্রের মত শিল্পীরা। মঞ্চসজ্জা করলেন সুনীল দত্ত ও সন্তোষ দত্ত। নাটকের প্রথম দৃশ্যে এক কিশোর পোস্টার লিখবে। সংলাপ "এই যা দিদি। ভুল হয়ে গেছে। গ্রে বাদ পড়ে গেছে।" তাতে কংগ্রেস কংস হয়ে গেছে। মেজভাই ঘুমুচ্ছে। পোস্টার লেখা তার কাজ। সে রাজনৈতিক কর্মী, তার পথ অনুসরণে ছোট ভাই ও বোন। তাদের বাবা শিক্ষক। তিনি এর প্রচণ্ড বিরোধী। সংসারকে সুখে রাখবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁর বিশ্বাস এইভাবে চেষ্টা করলেই বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে পারে। তিনি ছেলেমেয়েদের এই মনোভাবকে বার বার নিন্দা করেন। দিল্লী থেকে চাকুরে বড় ভাই তার বৌকে নিয়ে আসে। তারা তো ভাবতেই পারে না ছোটদের এই কর্মকাণ্ড। তা নিয়ে বিরোধ। সংঘাতের মধ্য দিয়ে দাদা বৌদি বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। একদিন মধ্যম ছোট ভাইকে নিয়ে গেল কলকাতায় মিছিলে। সে ফিরে এলো এক দারুন উত্তেজনা নিয়ে। সে বললো "মা তোমাকে একটা খবর শুনতে হবে। কিন্তু কাঁদতে পারবে না।" সে জানালো তাদের মিছিলে ছোট ভাই "পুলিশের গুলী খেয়ে মরেছে।" পরিবারে দারুন শোক। এর মধ্যে অস্ফুট-স্বরে বাবা জানালেন, "শিক্ষক ধর্মঘটের কাগজে তিনিও সই দিয়ে এসেছেন।" সমস্ত রকম বিপদ, ছাঁটাই, গ্রেফতার, অনাহার এমন কি রক্তক্ষরণের মধ্যে দাঁড়িয়েও এই দৃঢ়তা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাস্তবতা। নাটকে এর প্রকাশ ঘটেছিল। শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে এভাবেই অংশ নিয়েছিলেন।

রাজ্যের সমস্ত দৈনিক পত্রিকাগুলি অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষকদের এই তাৎপর্য-পূর্ণ সংগ্রামের বিষয়সূচী দিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারীর পৃষ্ঠাগুলি ভরে দিয়েছিল। এগুলি আসলে আগের দিনে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির বক্তব্য। শিক্ষকদের সামগ্রিক ও শোচনীয় অবস্থার বৃত্তান্ত এবং জনসমর্থনের সংবাদ। "পশ্চিমবঙ্গের দু' হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ হাজার শিক্ষক আজ বুধবার থেকে ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা এবং বোর্ড নির্ধারিত বেতনহারের দাবী করে ধর্মঘট শুরু করেছেন।" এমন শিরোনামা এক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে স্থান করেছিল। সংবাদগুলির সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় তাঁর বিবৃতিতে ৪৮ সালে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির জন্য বর্তমান বেতন হার প্রবর্তনের কথা বলেন। এ সময়ে থেকে লাগাতরভাবে সমিতি এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ এবং সরকারের কাছে দাবী করে আসছে তার বিবরণ দেন। বর্তমানে বেতনক্রম সম্পর্কে সরকারের ঘোষণা যে শিক্ষকদের দাবী-দাওয়াগুলিকে আদৌ স্পর্শ করেনি তথ্যসহকারে তিনি তার উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে "ইহাতে বুঝা যায় যে ডাঃ রায় সমস্যা সম্পর্কে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন নি।" সেদিনের প্রকাশিত প্রখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের মন্তব্য তাঁর দৃষ্টিতে এসেছিল। পত্রিকাটি তার সম্পাদকীয়তে সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষকদের দাবীদাওয়া সমর্থন করে বলেছিল "পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে ১০ই ফেব্রুয়ারী ভাগ্য পরিবর্তনের দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে।" কিন্তু তার শেষভাগে এ প্রশ্ন রেখে শেষ করে ধর্মঘট "ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারা বিরোধী—এ. বি. টি. এর এখনও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ আছে।" সত্যপ্রিয় রায় বলেন, "কর্মবিরতির বিরুদ্ধে কেহ কেহ মর্যাদার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। যে শিক্ষকদের পক্ষে জীবনধারণই কষ্টকর তাহার সম্পর্কে মর্যাদার প্রশ্ন নিরর্থক। মর্যাদার জন্য গত কয়েক বছর আমরা আমাদের ধৈর্যের

অনেক প্রমাণ দিয়াছি। পর্ষদের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য আমরা সরকারকে এক বছরের নোটিশ দিয়াছিলাম। ইহা সত্ত্বেও যদি সরকার নিষ্ক্রিয় হন, তবে অচল অবস্থার দায়িত্বও তাঁহাদের। কারণ আমরা অসম্ভব কোন দাবী করি নাই।" স্বাভাবিকভাবে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে শিক্ষকদের অনুরোধ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এক বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি বলেন, "নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনার সময় আমি সকল অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের সমিতি অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দিগকে বুধবার হইতে ধর্মঘটের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সংবাদে আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছি।" সরকার এ যাবৎ শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে যে ভূমিকা নিয়েছেন তার বিবরণ উপস্থিত করে তিনি বলেন, "প্রস্তাবিত ধর্মঘটের উদ্যোগ আয়োজন শিক্ষকদের হাত হইতে সঙ্ঘবন্ধ রাজনৈতিক দলের হাতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।" সর্বশেষে তিনি আবেদন করেন, "আমি আশা করি, দায়িত্বসম্পন্ন শিক্ষকেরা এমনভাবে কাজ করিবেন. যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের নিকট দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী উত্থাপন করিতে সমর্থ হই।" সমিতির সাধারণ সম্পাদক আন্দোলনের কর্মসূচী প্রচার করে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন সংবাদপত্রে সেটি প্রকাশিত হয়। ঐ কর্মসূচী এক নোটিশের আকার নিয়েছিল। এটি—

"শিক্ষকদের বেতন ও মহার্ঘভাতা সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, সেগুলি কার্যকরী করার জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়ের দাবী নিষ্করুণ ঔদাসীন্যে গভর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করায় আমরা অদ্য ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে কর্মবিরতি সংগ্রাম আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেছি! আন্দোলনের কর্মসূচী নিম্নরূপ—

১০ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকগণ স্কুলে উপস্থিত না হইয়া নিজ নিজ অঞ্চলে সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে শিক্ষক সমাজের দাবী সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিবেন। কলিকাতায় ২ টার সময় হাজরা পার্কে, শ্রদ্ধানন্দ ও দেশবন্ধু পার্কে জনসভা হইবে। সভার শেষে শোভাযাত্রা পরিচালিত হইবে। ১১ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ বেলা ২ টার সময় ময়দানে সমবেত হইবেন, সেখান হইতে ৩ টার সময় রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রা করা হইবে। ঐ শোভাযাত্রা সম্পূর্ণভাবে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হইবে। পুলিশ যদি গতিরোধ করে তবে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই অবস্থান চলিবে।"

ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। বিবৃতি দেন বি. পি. টি. ইউ. সি-র সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী ও রণেন সেন, ইউ. টি. ইউ. সি-র মৃণালকান্তি বসু, যতীন মিত্র, বরদা মুকুটমণি, জোনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক এমপ্লয়িজের পক্ষে অমর সাহা, হিন্দু কিষাণ পঞ্চায়েতের সম্পাদক অজিত কুমার বসু। পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সঙ্ঘের সোমেশ্বর বসু, কে. পি. চট্টোপাধ্যায় এল- এল-সি এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও বিবৃতি দেন। ঐ দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমবায়ে গঠিত সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি রাজ্যের জনগণের কাছে শিক্ষকদের সংগ্রামে আন্তরিক সমর্থন জানাবার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন করে। সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জী শিক্ষাখাতে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য সরকারের দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করে এ রাজ্যে যে শিক্ষাকে নিতান্ত অবহেলায় রাখা হয়েছে তা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের কর্মবিরতি আন্দোলন আরম্ভ থেকে "আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।" আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, একজন পুলিশ কনস্টেবলের বেতন ৮৫ টাকা, অবশ্য আজকের দিনে এটি যথেষ্ট নয়। কিন্তু

এই অবস্থার মধ্যেও একজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য সর্বনিম্ন বেতন ৭০ টাকা দাবী করা হয়, সরকার তাতেও অসম্মতি জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে সরকারী প্রচারের জবারে বলা হয় "এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করার কোন অভিপ্রায় তাদের নাই।"

১৯৫২ সালে বিধান পরিষদে শিক্ষক কেন্দ্রে ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মহীতোষ রায় চৌধুরী ও কামিনী কুমার ঘোষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উপর আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিক্ষক আন্দোলনের সপক্ষে থাকলেও তিনি মফঃস্বল শহরে থাকার জন্য তাঁর বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ হতো না। কামিনী কুমার ঘোষ সমস্যা সমাধানে আলাপ আলোচনা এবং সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসা করতে মতামত দিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায় চৌধুরীর সঙ্গে শিক্ষক সমিতিগুলির সম্বন্ধ ছিল দীর্ঘদিনের। তথাপি পাঁচ মাস আগে সরকার যখন পাঁচ টাকা মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেন তিনি তৎক্ষণাৎ বিবৃতি দেন যে সদাশয় সরকারের উপর বিশ্বাস রেখে শিক্ষক সমিতি এ প্রস্তাবে সম্মত হোক্। এ বিবৃতির জন্য তিনি নিন্দিত হন। তাঁর প্রস্তাব সমিতি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সত্ত্বেও কর্মবিরতির দিন তিনি আবার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। শিক্ষকদের কাজে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে তিনি আবেদন করলেন "তাঁদের সংগ্রামের ভার হিতৈষীদের উপর অর্পণ করে তাঁরা কাজে যোগ দিন।"

সৌভাগ্যের দিন না হোক লড়াইয়ের সর্বোৎকৃষ্ট দিন হিসাবে ১০ই ফেব্রুয়ারী ভোরবেলায় শিক্ষকেরা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হলেন। কলকাতার বহু স্কুলে প্রাতঃকালীন বিভাগ ছিল। এদিন ভোর থেকে শিক্ষকদের মিছিল শুরু হলো। প্রবীণ শিক্ষকেরাও বুকে সমিতির ব্যাজ এটে বের হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। একমাত্র দক্ষিণ কলকাতায় কয়েকশত শিক্ষক ও শতাধিক শিক্ষিকা কর্মবিরতি সফল করতে সক্রিয় কর্মী হিসাবে এগিয়ে এসেছেন। সংগঠনের ফেস্টুন হাতে যাদবপুরের বৃদ্ধ পণ্ডিত মিছিলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কলাকাতার এমন মিছিলের পুরোভাগে আছেন ৭০ বছরের বয়স্ক শিক্ষক রামাশীষ মিশ্র। শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও খিদিরপুর একাডেমীর প্রবীণ প্রধান শিক্ষক আরও সব স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। অন্যদিকে শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটির ব্যাজ বুকে এঁটে ছাত্ররা বের হয়ে পড়েছে। সারা কলকাতা শিক্ষক ও ছাত্রের দাবীতে এক হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ শিক্ষকদের বুকে ব্যাজ, হাতে ফেস্টুন আর মিছিল দেখে পাড়ায় পাড়ায় চাঞ্চল্য। বাড়ীর কোণ থেকে কাতারে কাতারে নরনারী রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে এঁরা শিক্ষক সংগ্রাম তহবিলে অর্থ সাহায্যের আবেদন করছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুপন বিক্রি হচ্ছে। একটা পবিত্র কাজে যেন সবাই লিপ্ত হয়ে পড়েছে। লক্ষ্য ১৩০টা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি সফল করানো। ৩০টি বিদ্যালয়কে ধর্মঘটের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ছিল। আশ্চর্যজনক সাড়া পাওয়া গেল। শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটির আবেদনে স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট করলো। অনেকগুলি স্কুলে কর্মবিরতির পরিপ্রেক্ষিতে তিন চার দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। সকাল থেকেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সামনে পিকেটিং চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছুই করতে হয়নি। কারণ কোন জায়গাতেই শতকরা ২৫ জনের বেশী ছাত্র অথবা শিক্ষক হাজির হননি। শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া বহু সংখ্যক স্ত্রী পুরুষকে স্কুলের দরজায় ব্যাজ পরে পিকেটিং করতে দেখা যায়। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বইপত্র নিয়ে স্কুলের সামনে এসেছিল। কিন্তু পিকেটারদের কথা শুনে তারা বাড়ী চলে যায়। অধিকসংখ্যক শিক্ষক নিজেদের স্কুলের ধারে

পাশেও আসেন নি। প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা ও সবাই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারী স্কুলগুলিতে জোর পিকেটিং চলে। স্কুলগুলির গেটে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কতকগুলি স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কাজ অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেন। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্কুলের সামনে গোলমাল হয়। রামাশীষ মিশ্র আক্রান্ত হন। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় জুতা দিয়ে প্রহৃত হন। সেখানে ইট ও ধুলা নিক্ষিপ্ত হয়। তালতলা গার্লস স্কুলের সম্পাদক প্রধান শিক্ষিকাকে অপমান করেন। বহুবাজার মেট্রোপলিটন স্কুলের সম্পাদক নিজে বেশ কিছু বলিষ্ঠ লোক নিয়ে ধর্মঘট বন্ধ করতে আসেন। বেথুন স্কুলের সামনে জোর পিকেটিং চলে। মেয়েরা এখানে পিকেটিং করে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। উইমেন্স কলেজের সামনে পিকেটিং করবার সময় তিনজন ছাত্র ও তিনজন ছাত্রী গ্রেফতার হন। উত্তেজনা প্রচণ্ডভাবে দেখা যায়। ঘন ঘন ধ্বনিতে চারিদিকে মুখরিত হলে কলেজের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওদিকে আটক ছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়তে থাকেন। তারা বন্দিনী হয়েছে বলে চিৎকার শুরু করে। উত্তেজিত কয়েকজন ছাত্র ফটক পার হয়ে তাদের উদ্ধারে অগ্রসর হয়। কলেজ গেট ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঘটনা আয়ত্তে আনতে অমর বসু ও ডাঃ নারায়ণ রায় ছুটে আসেন। ছাত্রীরা কলেজ থেকে বের হয়ে পড়ে। গোলোকপতি রায় উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়ে এক দুরূহ কাজ সম্ভব করে তোলেন। সে স্কুলে ধর্মঘট হবে কি না এ নিয়ে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি ও উত্তেজনা চলছিল। ছাত্ররা সেখানে প্রচণ্ড ভীড় করেছিল। শ্রীযুক্ত রায় চরম গোলমালের মধ্যে একটা উঁচু জায়গায় উঠে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, "আই ডিক্লিয়ার ইউ—হলি ডে"। ছুটি পাবার আনন্দে হিড় হিড় করে সব ছাত্র স্কুল থেকে বের হয়ে এলো। শিক্ষকদের ক্লাস করা হলো না।

শহরতলীর সব এলাকা থেকে কর্মবিরতি সফল হবার সংবাদ পাওয়া গেল। টালিগঞ্জ, বেহালা, বরাহনগর, কাশীপুরের সমস্ত স্কুলে ধর্মঘট হয়েছিল। দমদম, বাগুইআটির আটটি স্কুলের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেলঘরিয়া, পানিহাটি, সোদপুর, আগরপাড়া, ব্যারাকপুর, তালপুকুরের সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। এইসব জায়গায় আশেপাশের মফঃস্বলে ছিল একই অবস্থা—সব বন্ধ। খড়দহ এলাকার ৬০টি স্কুলের মধ্যে ৫৫টি ছিল সমিতি সদস্য। তা সত্ত্বেও ভোর থেকেই শিক্ষক সমিতির সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, আর. এস. পি. প্রভৃতি দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা স্কুলগুলির সম্মুখে উপস্থিত হন। ধর্মঘট সর্বত্র সফল হয়। নৈহাটী, ভাটপাড়ার সব স্কুলের দরজা ছিল বন্ধ। ইছাপুর ও শ্যামনগরের অনেক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি হয়। ডায়মণ্ডহারবার শহরে কর্মবিরতি সফল হয়। শিক্ষকছাত্রদের দীর্ঘ মিছিল পথ পরিক্রমা করে দেওয়ানী আদালত প্রাঙ্গণে এসে সভা করে। বজবজ, মহেশতলার কোন বিদ্যালয়ে সেদিন কাজ হয়নি। হাবড়ার স্কুলগুলির শিক্ষকেরা ধর্মঘটে সামিল হন এবং প্রতিদিন মিছিলের সূচনা করেন। জয়নগর-মজিলপুর এলাকার শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করেন। সোনারপুরে সমস্ত স্কুলে ধর্মঘট হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলিতভাবে সভা করে। বনগাঁতে ১২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা ধর্মঘট করে। সেখানে পাঁচশত ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। হাওড়া থেকে ধর্মঘট সফল হবার সংবাদ আসে। উত্তর হাওড়ার ছাত্র ব্লকের কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় শিক্ষকদের সঙ্গে সত্যাগ্রহে যোগ দেন। বালীতে ধর্মঘট হয়। বাগনান এলাকায় দুটি বালিকা বিদ্যালয় সহ বারোটি বিদ্যালয়ে ধর্মঘট হয়। বিকেলে ঐ শহরে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়। চার পাঁচ মাইল দূর থেকে ছাত্ররা মিছিল করে এসে ঐ সভায় যোগ দেয়। হাওড়ায় সালকিয়া থেকে রিষড়া পর্যন্ত সমস্ত স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চুঁচুড়ার কোন স্কুলের দরজা খোলা পাওয়া যায়নি। চুঁচুড়া ময়দানে বলাইচাঁদ

চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। তার পরদিনও শ্রীরামপুরে ছাত্রশিক্ষকদের বিরাট মিছিল বের হয়। মেদিনীপুর শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম এদিন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। খড়গপুরের দশটি বিদ্যালয়ের মধ্যে চারটিতে ছুটি ঘোষিত ছিল। বাকী স্কুলগুলিতে ধর্মঘট হয়। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বের হয়। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে পাঁচশত ছাত্র তাতে যোগ দেয়। সেখানকার মফঃস্বল এলাকায় ধর্মঘট সফল হয়। তমলুক মহকুমার সর্বত্র ধর্মঘট হয়। ঝাড়গ্রামের বে-সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত মিছিল বের হয়। প্রাথমিক শিক্ষকেরা বিপুল সংখ্যায় এতে যোগ দেন। মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। বাঁকুড়া জেলার শহর ও গ্রামের প্রায় সব স্কুলে শিক্ষকেরা ধর্মঘট করলেন। দূরবর্তী গ্রামের স্কুলেও অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যায়। সদর শহরের কতকগুলি স্কুলের সামনে পুলিশ মোতায়েন থাকে। মহকুমা শাসক ও পুলিশ সুপার স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। তবে অবস্থা সর্বত্র শান্ত ছিল। বর্ধমান শহর ও আশেপাশের ২৬টি স্কুলে আগে থেকেই ছুটি দেওয়া ছিল। বাকী ৩৮টি স্কুলে ধর্মঘট সফল হয়। অন্যান্য শহর এলাকাগুলিতেও কর্মবিরতি সফল হলো। আসানসোলে পনেরোটি স্কুলে কোনটিতে কাজ হয় না। ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুলও ধর্মঘটে সাড়া দেয়। মহকুমার অন্যান্য স্থানে একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। কালনা শহরের চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি সম্পূর্ণ সফল হয়। ছাত্র-শিক্ষকেরা বড় বড় রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করেন। গ্রামাঞ্চলেও কর্মবিরতি সম্পূর্ণ সফল হয়। কাটোয়ায় তিনটি স্কুল ও মফঃস্বলের সব স্কুল ধর্মঘটে যোগ দেয়। মেমারী, গলসী, রায়না, আদ্রাহাটি, পেটুকি কর্না, শ্রীবাটি, পূর্বস্থলী, নাদনঘাট প্রভৃতি জায়গা থেকে ধর্মঘট সফল হবার সংবাদ পৃথকভাবে পাওয়া যায়। বীরভূম জেলার প্রায় সব স্কুলই কর্মবিরতিতে বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণনগরে ধর্মঘট হয় সব স্কুলে। কলেজের শিক্ষকেরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করেন। নবদ্বীপ ও বেথুয়াডহরীতেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রানাঘাট, আড়ংঘাটা, শান্তিপুর, বগুলা সব জায়গাতেই কর্মবিরতি পালিত হয়। আর ঐ সব জায়গায় বিকেলে সভা হয়। চাকদহে রামলাল একাডেমীতে কর্মবিরতি হয়। ঐ স্কুলের বালিকা বিভাগের সম্পাদক ধর্মঘটবিরোধী মনোভাব নিলে অন্যান্য মেম্বাররা তাকে প্রতিহত করেন। পশ্চিম দিনাজপুরে বালুরঘাটে ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। বালুরঘাট হাই স্কুলের পরিচালন কমিটি প্রকাশ্যে শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ছাত্র ও জনসাধারণও সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বিকেলে এঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে মিছিলে মিলিত হন। রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জের বালক-বালিকাদের স্কুলগুলিতে কর্মবিরতি পালিত হয়। শিক্ষক-ছাত্রদের মিলিত মিছিল রায়গঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। জলপাইগুড়ি থেকে ধর্মঘট পুরো সফল হবার সংবাদ পাওয়া যায়। সেখানকার অগণিত মানুষ, ক্লাব, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। শহরের নয়টি স্কুলে পূর্ণ কর্মবিরতি হয়। দু'শত শিক্ষকসহ পাঁচ হাজারের বেশী ছাত্র মিছিল বের করে। মিছিলে ৬০ বছরের অনেক বৃদ্ধ শিক্ষক যোগ দেন। মালদহের ইংরেজবাজার ও মফঃস্বলের অধিকাংশ স্কুলে ধর্মঘট হয়। বার্লো স্কুলের ছাত্রীরা ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বের করে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ধর্মঘট সফল হয়। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে যে মিছিল হয়েছিল তার সংবাদ পাওয়া যায়। কোচবিহার থেকে খবর আসে সেখানকার সব স্কুলের কাজ সেদিন স্তব্ধ হয়েছিল। বিকেলে কোচবিহার শহরে জনসভা হয়। শিলিগুড়ি হাই স্কুলের পরিচালন কমিটি ধর্মঘটের প্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা করেন। অন্যান্য স্কুলে ধর্মঘট পালিত হয়।

কর্মবিরতির প্রথম দিবসে বিকালে সাংবাদিকেরা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায়ের কাছে গেলেন। তিনি জানালেন কলকাতার ১৬০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩০টি বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পূর্ণ কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে ৪০টি বিদ্যালয়ে আগে থেকেই ছুটি দেওয়া হয়েছিল। আর কলকাতার ৩০টি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষকেরা ভাল বেতন পান। তা সত্ত্বেও কতকগুলি স্কুল এমনকি কতকগুলি মিশনারী স্কুলও এ দিন বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের কাছে সংবাদ এসেছে শহরতলীতে ও বিভিন্ন জেলায় কর্মবিরতি সফল হয়েছে! শ্রীযুক্ত রায় জানান পাঁচশত শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে মাত্র পাঁচ-ছয়টি ক্ষেত্রে স্কুলে পিকেটিং করতে হয়েছে। ঐ দিন বিকেলে কলকাতায় তিনটি স্থানে জনসভা হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় নিতানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সত্যপ্রিয় রায় জানান আন্দোলন উপলক্ষ্যে ১৬ জন সত্যাগ্রহী গ্রেফতার হয়েছেন। দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় রমনীমোহন বসু সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সমিতির সম্পাদক মদনমোহন চক্রবর্তী, মৃন্ময় বাগচী, অধ্যাপক মোহিত মৈত্র। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রাঙ্গণেও বড় সভা হয়। ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। সভাগুলি শেষ হলে মিছিল বের হয়। সন্ধ্যায় সত্যপ্রিয় রায় কর্মবিরতির সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ এবং জনসাধারণ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে আশ্চর্যজনকভাবে সাড়া দিয়েছেন। এদিন যে সংগ্রাম আরম্ভ হলো তার পূর্ণ পরিণতি হতে পারে পরের দিন বৃহস্পতিবার। তিনি অনুরোধ জানান সেদিন শিক্ষকদের দাবী আদায়ের জন্য হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্র সরকারী দপ্তর ভবন অভিমুখে যেন অভিযানে অংশ নেন। শিক্ষক আন্দোলন রাজনৈতিক চাল—মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ডাঃ রায় আসল সমস্যা এড়াইয়া শিক্ষক ধর্মঘটের পিছনে রাজনৈতিক উস্কানীর কথা বলিয়াছেন। শিক্ষকগণের পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ অপমানকর এবং সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের দাবী সর্বতোভাবে শিক্ষার দাবী। ডাঃ রায় ভালভাবেই জানেন, আমরা সুদীর্ঘকাল ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিয়াছি। ....তাঁহার সরকারের সুপরিকল্পিত ঔদাসীন্যই আমাদের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।" সাংবাদিকেরা ধর্মঘট সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়া জানবার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে সরকারী মুখপাত্রেরা মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, বুধবার সকালে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে পিকেটিং করা হয়। কিন্তু তাতে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে কোন বিঘ্ন হয়নি।

১১ই ফেব্রুয়ারী কর্মবিরতির আরও প্রসার হয়। ঐদিন করপোরেশনের সভায় শিক্ষক ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সভা আরম্ভ হলে আলোচ্য বিষয় স্থগিত রেখে এই প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য সংযুক্ত নাগরিক সমিতির পৌর সদস্যেরা সভায় দাবী তোলেন। অনেক বাদানুবাদের পর এই প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। মেয়র ডাঃ নরেশ নাথ মুখার্জী বলেন এই ব্যাপারে সরকার অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা শিক্ষক সমিতির কঠিন মনোভাবের জন্য অগ্রসর হতে পারেনি। তিনি বলেন, "বস্তুতঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে সুপারিশ করেছে তা থেকে ডাঃ রায় বেশীই দিয়েছেন।" বিরোধী সদস্যেরা "কখনই নয়" বলে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দেন। অনিল মৈত্র শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ১৬—২৪ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। উল্লেখ্য দু'জন কংগ্রেস সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন।

পূর্বদিনের মত কলকাতার প্রাতঃকালীন ও দিবা বিভাগের সমস্ত স্কুলগুলি এদিনের কর্ম-বিরতিতে অংশ নেয়। মধ্য কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি স্কুলের সামনে গোলমাল হয়। বিদ্যালয়ের সম্মুখে গতদিনের মত সর্বত্র পিকেটিং অব্যাহত ছিল। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর

এক স্কুলের সামনে এক ঘটনায় দু'জন শিক্ষক ও চারজন ছাত্র আহত হন। সিঁথি দমদমে এক স্কুলের সামনে আর একজন শিক্ষক আহত হন। ধর্মঘটের আরও প্রসার ঘটে। এদিন সরকারী স্কুলগুলি যেমন হেয়ার স্কুল, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল এমন কি ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলেও ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলেও সেদিন ধর্মঘট হলো। কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। স্কটিশ চার্চ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ল কলেজ, ভিক্টোরিয়া, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজ, বেথুন কলেজ, সেন্টপলস্, লেডী বেব্রোর্ন (প্রাতঃ + দিবা) কলেজ, আশুতোষ, মুরলীধর গার্লস কলেজ, জয়পুরিয়া, সিটি কলেজ, চারুচন্দ্র কলেজ ছাত্র সংগ্রামের অগ্রণী ভূমিকায় এসে পড়লো। বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্র সভা হলো। আগামীকালের শিক্ষক আন্দোলনের কর্মসূচীতে ব্যাপকভাবে ছাত্ররা অংশ নেবে বলে সংকল্প নেওয়া হলো। শিক্ষক আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা তখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এর চাইতে আশাতীত বলে তাঁদের কাছে আর কিছু থাকতে পারে না বলে ভাবছেন। বিশেষতঃ জনজাগরণে তাঁরা বিমোহিত। এক বিশাল শক্তিকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। এ যেন তাঁদের নিজেদের শক্তি। এই মানসিকতাকে শিক্ষকেরা সেই মুহূর্তে ভাষা দিলেন—

"তাই বুঝি এ জীবনে জ্বলন্ত বিদ্রোহ
হুংকারি উঠিছে দৃপ্ত প্রাণ চেতনায়?
তাই কি অতন্দ্র জাগি লক্ষ কামনায়?
আজিকার জয়োল্লাস কোথা রাখি কহো?
অনেক লাঞ্ছনা আর দীনতার শেষে
মৃতপ্রায় সত্তা মোর জাগে সুপ্ত দেশে।"

আট

অবস্থান শিবির

১৯৫৪-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিন। সেদিন মহাকরণের উদ্দেশ্যে বিশাল শোভাযাত্রার সূচনা হয় বেলা ২ টায়। এর দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল। শিক্ষকদের সঙ্গে সমবেত হয়েছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ছাত্ররা এসেছিল কাতারে কাতারে। পূর্বে খ্যাত অক্টর-লোনী মনুমেন্ট বর্তমান শহীদ মিনারের নীচে অনুষ্ঠিত সমাবেশ নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়েছিল। ঐ বিশাল জমায়েতের মাইক ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। কিন্তু সমাবেশ পরিচালনার কোন বিঘ্ন দেখা যায়নি। কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী থেকে অসংখ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এসেছিলেন। বাঁকুড়া, বীরভূম আর মেদিনীপুরের শিক্ষকেরাও এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে পৌঁছবার আগে শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বে-সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়। সেখান থেকে মিছিল করে শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে ময়দানে পৌঁছায়। বেলা পৌনে তিনটের সময় "শিক্ষক সংগ্রাম" ব্যাজ পরিহিত কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তাঁদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিশাল ফেস্টুন সামনে নিয়ে ময়দান থেকে বের হয়ে পড়ে। সুশৃঙ্খল এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, শৈলেন ব্যানার্জী বামনদাস মণ্ডল এবং শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী। শিক্ষকদের দাবী মানতে হবে, বোর্ডের সুপারিশ মানতে হবে, ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা দিতে হবে, পুলিশী জুলুম চলবে না, শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে এলাকাটি মুখরিত হয়ে উঠলো। জন-সমুদ্রের আকার দেখে লোকজন স্তব্ধ। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পেছনে এত মানুষ কস্মিনকালে কেউ ভাবতে পারেনি। যোগদানকারী শিক্ষকদের চেহারা চরিত্রে ব্যক্তিত্বের ছাপ। অনেকেই বয়সের ভারে ও সাজ পোশাকেই শ্রদ্ধেয়। তাঁদের নৈতিকতা অপরিচিত নয়। সাধারণ অবস্থার ঊর্ধ্বে থাকা এ সমাজ নিজেদের সামান্য দাবী আদায় করতে কঠিন লড়াইয়ে নেমেছেন। মনে হলো কেন বিশাল প্রস্তরশীলার অর্ধেক যেন ভেঙে গড়িয়ে আসছে। সরকারী ঔদাসিন্যকে তারা নিন্দা করে ধ্বনি তুলছেন "শেম, শেম"। শোভাযাত্রা চৌরঙ্গী পার হয়ে এসপ্লেনেড ইস্ট ঘুরে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে এসে পৌঁছল। ডালহৌসী স্কোয়ারে আগে থেকেই ১৪৪ ধারা প্রয়োগ ছিল। আইন যাতে ভাঙা না হয় সেজন্য লাঠিধারী পুলিশ মোতায়েন ছিল। কার্জন পার্কে ঘোড়সওয়ার পুলিশ জমা হয়েছিল। ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে শোভাযাত্রীরা পুলিশের মুখোমুখি হলেন। দু' হাতের ব্যবধানে দু' সারির পুলিশ সমান্তরাল বেষ্টনী রচনা করে। প্রবল উত্তেজনার মুখোমুখি হয়ে নিজেদের দাবীকে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে পুলিশের বাধা পেতেই তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় বসে পড়লেন। ঠিক সে মুহূর্তে গণ-অন্দোলনের এক অভূতপূর্ব অধ্যায় অবস্থান আন্দোলনের সুস্পষ্ট রূপ জন্ম পরিগ্রহ করলো। প্রবল সম্মুখ সমর ঘটতে যাচ্ছে; এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন কয়েক দিন আগে থেকেই। অনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখেছিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে এটি প্রকাশ পেয়েছিল। কবিতায় শিক্ষকদের অবথা ও মানসিকতার সম্পূর্ণ ভবিষ্যত বাণী উচ্চারিত হয়—

চির উপবাসী দ্রোণাচার্যেরা রাজ শিষ্যের কাছে
দাবী করে আজ গুরু দক্ষিণা, দিতে হবে, হবে দিতে।
বাতাসের আগে খবর ছড়ালো কাঁপে ভীরু বঞ্চনা
শুধু পুঁথিগুলো সব ছাই হোক ওই ক্ষুধার দাবাগ্নিতে।
কথার ফানুস ফেঁসে গেল তাই চারিদিকে কলেবর
দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের রঙে পড়েছে ইস্তাহার।
টলমল করে সারা কোলকাতা দূর দূর জনপদ
লাখো আশ্রমে লেগেছে আগুন খণ্ডিত বাংলার।
হাজার দ্রোণের সাথে সাথে এই বঞ্চিত দধীচিরা
মিছিলে মিছিলে নিয়েছে শপথ ফিরবে না ভয়ে কেউ।
মন্থিত হবে মহাসমুদ্র উদ্বেগে বুক কাঁপে।
একটি প্রশ্ন, "কখন আসবে নবজীবনের ঢেউ।"
অভাবে ক্ষুব্ধ অগণিত চোখে নিদারুণ ঘৃণা জাগে
যক্ষ্মা জীবাণু কুরেছে যে বুকে সে বুকের ধুকধুকি
শেষ লড়ায়ের মহান লগ্নে প্রস্তুত হয়ে আজ
রাজপথে ওই দাঁড়িয়েছে এসে শ্বাপদের মুখোমুখি।

লড়াই অনভ্যস্ত স্বভাবশান্ত শিক্ষকেরা ন্যায্য দাবীতে অগ্রসর সামান্য দাবীটুকু জানাতেও বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই ক্ষোভ ও উত্তেজনার মুখোমুখি হয়ে তাদের ধৈর্যের অস্বাভাবিক প্রশংসা নিতে পারলেন। নিজেদের দুঃখজনক অবস্থার কাহিনী বিবৃত করে একের পর এক বক্তা আন্দোলনের যৌক্তিকতা উপস্থিত করলেন। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে খালি গলায় সে বক্তব্য সর্বত্র না পৌঁছলেও তার তাৎপর্য সকলে ধরতে পারলেন। নেতৃবৃন্দের হুঁসিয়ারী মান্য করতে সব রকমের প্ররোচনা পরিহার করতে ঐ বিশাল জমায়েত অদ্ভুতভাবে অতি অল্প-কালের মধ্যে সুশৃংখল হয়ে উঠলো। পুলিশ পক্ষ যাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি না করে সে জন্য এক প্রবীণ শিক্ষক তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, তারাও শিক্ষকদের হাতে তৈরী ছাত্র। বাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন তারা যেন শান্তি ভংগ না করে। সওয়া পাঁচটায় চারি দিক থেকে মানুষ ছুটে এলো। অফিস ফেরত মানুষেরা জমায়েতে যোগ দিলেন। অবস্থানকারীরা তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত পোস্টারগুলি ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন। এর মধ্যে বহু চিত্রিত পোস্টার ছিল। বিশেষতঃ সরকারী উপেক্ষাকে নিন্দা করে বেশ কিছু ব্যংগচিত্র সহ বক্তব্য লিখিত ছিল। বানের গতিতে আসা উচ্ছল এই জনতাকে নিয়ে পুলিশের হিমশিম খাওয়া অবস্থা। অনেকের সংগে তারা দুর্ব্যবহার করছিল। আর অবস্থানকারীর এইসব কাজে আপত্তি জানাচ্ছিলেন। ওয়াটারলু স্ট্রীট ও ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের জংশনে প্রচণ্ড ভীড়। পুলিশ সেখানে বাধা দিচ্ছেন অফিস ফেরতা মানুষদের। তারাও পুলিশদের বোঝাচ্ছেন ওয়াটারলু স্ট্রীটে প্রচণ্ড ভীড়, তাদেরকে রাজ-ভবনের পূর্ব প্রান্তের ফুটপাত দিয়ে ময়দানের দিকে যেতে দেওয়া হোক। পুলিশ কয়েকশত লোককে যাবার অনুমতি দিল। কিন্তু একটু এগিয়ে তারা ময়দানে না যেয়ে সমাবেশে পৌঁছে চিৎকার শুরু করলেন, শিক্ষকেরা যে ধ্বনি দিচ্ছে তাতে যুক্ত হলেন। সাড়ে পাঁচটার একটু পরে সন্ধ্যা নেমে এলো। সওয়া ছয়টা পর্যন্ত এই বিপুল বিশাল জমায়েত তাদের অন্তরের সমর্থনে শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি প্রকাশ করে এক অদ্ভুত ইতিহাস রচনা করেছিল। সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মুখার্জী, সত্যপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও অন্যানেরা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি তৈরী করলেন। তাতে লেখা হলো "জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা দাবী করি অনতিবিলম্বে

পথের উপর থাকা শিক্ষকদের কাছে আপনি মীমাংসায় আসুন অথবা আপনার সংগে আলোচনার জন্য রাইটার্সে তাঁদের যেতে দিন।"

শিক্ষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সদস্যেরা বক্তৃতা দিচ্ছেন। প্রতি বক্তৃতার পর প্রবল ধ্বনিতে আকাশবাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে, চিত্র সাংবাদিকেরা বার বার ফটো তুলছেন। তার সংগে ঘুরে ঘুরে বিক্ষোভের ফটো সংগ্রহ করছিল জনৈক পুলিশ সাব ইনসপেক্টর এবং সরকারের প্রচার বিভাগের জনৈক ফটোগ্রাফার, যেন এরাও সাংবাদিক। পুলিশের এ ধরনের কাজ এর আগে কোনদিন করা হয়নি। সমাবেশে প্রচুর ছাত্র যোগ দিয়েছিল। আর মোট জমায়েতের একাংশ ছিল মহিলাদের যা চোখে পড়বার মতো। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে এ দিনের জমায়েতের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছে। কেউ একে দশ হাজারের জমায়েত। কেউ বলেছেন সাত হাজার। বাংলার বাইরের বিভিন্ন মহানগর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে কেবলমাত্র দু' হাজার শিক্ষক এই সমাবেশে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছিল। রাত্রি সাড়ে আটটায় এদের সংখ্যা সাড়ে ছয়শত ছিল বলে এক সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন রাত্রি দেড়টার পর এই সংখ্যার সামান্য পরিবর্তন হয়। শিক্ষকেরা ভাবতে পারেননি এই ভাবে সারা রাত্রি তাঁদের ডালহৌসী স্কোয়ারের রাজপথে থেকে যেতে হবে। বনেদী পাড়ার সব ঘরবাড়ীর দরজা একে একে সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়েছে। রাজভবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ আর তখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আলো বলতে ডজন খানেক রাস্তার গ্যাসের বাতি। এই পরিবেশে মহিলারা অবস্থানের পূর্বপাশে পৃথক স্থান করে নিলেন। উত্তেজনার পর প্রচণ্ড ক্লান্তি নেমে এসেছে। তাঁরা বাড়ী ফিরে যাবেন না, এটা নিশ্চিত। তাই কেউ পোস্টার কিংবা কাগজ বিছিয়ে রাজপথে শুয়ে পড়লেন। যাঁরা এগুলি পেলেন না তাঁরা তাঁদের শীতের চাদর বিছিয়ে দিলেন নিতান্ত একটু গা এলিয়ে দেবার জন্য গায়ে নিলেন কোচার খুট। মাঘ মাসের শেষভাগে। উপর থেকে প্রচণ্ড হিমপাত হচ্ছে। সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে অসম্ভব দৃঢ়তা নিয়ে নেতাদের সাথে তারা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। একাংশ যখন নিশান্ত অন্ধকার এইভাবে রয়েছেন অপর অংশ সমবেত সংগীত মৃদু অথচ দীপ্তভাবে গেয়ে চলেছেন। তারা গাইছেন—

আমরা জেনেছি মিত্র, শত্রু চিনেছি,
জেনেছি তাদের ভয়,
আর জেনেছি এবার মোদের সবার
মৃত্যু হবার নয়।
তাই ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ নয় এই চলা—
আজ শংকাহীন, মৃত্যুহীন এই চলা।

ডালহৌসী পাড়া নিঝুম। কয়েকশত আন্দোলনকারীর এ রাত্রি যাপনের সাক্ষী ১৮ জন পুলিশ কনস্টেবল, কয়েকজন পুলিশ অফিসার আর কয়েকটা পুলিশের গাড়ী। কিন্তু ঐ নিশুতি রাতে প্রচণ্ড উৎসাহের সংগে বার বার গেয়ে চললেন—

তাই—গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরী হও।
কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধারে তৈরী হও।
কার বাছার জোটেনি দুধ শুকনো মুখ তৈরী হও।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও জোট বাধ
মাঠে কিষাণ, কলে মজুর নওজোয়ান, তৈরী হও।
এই মিছিল—সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল।
এই মিছিল ক্ষুদিরামের রক্তবীজ এই মিছিল—

প্রতিভা আর যশোদা মার চোখের জল এই মিছিল
শিশু হারা মাতাপিতার অভিশাপের এই মিছিল
এই মিছিল—সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল।
হও সামিল—হও সামিল—হও সামিল।

জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতায় দীর্ঘস্থায়ী শীতের রাত্রির অবসান ঘটলো। ভোরের আলোয় জেগে উঠলেন মাস্টারমশায়রা। তাঁদের সঙ্গে ছিল ছাত্ররা। তারাও বাড়ী যেতো। কিন্তু মাস্টারমশায়রা যেখানে থাকলেন তারা সেখানে রয়ে গিয়েছিল। আবার নীল আকাশের নীচে স্লোগান উঠলো। বয়স্ক শিক্ষকদের মুখমণ্ডলীতে রাতের অনিদ্রার ছাপ। অনেকে তো গরম কাপড় কিছু আনেন নি। হিম তাঁদের একেবারে অবশ করে দিয়েছিল। অনেকের গলা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁরাও স্লোগানে যোগ দিলেন। ভাঙা গলাটা ঠিক করে নিতে তাল দিতে শুরু করলেন। কনিষ্ঠেরা বয়স্ক শিক্ষকদের তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। মফস্বল থেকে আরও কিছু যোগদানকারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এসে পড়লেন। এইভাবে ১২ই ফেব্রুয়ারীর সকাল শুরু হলো।

সেদিন ছিল হরতালের দিন। শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে হরতাল আহূত হয়েছিল। শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে, সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় হরতাল আংশিতভাবে পালিত হয়। হাওড়াতেও একই অবস্থা ছিল। তবে ধর্মঘটের তৃতীয়দিনে প্রথম দু-দিনের মত স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশে যোগ দেয়নি। সংবাদসংস্থা পি-টি-আই-এর সংবাদে জানা যায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনের মফস্বল সদর শহরগুলির দোকানপাট, হাটবাজার বন্ধ ছিল। বিশেষভাবে বর্ধমান, মালদহ, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, নবদ্বীপ শহরে বন্ধের সংবাদ সেদিন এরাই পরিবেশন করেছিলেন। অন্যান্য সংবাদ অনুযায়ী মেদিনীপুর, খড়গপুর, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বনগাঁ, দমদম, বজবজ, পানিহাটী, খড়দহ, বসিরহাট, কালনা আসানসোল, কাটোয়া, উলুবেড়িয়া, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, সিউড়ী, চন্দননগর, আরামবাগ, তারকেশ্বর, রিষড়া শেওড়াফুলী, কোন্নগর, রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহরে সফল ধর্মঘট হয়েছিল বলে জানা যায়। বর্ধমান শহরে বিকেলে কালীতলা মাঠে মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাতে সুবোধ চৌধুরী ও দাশরথি তা বক্তৃতা দেন। জলপাইগুড়ি শহরের সব দোকানপাট, চা সংস্থান ও সদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। বাঁকুড়া শহরে বন্ধ উপলক্ষে এক সভা হয়। স্থানীয় শ্রমিকদের যোগদান একে আকর্ষণীয় করে তোলে। কানাইলাল দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় রাখহরি চ্যাটার্জী ও তারাপদ সিকদার ভাষণ দেন। সেদিন কৃষ্ণনগর টাউন হলের সভায় সুধীর চন্দ্র মল্লিক ও বীরেন্দ্র নাথ আচার্য বক্তব্য রাখেন। চুঁচুড়ায় বন্ধ উপলক্ষে এক ছাত্র গ্রেফতার হন। বেলঘরিয়ায় সামান্য সংঘর্ষ হয়। মেদিনীপুরে শুধু দোকানপাট নয় যানবাহন চলাচলও ছিল বন্ধ। খড়গপুরের পাঁচটি বাজারের মধ্যে চারটিই বন্ধ ছিল। নদীয়ার আধা-শহর এলাকায়ও বন্ধ সফল হয়। রাজ্যের মফস্বল এলাকার কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে ২৪ পরগণার হাড়োয়া, বর্ধমানের পূর্বস্থলী মেদিনীপুরের খাপুত ও পটাশপুর, বাঁকুড়ার বালিয়াতোড় প্রভৃতি স্থানের খবর আসে। মালদহ জেলার গাজোল এবং পশ্চিম দিনাজপুর-এর কালিয়াগঞ্জে বন্ধ উপলক্ষে জনসভা হয়। ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় ডোমজুড়ে। সেখানে বাজার বন্ধ নয় কৃষকেরা কৃষিকাজও বন্ধ করে। বিকেলে কলকাতা ময়দানে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আর সি-পি-আই-এর শান্তিলাল গুপ্তের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন রমেন দে (বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স), অমল রায় (আর. এস. পি.), অজিত সেন, জ্যোতিষ জোয়ারদার (এস. আর. পি.), বিশ্বনাথ মুখার্জী

(কমিউনিস্ট পার্টি), অধ্যাপক মণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এবং সুবোধ ব্যানার্জী। সভায় শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবীকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় এবং এই সরকারী ঔদাসিন্যকে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সভা শেষে বিশাল মিছিল অবস্থানকারী শিক্ষকদের কাছে পৌঁছায়। ঐ দিন করপোরেশনের কাউন্সিলার সভায় শিক্ষকদের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার অনুমতি চেয়ে বিরোধীরা মুলতুবী আলোচনার প্রস্তাব তোলেন। তা ভোটে অগ্রাহ্য হলে একযোগে তাঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

১৯৪৫ সালের আগে একবার মাত্র অবস্থান আন্দোলন হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার কেন্দ্র করে বিক্ষোভ মিছিল সারা রাত্রি ধর্মতলা স্ট্রীট দখল করেছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরা অবস্থানের আর নতুন ঐতিহ্য তৈরী করলেন একে লাগাতর করে। বেলা ২টায় রাজভবনের গাছগুলির ছায়ায় বিপুল জনসমাবেশেও প্রচণ্ড উৎসাহের সূচনা হলো। তার আগে পালা করে শিক্ষকেরা স্লোগান দিয়েছেন। এক এক অংশ একটু ছায়ায় যেয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। কারণ সেদিনের তাপদাহ ছিল প্রচণ্ড। সর্বোচ্চ ৯৪ এবং সর্বনিম্ন ৬৪ ডিগ্রী, স্বাভাবিকতার চাইতে ৭ ও ৮ ডিগ্রী বেশী। তাঁদের এই অসহ্য কষ্টের সাক্ষী হয়েছিলেন কিছু জনসাধারণ। তাঁরা এখন নীরব হয়ে রইলেন না, আনলেন ক্যানভাসের চট, বাঁশ এবং খুঁটী। রাজপথে গড়ে উঠলো ছাউনী। বসবারও কিছু বন্দোবস্ত হলো। শুধু তাই নয়। এলো তাঁদের ক্ষুধার আহার। কেউ হাতে করে নিয়ে এলেন, কেউ বা কুলির মাথায় করে। রাজপথে পংতি-ভোজনে বসলেন অবস্থানকারীরা। এলো পান বিক্রেতারা বিড়ি সিগারেট পান নিয়ে। সকাল থেকে চা বিক্রির জন্য ছেলেরা আসছিল। পুলিশের ক্লান্তিও তাতে দূর হলো। ডালহৌসী এলাকার প্রায় একশত সদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, ছাত্রাবাসগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা দিলেন রুটি, লুচি, মিঠাই, কমলালেবু, লেমনেড, সোডা। এক ইউরোপীয় সদাগরী সংস্থাকর্মীদের পক্ষ থেকে এক হাজার লোকের জল-খাবার দেওয়া হল। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম এই খাদ্য-দানের দৃশ্য সূচনা করেছিলেন ছোট বড় অসংখ্য সহানুভূতির ঢেউ। কারা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন ঘোষণা করবার সাথে সাথে সহস্র সহস্র করতালি এগুলিকে অভিনন্দন জানায়। অর্থ দিলেন ভারতের জীবনবীমা কর্মচারী ইউনিয়ন। রাস্তায় চাদর পেতে সংগৃহীত হলো দেড় হাজার টাকা। সত্যাগ্রহে বসেছেন বৃদ্ধ-তরুণ, নারী-পুরুষ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সর্বশ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সমাজ। ছদ্মবেশী এক পুলিশ খাতা পেনসিল হাতে সাংবাদিক সেজে সেখানে ঢুকে পড়েছিল। ধরা পড়লো এবং সরে পড়লো তৎক্ষণাৎ। সন্ধ্যে ৬ টায় অফিস ফেরত আর ময়দানের সমাবেশ থেকে আসা জনসমাগমে ঠাসা ভীড়। সাত হাজার লোক অদ্ভুত বিস্ময়ে সে সময় শিক্ষকদের ধৈর্য-পরীক্ষা লক্ষ্য করছেন। তাঁদের অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখল আচরণ সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তাঁরাও ধৈর্য নিয়ে শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য শুনছেন। প্রতি বক্তব্যের শেষে তুমুল ধ্বনি উঠছে; সমর্থন করে জনতা একই ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে। সেদিন দুপুরে আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে ছুটে এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা এই অভূতপূর্ব দৃশ্যের চিত্র নিজেদের পেন্সিলে অথবা তুলিতে তুলে নিয়েছিল। চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। রাত্রি যখন বাড়ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ আরও বেড়ে চললো। উৎসাহের সঙ্গে অবস্থানকারী আবৃত্তি করলেন। সমবেত ও একক সংগীতে মুখর হয়ে উঠলো শিবির। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চললো। তার বেশীর ভাগটা রাজনীতি নিয়ে। তাঁরা এদিন স্লোগান দিতে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো। এগুলি এতকাল একচেটিয়াভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। শিক্ষকেরা

রাজনীতি করতে এখানে বসেননি। কিন্তু অচিরেই অবস্থান শিবির ঘিরে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হলো।

শিক্ষকদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের অভিনন্দন জানালেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে শিক্ষকদের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করলেন। ট্রাম মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলিরাজ সিং শ্রমিকদের সমর্থন জানালেন। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিবৃতি দিলেন "এই নিরুদ্রপ শিক্ষক ধর্মঘটীদের দৃঢ়সংকল্প বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা এই ভাবে চললে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী।" শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নতির জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ভাতা দিতে আবেদন জানিয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা নিশীথ নাথ কুণ্ডু এক বিবৃতি প্রচার করলেন। সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ সভা করে তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সৌভাতৃ ঘোষণা করলেন। কোচবিহার, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গা থেকে বার এসোসিয়েশন-গুলি সমর্থনের সংবাদ এলো। শিক্ষকদের কলকাতা রাজপথে অবস্থানের সংবাদ বিভিন্ন জায়গায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। শুধু মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নন প্রাথমিক শিক্ষকেরাও অবস্থানে অংশ নিতে হাওড়া থেকে রওনা দিলেন। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা ইতিমধ্যে অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বর্ধমান থেকে সত্যাগ্রহীরা প্রতিদিন নতুন করে আসছেন। খড়গপুর থেকে, বনগাঁ থেকে উল্লেখযোগ্য স্বেচ্ছাসেবক রওনা দিচ্ছেন এগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। ঐদিন অপরাহ্নে মন্ত্রীসভার অধিবেশন বসেছিল। এতবড় সমস্যা সম্পর্কে সেখানে কোন আলোচনা হলো না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে অবস্থানের সময় ৪০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। কলকাতার অলি গলি পথে প্রতিবাসায় একই কথা শিক্ষকদের নিয়ে। সেদিন ছিল শনিবার। দুপুর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্লাবনের আকারে মানুষ এলো। খালি হাতে মানুষ এলেন না। সঙ্গে যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী আনলেন ফল, মিষ্টি, অগত্যা কিছু পয়সা সংগ্রাম তহবিলের কুপন কিনবার। খাবারের মধ্যে ছিল পাউরুটি, রান্না করা খাবার, মাছের ঝোল, নানা রকমের মিষ্টি। প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে এলো পানীয় হিসাবে সোডা লেমনেড। পাঁচটা ছাত্র হোস্টেল এবং একটা হাসপাতাল ছাত্রাবাস থেকে এলো ১০০ শিক্ষকের দুপুরের খাওয়ার। যাদবপুর-টালিগঞ্জ উদ্বাস্তু কলোনী থেকে এলো হাতে তৈরী রুটী। সারাদিন ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার এলো। জোড়াসাঁকোর আমপট্টীর ফল বিক্রেতা সমিতি থেকে দশ হাজার কমলা লেবু দিতে এলেন কর্মকর্তা একজন। বিপুল করতালি আর অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে এগুলি গ্রহণ করা হচ্ছিল। এক ডজন ঝুড়ি নিয়ে এক ভদ্রলোক যখন তৃপ্তি সহ অবস্থান শিবিরের হাতে তুলে ধরছেন এক ফটোগ্রাফার ফটো নিল। তিনি সহাস্যে ক্যামেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক জানতে পারেনি সে ফটোগ্রাফার ছিল পুলিশের লোক। বিভিন্ন অফিসে চাঁদা তোলা শুরু হলো। পিওন থেকে অফিসার সবাই দিলেন। পি-এস-পি অফিস থেকে খাবার এলো। এক সিন্ধি ভদ্রলোক দিলেন চাল আর তরকারী। অবস্থান শিবিরে খাবার রাখতে সেদিন তৈরী করতে হলো পৃথক এক গুদাম ঘর। সন্ধ্যার সময় নেতারা বার বার ঘোষণা করলেন আর যেন খাবার না দেওয়া হয়। মহামিলনের এই দৃশ্যে এক শিক্ষক কবি লিখলেন—

অপার উৎসুক্য ভরে নিরীক্ষণ করে জনগণ
পথের ধুলিতে পেতে হৃদয়ের নিশান
হাত পেতে নেয় কারা সহস্র মুদ্রার দান।
গর্ব বিনিময়ে নেয় ফলমূল মিষ্টান্ন সম্ভার
আশীর্বাদ গণ দেবতার।

সংগ্রাম তহবিলে দুপয়সার কুপন বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ চলছিল। এদিন কুপন বিক্রি হলো দু'হাজার টাকার। প্রেসিডেন্সী মুসলীম হাই স্কুলের ছাত্ররা, মারোয়াড়ী ছাত্ররা অর্থ স্যহায্য করেন। ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, ছাত্র, হোস্টেল, শিক্ষকেরাও অর্থদান করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারীরা সেদিন ছয়শত টাকা সাহায্য দিলেন। একজন বেকার প্রাথমিক শিক্ষক তার শেষ সম্বল হাতে সোনার আংটিটি দিয়ে গেলেন। অবস্থানকারী শিক্ষিকার বৃদ্ধা মাতা একটা গিনি এনে নেতাদের হাতে সাহায্য দিলেন। প্রয়াত শিক্ষক স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে এক মহিলা অর্থ সাহায্য করলেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা অতীতে শিক্ষকতা করতেন বর্তমানে উপ-শিক্ষকতা করেন তিনি এলেন অর্থ সাহায্য করতে। উপকরণ ছাড়া সেদিনের মোট অর্থ সংগ্রহ রাত্রি সওয়া আটটা পর্যন্ত ছিল সাত হাজার টাকা। আর লোক এলো স্রোতধারার মত। সংগঠিত আকারেও মানুষ এসেছিলেন। বিশাল মিছিল নিয়ে এসেছিলেন ডক মজুরেরা। আর এস পি'র নেতৃত্বে শ্রমিকদের এক মিছিল এসে অভিনন্দন জানালো। স্বাধীনতা পত্রিকার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পার্কসার্কাসের জমায়েত থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত মিছিল এলো। আন্দোলনকারী শিক্ষক কবি দিনেশ দাস তাইতো লিখলেন—

রাজভবনের চারিদিকে
ঘোরে ফেরে আলোর মানুষ সব
যারা আলো জেলে রাখে ছোট ছোট প্রাণের প্রদীপে।
রাজভবনের কংক্রিট
কোথাও নেই হৃদয়ের গিট।
নিষ্প্রাণ অদ্ভুত
এখানে ঝরেনি কোনদিন
শুচিশুভ্র হৃদয়ের দুধ।
কী বিচিত্র দেশ।
কখন ফাল্গুন এল—নতুন পাতার সমাবেশ
নতুন পাতার মত জেগে ওঠে অসংখ্য হৃদয়
সারা দেশময়,
সমবেদনার অনুরাগে
বাংলার পুরাতন হৃদপিণ্ড জাগে
অকস্মাৎ
তোমার আমার হাতে হাত দেয় লক্ষ লক্ষ হাত।

সত্যাগ্রহ শিবিরের আশে পাশে সারাদিন অসংখ্য ক্ষুদ্র অথচ মর্মস্পর্শী দৃশ্য লক্ষ্য করা যেতো। সত্যাগ্রহীরা দু'রাত্রি অতিক্রম করেছেন। রাস্তায় ভাল ঘুম হয় না। জেগে থাকা যায় না। সারাদিন উত্তেজনার পর শরীর টেনে রাখা যায় না। তাদের চেহারা হয়েছে পীড়িত। তবু তারা বাড়ী ফিরবেন না। তাদের উপর যে কোন সময় প্ররোচনামূলক কিছু ঘটনা ঘটানো হতে পারে। উদ্বেগে পরিবারের লোকজন আসতেন তাদের দেখতে। এদের মধ্যে বয়স্করা যেমন থাকতেন তেমনি থাকতো শিশু কিশোর দল। সন্ধ্যার সময় এক বিরাট সমাবেশ—শিক্ষকেরা নিজেরাই দড়ি দিয়ে সত্যাগ্রহীদের ঘিরে নিলেন। তখন বেষ্টনীর বাইরে ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা আত্মীয়-প্রিয়জনেরা অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইল। কাতর আত্মীয়-প্রিয়জনেরা এসেছেন, সঙ্গে কিছু জলখাবার। দু' একটা ফল অথবা খবরের কাগজে মুড়ে গায়ের কাপড় নিয়ে। অনেক মা তার সন্তানকে আড়ালে ডেকে এনে ঘরে ফিরবার জন্য কি ব্যাকুল আকুতি জানাচ্ছিলেন। এদিন পূর্বাহ্নে

সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটির এগারো জন সদস্য মহাকরণে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অপরাহ্নে সত্যাগ্রহী শিক্ষক প্রতিনিধিদের সংগে সাক্ষাত করবেন প্রতিশ্রুতি দেন। এজন্য ডাঃ রায় যে পত্রটি পাঠান, তাতে লেখা ছিল— "যে কোন ব্যাপারেই আমি দেখা করতে অসম্মত হতে পারি না যদি মানুষেরা আগ্রহী হন। তাই আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমার দপ্তরে ষোলজন স্বাক্ষরকারীর কেউ অথবা সকলে দেখা করতে আসলে আনন্দিত হবো।" বেতারের সাহায্যেও এই সংবাদ সত্যাগ্রহ শিবিরে পৌঁছান হয়। শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মঘট মীমাংসার কিছু সম্ভাবনা সত্যাগ্রহ শিবিরকে আশ্বস্থ করে। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে শিক্ষক ধর্মঘটে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেন। শ্রীজ্যোতি বসু অবস্থান শিবিরে পৌঁছে তাঁর ও পার্টির সমর্থনে যে বক্তব্য রাখেন তা বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করে। ওদিকে সাড়ে পাঁচটার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, তারা কুমার মিশ্র, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুশীল ঠাকুর মহাকরণে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের ৭৫ মিনিট ধরে কথাবার্তা হলো। রাত্রি সাড়ে সাতটায় অবস্থান শিবিরে ফিরে এসে অনিলা দেবী জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী অনড়, সত্যপ্রিয় রায় বললেন, "এ. বি. টি. এ. খুশী নয়"। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সাংবাদিকেরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ডাঃ রায় বললেন, "তাঁর আর দেবার কিছুই নাই।" তিনি সরকারী কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে অপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন। নিষ্পত্তির যে সম্ভাবনা ছিল তা তিরোহিত হলো। ক্লান্তি ও অনিশ্চয়তার ছাপ সবার চোখে মুখে। রাত্রে সত্যপ্রিয় রায় বক্তব্য রাখছেন। সম্পূর্ণভাবে তাঁর গলা ভেঙ্গে গেছে। অবস্থানকারীরা স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না। কয়েকজন বলিষ্ঠ কন্ঠের যুবক এগিয়ে এলো। অবস্থানের মধ্যে যেয়ে তারা শ্রীযুক্ত রায়ের বক্তব্য পুনঃ প্রচার করলো। লাঠিধারী পুলিশ বদল হয়েছে। তার পরিবর্তে এসেছে সার্জেন্টরা। এদের একজনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছেন এক দিদিমনি "কিরে তুই অনিল না, তুই আমাদের এ্যারেষ্ট করবি?" তিনি চিনতে ভুল করেন নি, অনিল তার প্রাক্তন ছাত্র। মীমাংসার পথ বন্ধ হয়ে গেলে খোলা থাকে শাস্তির পথ। সাত বছরের স্বাধীনোত্তর কালে শাস্তি কত ভয়াবহ ও নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা অবস্থানকারীদের ছিল। তাই এই শান্ত নিরুদ্রপ অবস্থানেও যে কোন সময় এই আঘাত আসতে পারে তা অজানা ছিল না। তাই রাতের অন্ধকারে শিলিগুড়ির প্রবীণ শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী চিৎকার করে উঠলেন পুলিসের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে "ওরা কারা? ঐ যারা কালো কালো দাঁড়িয়ে আছে? কা-রা ওরা? পুলিশ!" শিশুর মত তাঁর চোখে বিস্ময় এবং বেদনা। অস্বাভাবিক ছিল না। যে কোন সময় হিংস্র আক্রমণ হয়ে যেতে পারতো। তবু আক্রমণের পথ খোলা রাজপথে তাঁরা অবিচল হয়েই বসে রইলেন। কবি গোলাম কুদ্দুস সেদিন সারা রাত অবস্থান শিবিরে ছিলেন। সেদিনের অবস্থানের ছবি এঁকেছিলেন ছবির পেনসিলে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু পত্রী। গোলাম সাহেব লিখেছেন "আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও কারো অন্তরাকাশে কি বিদ্যুৎলোকের মত দাগ কাটেনি? তবে আজ ধুলিশয্যায় দুঃখ কিসের? সব দুঃখী এক সঙ্গে মিলে তাঁরা আজ হাসছেন। এক গম্ভীর কন্ঠে ধ্বনিত হলো "মোহন বাঁশী দাও ফেলে দাও, চক্রধর চক্রধারী।" "টালীগঞ্জ ইনস্টিটিউশনের ৬২ বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক রাসমোহন শাস্ত্রী ধরলেন "এমন রাত্রি যে দেখল না।" "যে মাষ্টার মশাই শব্দ শুনলেই প্রণামের কথা মনে পড়ে তাঁরাই কি ওখানে শুয়ে? যে দিদিমনি শ্রদ্ধা ও স্নেহের প্রতিশব্দ তাঁরাই কি ওখানে কুঁকড়ে পড়ে আছেন? বিশ্বাস হয়েও হয় না কেন? বহু যুগ পূর্বের কোন যাযাবরের নৈশ নিদ্রার ছায়াছবি নয় তো?

চোখের সম্মুখে বড় ধরনের কী যেন একটা ঘটছে। কিন্তু তার তাৎপর্য ধরে উঠতে পারছি না। কোন সেক্সপিয়ার ছাড়া আর কেউ কি আঁকতে পারবে এই ছবি? হয়তো আইজেনষ্টাইন পারত তার ফিল্মের সাহায্যে। চিন্তাসূত্র কেটে গেল। রাস্তায় শুইয়ে রাখে যে সরকার, সে সরকার ধ্বংস হোক।"

গান হলো—

আজি বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার
চাষের জমি পড়ে আছে (২) চাষীর ঘরে অনাহার।
আজি বাংলার—
গ্রামের মানুষ পায় না খেতে, জোতদারের গোলায় ধান
আঁধার রাতে চোরাপথে শহর মুখে যায় চালান
সেখানেও চালের পাহাড় লুকিয়ে রাখে মজুতদার।
আজি বাংলার...
গ্রামে গ্রামে নেমে এলো মহামারীর ছায়া
পেটের জ্বালায় পাগল মানুষ ভোলে স্নেহমায়া
কোথায় গেল গোলাভরা রূপশালী ঐ সোনার ধান
ঘাসপাতা মানুষে খায় এ কিরে বিধির বিধান
কত যে ঘর ভেঙ্গে গেল (২) দেখেও দেখে না সরকার
আজি বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার।

কেউ বা ধরলেন রবীন্দ্র সংগীত

"ওই আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হবে।"

চললো রবীন্দ্র সংগীতের মূর্ছনা ঃ

"এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।"

আবার—

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।"

গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন, "মনে পড়লো সেই পর পরগম্বরের মত চেহারার কবি রবীন্দ্রনাথকে। শিক্ষা এবং সভ্যতার নামে যিনি ডাক দিয়েছিলেন, 'ধূলায় বসে স্বর্গ তোমার গড়তে হবে' তাঁর ছায়ামূর্তি হয়ত এখানে ঘুরছে।" অবস্থানে খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিকের অভাব ছিল না। অনেক শিক্ষক ছিলেন যারা পরবর্তীকালেও এই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁদের একজন কবি সত্যব্রত ঘোষ বলেছিলেন, "আর কি, আমি এখন মাষ্টারী করছি।" কবি দিনেশ দাস তাঁকে বলেছিলেন "আমাদের কথা ভাল করে লিখবেন।" মাঝে মাঝে বক্তারা বলে উঠছিলেন, "আমরা যে রাত জাগছি, আমরা যে পথের ধুলায় শুয়ে আছি সে খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে। সে খবর বাংলার বাইরে, যাবে ভারতের বাইরে বিদেশে। তাঁরা আমাদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়াবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসবে ছুটে। আমরা একা নই, আমরা একা নই। সেই আমাদের রাত জাগার মূল্য।" শিক্ষকদের সাথে সাথে রাত জাগছে কিশোর রামেশ্বর। অবশেষে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সেও একটা ধারণায় পৌঁছে গেল। সে থাকে রাজভবনের অভ্যন্তরে। তার কাকা শিবদত্ত রাজভবনের আর্দালী। তবু রামেশ্বরের চাকরী করে দিতে পারেনি। অবস্থান শিবিরে সে বিড়ি বিক্রি করতে এসেছে। লেখাপড়া লাটবাড়ীতে থেকেও হয়নি। সে রাত জাগছে পাদুকাহীন

বস্ত্রহীন শীতে দুটো পয়সার আশায়। ‘কিন্তু লেখাপড়া শিখলেও তো বাবু কষ্ট’ এই তার উপলব্ধি হয়। রাত আড়াইটার সময় ছেঁড়া কাগজ হাতে দৌড়ে এল একজন “টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম।” আচমকা এই আওয়াজ। সত্যিই টেলিগ্রাম নাকি, নতুন কোন খবর! ঘুম ভেংগে গেছে অনেকেরই। উদ্বেগ পরিণত হয়েছে অট্টহাসিতে। পোড়া এক দিদিমনি বললেন, “আহা গাম্ভীর্য নষ্ট করছে কেন ওরা।” ঠিক তিনটের সময় ধুলোর ঝড় যেমন এগিয়ে আসে ময়দানের দিক থেকে এগিয়ে এলো কুয়াশার পর্দা। রাতের অন্ধকার আরও ঘনীভূত। সেই তিমির অন্ধকার ভেদ করে অনিলা দেবীর কণ্ঠ বেজে উঠলো—“বন্ধুগণ একটু পরেই নতুন দিনের শুরু হবে। আপনারা রাতের অন্ধকার জয় করেছেন। আপনারা ডালহৌসী স্কোয়ারে স্থাপন করেছেন এক নতুন বিদ্যালয়। কাল সকালে সেখানে নতুন ছাত্র আসবে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করতে। আপনাদের সংগ্রামের খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। মুখ্যমন্ত্রীকে নেমে এসে দিতে হবে গুরুদক্ষিণা।” পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্তগুলি জেগে উঠেছিল। ২৪ পরগণার হাবড়া, অশোকনগর, ভাটপাড়া, দমদম, হুগলীর ধনেখালি, বীরভূমের নাগরীতে সভা সমাবেশ হলো এই কদিনে সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেল। কলকাতার মতই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সারা রাজ্যের সব জনপদ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ছুটির দিন। অবস্থান সমাবেশে এসেছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। “আজ মাস্টার মশাইরা মিছিল করবেন, স্লোগান দেবেন, রাস্তায় বসবেন এ সব গৃহীত এবং কেউ অন্যায় মনে করে না। কিন্তু তখন মাষ্টার মশাইদের ভাবমূর্তি ছিল টোলের পণ্ডিত-এর, যাঁরা তেঁতুল গোলা ভাত খাবেন, ঝুটঝামেলায় যাবেন না। দরিদ্র থাকবো, রাজনীতি করবো না, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবো সরকার বা স্কুল পরিচালকেরা যা সমান্য দেবে সেটুকুই হাসিমুখে মেনে নেবো—এই ছিল ঝোঁক। মাষ্টার মশাইরা মাহিনা বাড়াবার দাবিতে রাস্তায় বসবেন, এটা যেন কল্পনার মধ্যেই ছিল না।” † ৪৩ তাইতো অভিনব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে জনস্রোত এলো। মনে হলো এটা মস্ত মেলা নয় যেন তীর্থক্ষেত্র। সকলের সহানুভূতি ঐ মানুষগুলোর ওপর— দলমত যাই হোক। সরকারের উপর রাগও বাড়লো এ সব মানুষের—এমনই সরকার যে শিক্ষকদের ওরা পথে বসালো। রাজ্যের অধ্যাপকেরা আবার শিক্ষকদের দাবীতে সমবেত হলেন। পৃথকভাবে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেনের সমর্থনসূচক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রচারিত হলো। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থা ও শিক্ষাব্রতীদের সমর্থন সূচক বার্তা অবস্থান শিবিরে পঠিত হতে লাগলো। ওয়েলিংটন থেকে মিছিল করে গিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, নির্মল ঘোষ, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী। তাঁরা গানের সম্ভার দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এদিন নয়াদিল্লী যাত্রা করবার আগে এক বিবৃতি দিয়ে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা এবং সেগুলিতে শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য এক কমিশন গঠনের কথা বললেন। তদন্ত কমিশন হাইকোর্টের এক বিচারপতির সভাপতিত্বে আর দুই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নিয়ে গঠিত হবে বলে জানান। তিন মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আগের বিবৃতির পুনরুল্লেখ করে বলেন যে সম-পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করলে সরকার বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক সাড়ে সতেরো টাকা মহার্ঘভাতা দেবেন। মহাকরণে সাংবাদিকেরা রাজ্যের শিক্ষাসচিব শ্রী ডি. এম. সেনের কাছে মন্তব্যের জন্য উপস্থিত হন। তাঁরা শ্রী সেনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে মহাকরণের একজন চাপরাশীও ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা পান। তিনি উত্তর দেন শিক্ষকেরা এ চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। তিনি তাদের অবেদন বিবেচনা করে দেখবেন। তিনি

তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে ফেলেন যে ডাঃ রায় বার বার প্রত্যক্ষ বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীদের লাই দিয়ে এই অবস্থায় নিয়ে গেছেন। তাঁর হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকলে শিক্ষকেরা ওখানে মরে গেলেও তিনি পরোয়া করতেন না, বললেন। বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক মোহিত মৈত্র ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রস্তাব নেয় “জনপ্রিয় সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনতার সামনে, এমন কি শ্রদ্ধেয় ধর্মঘটী শিক্ষকদের কাছে আসতে নারাজ। ডাঃ রায় আপস মীমাংসার কোন পথ খোলা রাখেননি, তিনি চান একটা গোলমাল হোক, তিনি দম্ভ নিয়ে আছেন। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না।” সভায় আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভা অভিযানে সর্বস্তরের মানুষকে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়।

আকস্মিক কমিশন গঠনের প্রস্তাবে কোন কোন মহলে আশার সঞ্চার করে যে আপাততঃ শিক্ষক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি পরদিনের সংবাদপত্রে এই সংবাদ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করেছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সাংবাদিকেরা সত্যপ্রিয় রায়ের কাছে এর প্রতিক্রিয়া শুনতে হাজির হন। শ্রীযুক্ত রায় বলেন—“এই বিবৃতিতে নতুন কিছুই নাই, ভাষার মারপ্যাচ করে তিনি (ডাঃ রায়) কেবল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। কমিশন যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করবে বলা হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রয়েছে। পর্ষদ একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা, আর গভর্ণমেন্ট যে কমিশন গঠন করতে চান তাতে তাদের নিজেদের বাছাই করা লোক থাকছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুসন্ধান করলে তাদের অভিমত যে রকম নির্ভরযোগ্য, সঠিক ও নিরপেক্ষ হবে কমিশনের অভিমত সে রকম হবে না। গভর্ণমেন্ট এই স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে কমিশন গঠন করতে চান। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং জনমতের চাপই সরকারকে শিক্ষকদের দাবী মানতে বাধ্য করবে। যত দিন তা না হচ্ছে, তাঁরা সমস্ত কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। কারণ পরিণামে তাঁদের জয় সুনিশ্চিত।”

লক্ষ জনসমাবেশে অবস্থান শিবিরের চেহারায় আজ দারুণ চাকচিক্য। অশীতিপর বৃদ্ধ শিক্ষক রামাশীষ মিশ্রকে এক স্বতন্ত্র আসনে বসানো হয়েছে। তিনি যেন অবস্থানকারীদের প্রতিমা-মূর্তি, প্রতীক। তাঁর কপাল চন্দন চর্চিত। গলায় বিরাট গাদা ফুলের মালা। চারদিকে ঘিরে আছে তরুণেরা। আর এক পাশে স্তুপ হয়ে রয়েছে ফুলের তোড়া, বাক্স বোঝাই ফল আর মিঠাই। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা সুশৃংখলভাবে খাদ্য আর ফলগুলি অবস্থান সত্যাগ্রহীদের দিয়ে চলেছে। শিল্পীরা গান ধরছেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা কিংবা আবৃত্তি। নির্দিষ্ট সময় পরই স্লোগান উঠছে, “শিক্ষকদের দাবী জাতির দাবি”, “দাবি আদায় না হলে পর নড়ব না—নড়ব না।” অবস্থানের অধিকাংশ সময় জুড়ে সুমধুর একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশিত হয়েছিল। ছাত্রেরা গণ-সংগীতের চর্চা করতো। বিভিন্ন সংগীত তারা হাজির করেছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত করতো তাদের সম্ভার। প্রখ্যাত শিল্পী সলিল চৌধুরী, ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, অমর মুখোপাধ্যায়, মন্টু ঘোষ, দিলীপ সেনগুপ্ত গান গাইতেন। শ্যামল মিত্র এই অবস্থান শিবির থেকে গান তুললেন “পথে এবার নামো সাথী,” হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই আন্দোলনের উপর গান রচনা করলেন “তুমি যে জ্বেলেছ দীপ”। সে গানের সুর দিলেন শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত। লোক কবি গুরুদাস পাল একদিন পরিবেশন করেছিলেন তর্জাগান। খ্যাতনামা শিল্পী সুচিত্রা মিত্র ও রেলা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন

করেছিলেন বলে জানা যায়। গানের পসার নিয়ে এসেছিলেন ক্রান্তি শিল্পী সংঘের কর্মীরা। শ্রীসুখময় চক্রবর্তী তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গাইলেন—

"শোন চাষী শোন চাষী মরমের কথা শোন গো
কর্তায় কইছে আমরা নাকি স্বাধীন হইলাম শোন
সেই হাকিম আর সেই হুকুম
আর সেই হুকুমি চলে, পেটের আগুন জ্বলত যেমন
আজও তেমনি জ্বলে।"

এবং

"নেতার হুকুম ফসল বাড়াও
কমাও সবে খাওয়া
আগে খাইতাম আধপেটা ভাই
এখন খাইও হাওয়া।"

রাত্রি বাড়ে। বাড়ে সত্যাগ্রহীদের তেজোদীপ্ত ভাব। ডালহৌসীর নিস্তব্ধ পথে শোনা যায়—

"মোর মত আর দেশপ্রেমিক নাই"

ছাত্ররা গাইলো—

"শহীদ স্মরণে আপন মরণে
রক্ত-ঋণ শোধ করো,
চারিদিক হতে নাগপাশ যত রোধ করো।
আমরা চিনেছি মিত্র শত্রু, চিনেছি
জেনেছি তাদের ভয়
আর জেনেছি এবার মোদের সবার
মৃত্যু হবার নয়
তাই, ব্যর্থ নয় ব্যর্থ নয় এই চলা
আজ স্বপ্ন শেষ দুঃখ রেশ দূরে মিলাক।"

অবস্থান শিবির নয়। বিজয়ী সেনাদল যেন রাজপ্রসাদ ঘিরে ফেলেছে যেখান থেকে আরও জোরে শোনা যায় সমবেত সংগীত—রবীন্দ্র সংগীত—

"বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই সরতে হবে।
লুট করা ধন করে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।
নীচে বসে আছিস কেরে কাঁদিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখ ধনে, সেই কথাটি রাখিস মনে
ধুলার পরে স্বর্গ তোমার গড়তে হবে—
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে।
বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে॥"

অবস্থার পরিবর্তন

নয়

১৫ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষক আন্দোলনের অবস্থান ধর্মঘটের পঞ্চম দিন। সেদিন বিভিন্ন জেলা থেকে ২৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এসে অবস্থানে যোগ দিলেন। চারদিন রাতে ঠান্ডা এবং দিনে প্রচন্ড গরমে সত্যাগ্রহীদের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার্থে সাময়িক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হলো। সেখান থেকে ৩০ জনকে চিকিৎসা করা হলো। ওষুধপত্র নিলেন অনেকে। একাধিক রিলিফ কমিটি এসেছে। এর মধ্যে আছেন মেডিক্যাল কলেজের বহু ছাত্র। এঁরা অবস্থানে সকলকে কলেরার টিকাও দিলেন। রাজপথে অবস্থানে পৃথক পৃথক দপ্তর ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে। প্রচার, অর্থ, স্বেচ্ছাসেবক দপ্তর ও স্টোর। স্টোরের কাজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে। এক বেকারী থেকে ২৫০টি রুটি এলো। এক মুদি দিলেন আড়াই মণ মুড়ি। পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র কয়েকটা লুচি দিলে আবেগময় দৃশ্যের সূচনা হলো। দিনভর বহু নরনারী এলেন। শোভাযাত্রা করে এলেন শ্রমিক ও সদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দান এলো আরও। সেদিন মোট সংগৃহীত হলো আড়াই হাজার টাকা। হাওড়া হাসপাতাল থেকে অসুস্থ এক ছাত্র চিঠি লিখে তিন টাকা পাঠালো। তাও নেওয়া হলো। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু সেদিন থেকে। সমিতি নিয়েছিল বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচী। বেলা দেড়টার সময় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে দলবদ্ধভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবস্থান শিবিরে পেঁছিলেন। কলকাতার প্রায় সব স্কুলের দু'জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এলেন। বাঘাযতীন, বিজয়গড়, নেতাজীনগর থেকে একযোগে সবাই এলেন। বনগাঁ, শান্তিপুর, রানাঘাট, কাটোয়া, দাইহাট, হাটগোবিন্দপুর, জনাই, মাহেশ, রিষড়া, আসানসোল, কোলাঘাট থেকেও বিধানসভা অভিযানে শিক্ষকেরা এলেন। এ সময়ে বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভা বসেছিল। শিক্ষক সমস্যা সেখানে আলোচিত হয়। ডাঃ রায় বললেন সমস্ত স্কুলগুলিকে সাহায্যদানের আওতায় আনলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তার জন্য ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এই বাবদ টাকা কেন্দ্র থেকেও পাওয়া যাবে। সবাই বেশ, বেশ বললেন। সভা শেষ হলো। বেলা তিনটার সময় অবস্থান শিবির থেকে দু'হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার সুসজ্জিত মিছিল শুরু হলো। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি নামাঙ্কিত বিরাট ফেস্টুনের পুরোভাবে লোলচর্ম বৃদ্ধ শিক্ষক রামাশীষ মিশ্র। তাঁর কপালে চন্দন লিপ্ত। কণ্ঠে ফুলের মালা। এই বৃদ্ধের দু-পাশে সমিতির নেতারা—মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বামন দাস মণ্ডল, সুশীল ঠাকুর ও অনিলা দেবী। অসংখ্য প্রবীণ ও নবীন শিক্ষিকা উপস্থিত। এঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাগরিকা ঘোষ, ইন্দু মুখার্জী ও দীপ্তি ভট্টাচার্য। তাঁরা ধ্বনি দিচ্ছেন—শিক্ষকদের দাবি জাতির দাবি, জাতির দাবি মানতে হবে, শিক্ষাখাতে রাজস্বের ২০ ভাগ দিতে হবে, পুলিশ খাতে ব্যয় কমাও, শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়াও। বিধানসভা ভবনের ৫০ গজ দূরে লরেন্স ও অকল্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে পুলিশ শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। ঐ সব দাবিসহ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ, ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা দিতে হবে' বলতে বলতে মিছিল সারিবদ্ধভাবে রাজপথে বসে পড়লো। দু'ঘন্টা একই অবস্থায়। ভাবটা এমন যে বিধানসভা যাবার অনুমতির অপেক্ষায় তাঁরা বসে আছেন; অনুমতি এলেই মিছিল রওনা দেবে। সমিতি নেতারা মিছিলের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন।

ঠিক বেলা চারটায় বিধানসভা ভবনে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন শুরু হলো। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জী উদ্বোধন করতে এসে পোঁছেছেন তার আগেই। শোভাযাত্রা করে তিনি সভাকক্ষে প্রবেশ করেছেন। তাঁর দু'পাশে স্পীকার শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আসন গ্রহণ করেছেন। রাজ্যপালের ভাষণের আগে ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা হেমন্ত কুমার বসু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন—"আপনার ভাষণ আরম্ভ করবার আগে দরিদ্র শিক্ষকদের দুরদৃষ্টের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাঁরা আপনার বাসভবনের পাশেই অবস্থান ধর্মঘট করছেন। আপনি ভাষণ দেবার আগে আসুন আপনি এবং আমরা সকলে একত্রে তাঁদের কাছে যাই। তাঁদের দাবীর সম্পর্কে একটা মীমাংসার চেষ্টা করি।" যে ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে কংগ্রেস সদস্যরা আগে কিছুই আঁচ করতে পারেনি। তাঁরা চিৎকার শুরু করলেন। প্রজা সোসালিষ্ট দলের নেতা সুধীর চন্দ্র রায়চৌধুরী বললেন, "আপনার উচিত এখানে লিখিত ভাষণ পেশ করার আগে নিজে একটা মীমাংসার চেষ্টা করা"। রাজ্যপাল লিখিত ভাষণ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন মাননীয় সদস্যেরা বিধিবদ্ধ কাজ করছেন না। জ্যোতি বসু উঠে দাঁড়ালে রাজ্যপাল উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি যখন দাঁড়িয়ে আছেন তখন এ রকম কাজ করা সঙ্গত নয়। জ্যোতি বসু বললেন, সঙ্গত অসঙ্গতের প্রশ্ন নয়—শিক্ষকেরা ধর্মঘট করে বসে আছেন। গোলমালের মধ্যে তিনি বলে চলেন, "আপনি যদি প্রকৃত রাজ্যপাল হন, তবে আপনার উচিত এক্ষণে শিক্ষকদের মধ্যে যাওয়া, তাঁদের দাবীদাওয়া মেটাবার চেষ্টা করা।" স্পীকার ও চেয়ারম্যান উভয়েই এই গোলমাল বন্ধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। বিধানমণ্ডলীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি বলে ব্যবস্থাপক সভার এক দৃষ্টান্ত তাঁরা তুলে ধরেন। স্যার স্ট্যানলি জ্যাকশন যখন গভর্নর তখন সৈয়দ জালালউদ্দিন তাঁর ভাষণে আগে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সভার প্রেসিডেণ্ট মন্মথনাথ রায়চৌধুরী তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। সদস্য বিভূতি ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জী, জ্যোতি বসু, নির্মল ভট্টাচার্য চাপ দিতে লাগলেন যাতে সভা আধ ঘন্টা মুলতবী রেখে শিক্ষকদের সঙ্গে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্কিম মুখার্জী বলেন "শিক্ষকেরা দিনের পর দিন কিভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তা আপনার নিজে যেয়ে দেখা উচিত। হেমন্ত ঘোষাল, নেপাল রায়, মনোরঞ্জন হাজরা, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্তী, ডাঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন সরব হয়ে উঠলেন। বিরোধীপক্ষের সদস্যবৃন্দ বললেন, আমরা আপনার ভাষণ শুনব না, আমাদের দাবী মানতে হবে, শিক্ষকদের দাবী মানতে হবে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো "শিক্ষকদের দাবী মানতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে।" ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে তাঁরা একযোগে সভা কক্ষ ত্যাগ করলেন। বিধানসভার অদূরে শিক্ষক সমাবেশে পোঁছে সুবোধ বানার্জী, জ্যোতি বসু, হেমন্ত কুমার বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ জোয়ারদার, দাশরথি তা, শরদিন্দু বেরা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এবং মণিকুন্তলা সেন বক্তব্য রাখলেন। সাড়ে পাঁচটায় বিধান সভার সম্মুখ থেকে শিক্ষকেরা ফিরে এলেন অবস্থান শিবিরে। তার আগে দু'টি বিশাল শোভাযাত্রা এ'দেরকে সমর্থন জানাতে এসেছিল। একটি ডক মজদুর ইউনিয়নের, অপরটি ছাত্র ফেডারেশনের। এছাড়া কলকাতা করপোরেশন শিক্ষক সমিতি শিক্ষক আন্দোলনে তাঁদের সমর্থন ঘোষণা করলেন। অবস্থানে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের, সুরেন্দ্র নাথ কলেজের, প্রেসিডেন্সী মুসলিম হাই স্কুল, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। খালসা হাই স্কুলের শিখ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ডেভিড হেয়ার ও স্কটিশ চার্চ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং এক সুসজ্জিত মহিলা মিছিল অবস্থান শিবিরে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জানাল। অর্থ-

সাহায্য করলেন বেঙ্গল পটারী মজদুর ইউনিয়ন, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের দক্ষিণ দাড়ি শাখা, স্টেশনারী কন্ট্রাকটরস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স, স্যাকসবী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি দিল এক হাজার টাকা। সেন র‍্যালী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তাদের সংগৃহীত চৌদ্দ টাকা সাড়ে নয় আনা সংগ্রাম তহবিলে জমা দিল। এলবার্ট হারবার্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও প্রগ্রেসিভ স্ট্যাডি ক্লাব সাহায্য দিল। কলকাতা ও মফঃস্বলের জনসমর্থনের সংবাদ এলো। কলকাতার স্কুল রো-র ২৮ জন অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষক ধর্মঘটের মীমাংসা করতে চিঠি দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ, ভাটপাড়া, অশোকনগর, তারকেশ্বর, বাঁকুড়ার বালিয়াতোড়, টাকি, ধনেখালি, দমদম, বীরভূমের নাগরী, বার্নপুর, কালনা, জলপাইগুড়ির মেটেলীতে শিক্ষকদের সমর্থনে কৃষক ও শ্রমিকদের সভায় যোগদানের সংবাদ জানা গেল। সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির পক্ষে সুবোধ ব্যানার্জী ও অন্যান্যেরা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে শোভাযাত্রা হবে। তাতে যেন সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন। বিধানসভা অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটি ঐ দিন বেলা ১টায় বিশ্ববিদ্যালয় লনে ছাত্রদের উপস্থিত হতে আবেদন প্রচার করলো।

ঐ রাতে সমিতির সংগ্রাম পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্থির হলো ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪৪ ধারা অথবা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করা হবে। শিক্ষকদের মাগ্গী ভাতা সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্যদের সুপারিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে কার্যকর না করলে এই পথ নেওয়া হবে। প্রতি দলে ৪ জন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন তাঁরা আইন অমান্য করবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সত্যপ্রিয় রায় বিবৃতি দেন—"নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি মনে করে জনমতের কাছে নতি স্বীকার করেও সরকার গণ-আন্দোলন এড়িয়ে চলছেন। শিক্ষকদের দাবীর প্রতি গত ছয়দিন ধরে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে তাহলে সরকারই জনসাধারণকে এই আন্দোলনের মুখে ঠেলে দেবেন এবং যে কোন প্রকার হাঙ্গামার জন্য সরকারই দায়ী হবেন।" রাতে পুলিশ কমিশনার বিধানসভা এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জারী করলেন। এলাকাটি উত্তরে হেসটিংস্ স্ট্রীট (রাস্তা বাদে) দক্ষিণে অকল্যাণ্ড রোড ও রাজভবনের দক্ষিণ ফটক পর্যন্ত লরেন্স রোড (রাস্তা দুটি সহ) পূর্বে গভর্নমেন্ট প্লেস (ওয়েস্ট) রাস্তা সহ এবং পশ্চিমে স্টান্ড রোড (রাস্তা বাদে) পরিবেষ্টিত অঞ্চল।

অবস্থানের ১০৮ ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে। রাত্রি দু'টা বেজেছে। অধিকাংশ অবস্থানকারীরা গভীর অবসন্নতায় নিদ্রামগ্ন। অতর্কিতে পাঁচশত পুলিশের এক বিরাট বাহিনী অবস্থানে নেমে পড়লো। পুলিশের গাড়ী আর অগণিত ট্রাক নিয়ে চারদিক থেকে শিবির ঘিরে ফেললো। তখন রাত্রি ২-২০। দৃশ্যটা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের। পুলিশের মাইক অবস্থানকারীদের স্থানত্যাগের নির্দেশ দিল। ঘোষণার আগেই অবস্থানকারীরা গ্রেফতার এড়াতে পা বাড়িয়েছিল। যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁরা অবিচলভাবে স্লোগান দিয়ে চলেছেন "আমাদের দাবী মানতে হবে, দাবী আদায় না হলে নড়ব না, নড়ব না।" পুলিশ অনিলা দেবী ও সত্যপ্রিয় রায়কে অবস্থান শিবিরেই গ্রেফতার করতে উদ্যত হলো। স্লোগান উঠলো "আমাদের নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে গ্রেফতার করা চলবে না—চলবে না। অনিলা দেবীকে গ্রেফতার করা চলবে না।" বাহিনীতে ২৫ জন মেয়ে পুলিশ ছিল। তাঁরা ২০ জন মহিলাকে গ্রেফতার করলেন। গ্রেফতার হলো ২৪৩ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা যাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা রায় কালীপদ কুণ্ডু,

বীরেন গাঙ্গুলী, অবিনাশ চন্দ্র গুহ, তারাকুমার মিশ্র, প্রফুল্ল বক্সী, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত প্রভৃতি। সেই গভীর রাতে পুলিশের গাড়ী বন্দীদের নিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে লালবাজার ও তালতলা থানার দিকে ছুটে চললো। অবস্থান শিবির মুহূর্তে ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হলো। সব শেষে মেথর দিয়ে কলার পাতা, প্রচুর কমলা লেবুর খোসা, মাটির পাত্র ও গ্লাস, চট, বসবার আসন ঝাঁট দিয়ে জমা করা হলো। রাত্রি তিনটের একটু পরে ঐ রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হলো। কলেজ স্ট্রীটে সমিতির কর্ম পরিষদের দপ্তর গোপনে করা হয়েছিল। কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া মূলতঃ সেখান থেকে নির্বাহ করা হতো। সেখানে এ খবর গেল। সেখান থেকে ছুটে এলেন হীরেন্দ্র নাথ রায়। তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা ছাড়া।

সরকার কি অন্যায়ভাবে শিক্ষকদের বন্দী করেছেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভোর থেকে কলকাতার অলিগলিতে সবার মুখে একই আলোচনা, একই রকমের উত্তেজনা। প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি এই সংবাদের স্বীকৃতি দিল। ছাত্রেরা আর ঘরে বসে থাকতে পারলো না। একজন দু'জন করে প্রতিটি পাড়া থেকে দলবন্ধ হলো। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা সহকারে পতাকা ও প্রাচীরপত্র বহন করে বিভিন্ন রাজপথ অতিক্রম করে জমায়েত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। জমায়েতের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেখানে উপচে পড়া ভীড়। ছাত্র সভায় প্রবল উত্তেজনা। বক্তাদের স্বর ক্রোধে ঘৃণায় কাঁপছে। একজন বক্তা বললো,—'জানি ওরা ইডেন গার্ডেনে মাউন্টেড পুলিশ জড়ো করেছে। আমরা ভয় পাই না। জানি ওরা কর্ডন দিয়ে আমাদের ঠেকাতে চাইবে, পারবে না। আমরাও লাথি মেরে ভাঙবো ওই কর্ডন।' সকলের মুখেই ক্রোধ এবং আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। সেদিনের ছাত্র নেতারা দাবী করেছেন এর আগে '৪৬ সালে রশীদ আলী দিবসে যে বিশাল ছাত্র সমাবেশ হয় সেদিনের ছাত্র জমায়েতের সংখ্যা ছিল তার চেয়েও বেশী। সংবাদপত্র এই দাবী সমর্থন করেছে। সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ স্ট্রীট থেকে শোভাযাত্রা করে ওয়েলিংটন, ধর্মতলা অতিক্রম করে মনুমেন্টে এসে পৌঁছয়। বিশাল জনতা সেখানে সমবেত হয়। বিকেল ৪টায় ডাঃ সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো। বিভিন্ন বামপন্থী নেতারা তীব্রভাবে শিক্ষকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সভা শেষে বিকাল সাড়ে চারটায় ২০ হাজার লোকের এক সুবিশাল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বিধানসভা ভবনের দিকে যাত্রা করলো। বিধানসভা ভবনের ১৫০ গজ দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুলিশ প্রস্তুত ছিল। তাদের সংগে ছিল ঘোড় সওয়ার বাহিনী। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছেন ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা পাশাপাশি চলছেন। পেছনে হাজার হাজার মানুষ। সবাই ময়দান থেকে তখনো বের হতে পারে নি।

বিধান সভার অধিবেশন শুরু হয়েছে। সর্ব প্রথম শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে ৫।৬ দিন ধরে শিক্ষকেরা শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। গতকাল রাত দুটোর সময় তাঁদেরকে ডাঃ রায়ের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মুলতবী প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় বিবৃতি দিলেন। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সরকারী যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে তা বিবৃত করলেন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি করা সম্পর্কে তিনি বলেন গ্রামের ছোট শহর থেকে বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থা চালু আছে। তাঁর সঙ্গে বহু অভিভাবকের কথাবার্তা হয় যাঁরা বলেছেন এ জন্য তাঁদের বিপুল অর্থ আসে। ৬০, ৭০, ৮০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। তাঁর নিজেরও স্কুলগুলোর সঙ্গে বহু বছর ধরে সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর অনুভূতি এই যে শিক্ষকেরা যদি তাঁদের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট না হন তবে ছাত্রদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া

তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীগণেশ ঘোষ প্রশ্ন তোলেন এর সঙ্গে শিক্ষকদের গ্রেফতারের কি সম্পর্ক আছে? তাঁরা দাবী করছেন মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ও অন্যান্য মানুষের গ্রেফতার প্রসঙ্গে বলবেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রেখে বলেন কলকাতার সাধারণের রাজপথ তাঁদের অধিকার করবার ক্ষমতা নেই। সরকার সম্পূর্ণভাবেই শিক্ষকদের দ্বারা উদ্ভূত এই সমস্যাকে অপরাধমূলক বলে মনে করে। তাঁদেরকে গ্রেফতারের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তাঁদের কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং ভারতীয় পেনাল কোডে যে অপরাধে যে শাস্তি দেয় তা দেওয়া হবে। আলোচনাকালে তিনি উত্তেজিত হয়ে ইঙ্গিত দেন যে বিরোধীদের ভবিষ্যতে এমন গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। জ্যোতি বসু বিধানসভায় তাঁর এমন ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন মুখ্যমন্ত্রী এমন মন্তব্য করতে পারেন কি না। দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। প্রবল হট্টগোলের মধ্যে জ্যোতি বসু বলে চলেন, "তাঁরা কাপুরুষ নয়। হাউস মুখ্যমন্ত্রীর নয়, এটা আমাদের সকলের। বাংলার মানুষের।" বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তব্যের পর জ্যোতি বসু বলেন ২০ হাজার মানুষ বিধানসভায় ডেপুটেশন দিতে এসেছেন। ডাঃ রায় টাটকা এক বিবৃতি দিয়েছেন যা দিয়ে তাঁদের আন্দোলন মোড় নিতে পারে। কিন্তু এ. বি. টি. এ-র নেতৃবৃন্দ জেলে। তাঁরা জানবেন কি করে? ডাঃ রায় বলেন, ম্যানিজিং কমিটি মানতেই হবে। মানিকতলা থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সেন ৫টা বাজবার কিছু আগে সভায় বললেন "এই মাত্র আমি বাইরে দেখে এলাম মাথা ভাঙাভাঙি, কত লোক যে হতাহত হবে তার হিসাব নেই। এখনও সমস্ত জিনিসটা আয়ত্তের মধ্যে ছিল।......মাস্টারদের ছেড়ে দিলে ভাল হত। না হলে সমস্ত কলকাতায় জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হবে।" বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের একাংশ ও বিরোধীদলের কয়েকজন নেতা মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণাতে এগিয়ে যাবার পথ পান। এঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস দলের চীপ হুইপ দেবেন দে ও জে. সি. গুপ্ত এবং হেমন্ত বসু ও বঙ্কিম মুখার্জী। এঁরা বাইরে এসে মীমাংসার সুযোগ গ্রহণের জন্য মিছিল থামিয়ে দেবেন এই রকম প্রবল ইচ্ছা নিয়ে ছুটে চললেন। এই উদ্দেশ্যে মিছিলের সামনে যেয়ে নেতাদের আর অগ্রসর না হতে অনুরোধ করলেন। সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সাথে দু'জন আহ্বায়ক ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাবেশের পুরোভাগে ছিলেন। উত্তাল জন সমুদ্রের গতি বন্ধ করবার ক্ষমতা বাস্তবে তাঁদের কারুর ছিল না। তাঁদের তেমন মেজাজও ছিল না। এ কারণে এঁরা গাল খেয়ে মিছিলের সামনে থেকে সরে আসলেন। মিছিল এগিয়ে গেল দ্রুত গতিতে। পুলিশ কর্ডনের সম্মুখে আসামাত্র পুলিশ সর্বপ্রথম ঐ দুই নেতাকে গ্রেফতার করলো। পুলিশ ভ্যানে তাড়াতাড়ি তাঁদের তুলে দেওয়া হলো। এঁদের দু'জনের সাথে গ্রেফতার হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, দাশরথি তা, নির্মল সিংহ, সমর গুহ প্রমুখ নেতৃবর্গ। মুহূর্তে সেই কর্ডন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। জলোচ্ছ্বাসের মতো হাজার হাজার মানুষ ছুটছে বিধান সভার দিকে। চিৎকার উঠছে "কর্ডন ভেঙ্গেছে এগিয়ে এসো।" তারপরই এলো অশ্বারোহীর আক্রমণ। বেটন তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হলো। প্রচুর ঘোড়া। যেন শবে শয়ে। সেই ঝটিতি আক্রমণে মিছিল ভেঙ্গে গেল এবং সবই বাধ্য হল পিছু হটতে। কিন্তু সেটা সাময়িক কয়েক মিনিটের ব্যাপার। পরক্ষণেই আবার রুখে দাঁড়ালো। আসুক ঘোড়া, চলুক রাইফেল—আমরা নড়ব না। দমাদম ইট ও ঢিলের ঘায়ে ঘোড়া আর এগুতে পারলো না। জনতা একটু পিছালো। মৃদু উত্তরে হাওয়া টিয়ার গ্যাসকে নিয়ে গেল জনতার দিকে। তারা রাজভবনের দক্ষিণে পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য হলো। কিন্তু সেই কাঁদুনে গ্যাসও যেন সহ্য হয়ে গেল। ধোঁয়া একটু কমলেই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ। শুরু হলো পুলিশের

সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। কখনও জনতা এগিয়ে আবার কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে। কেউ রক্তাক্ত দেহে পাশে ঢলে পড়ছে। কেউ আবার ঘোড়া, বেটন, গ্যাস সত্ত্বেও কপালের রক্ত পুঁছে সামনে ছুটছে। এক ঘণ্টা পরে প্রায় ৬টা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা বুঝতে পারলো তারা আর বিধানসভায় যেয়ে পৌঁছতে পারবে না। তখন তারা চৌরঙ্গী পর্যন্ত পিছিয়ে গেল।

সাড়ে পাঁচটার একটু পরে বিধানসভায় গণেশ ঘোষ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন এবং এর বিহিত দাবী করেন। সদস্য বীরেন ব্যানার্জী বলেন পুলিশ এসেমব্লীর গেট খুলে দুটি মাউন্টেড পুলিশ ঘোড়া ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এতে স্পীকারের অনুমতি আছে কিনা। দেবেন দে বিবৃত করলেন তাঁদের শান্তির দৌত্য কেমনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। লাঠি চার্জ হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করে ঘটনাগুলি বিবৃত করলেন গণেশ ঘোষ। হেমন্ত বসু 'বিরাট শোভাযাত্রা' বলতেই কংগ্রেস সদস্যেরা ব্যঙ্গ করে উঠলেন। হেমন্ত বাবু বললেন, "বাঃ বলব না— যদি এসেমব্লী গেটে অতীতের মত আসতে দেওয়া হতো।" কংগ্রেস সদস্য জে. সি. গুপ্ত ব্যাখ্যা করলেন মিছিল থামাতে তাঁদের প্রচেষ্টা কেমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি বললেন তিনি ও দেবেনবাবু কিভাবে মিছিল থামাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পুলিশ কর্ডনের সামনে এসে তারা বলছিল "আমরা গুড়িয়ে দেব", তাদের ভাষ্য "আমরা সরকারকে গুড়িয়ে দেব"। যখন তারা এলো তখন টিয়ার গ্যাস ছোড়া হলো। এরপর শুরু হলো পাটকেল ছোড়া। ঢিল ছোড়ার পর মাউন্টেড পুলিশ তাদের তাড়া করে এবং তারা চলে যায়। এছাড়া আর কিছু হয়নি। দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দি দৈনিক হিন্দুস্থানে সেদিনের পুলিশী অভিযানের চমৎকার আলোকচিত্র প্রকাশ করে। এই চিত্রটি বিদেশের কোন বড় যুদ্ধক্ষেত্রের বলে ভুল হবে। ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে মনে হবে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনী। তাদের সম্মুখে বিরাট পাথরের মূর্তি (ময়দানে সেকালে রাখা ইংরেজ শাসক)। তার পেছনেই মেঘের আকারে কাঁদুনে ধুম্রজাল বোমা বিস্ফোরণের মত চেহারা নিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও সন্ধে ৬টায় বিধান সভার পশ্চিম গেটে রচিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সুবিশাল এক সমাবেশ। পুলিশ সেখানে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করেনি। এ সমাবেশ বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল। এতে যোগ দিয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি, এসোসিয়েশন অব এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ওভারসীজ এণ্ড ইনল্যাণ্ড ইউনিভার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ জীবনবীমা কর্মচারী সমিতি, পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কারস্ ফেডারেশন প্রভৃতি কর্মচারী সমিতিগুলি। তাঁরা শোভাযাত্রা করে নেতাজী সুভাষ রোড থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে অকল্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে রিফিউজি রিলিফ ডিপার্টমেন্টের অফিসের সম্মুখে এলে পুলিশ গতিরোধ করে। লোকসংখ্যা সম্পর্কে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার তিন হাজার, অমৃতবাজারের ধারণা ছয় হাজার। আর একটি সমাবেশ রাজ ভবনের পূর্ব গেটে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপে দুপুর থেকেই রাজপথে অবস্থান করছিল, সেটি শিক্ষকদের।

অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গীতে হাঙ্গামা শুরু হলো। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেল। অফিস ফেরত যাত্রীদের তীব্র সংকট। হয় ঢিল খাবে নতুবা পুলিশের গুলি। তাঁদের ছোটাছুটিতে চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ এদের বিক্ষোভকারী ভেবে নিল। তার আগেই ময়দানে আবার পুলিশ ও জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে দুটি বিদেশী শাসকের মূর্তির ক্ষতিসাধন হয়েছে। চৌরঙ্গীর আমেরিক্যান ইনফরমেশন সার্ভিসের দরজার কাঁচ ভেঙেছে। পুলিশ সেখান থেকে জনতাকে তাড়া করেছে। জনতা করপোরেশনের প্রধান অফিসে ঢুকে পড়ে। পুলিশ

মেয়রের সম্মুখে তাঁদের উপর গুলী চালায়। জনতা নিউ মার্কেটের প্রধান ফটক ভেঙে ফেলে। সেখানে কোন দোকান লুঠ হয়নি। পার্ক স্ট্রীটের একটি দোকান লুটের খবর পাওয়া যায়। জনতার একাংশ ভীষণ উত্তেজিত। তাদের রাগ পড়ে ট্রাম-বাসের উপর। পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ও সোডার বোতল ফেলে। ডালপালা ভেঙে আর পিচের ড্রাম দিয়ে অবরোধ তৈরী করে। গোলমাল শুরু হয়ে যায় শিয়ালদহে। রাতে হ্যারিসন রোড, বৌবাজার, মির্জাপুর, ওয়েলেস্‌লী, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ওয়েলিংটন, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোডে হাঙ্গামা হয় প্রচণ্ড। হাতিবাগানে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। কৈলাস বসু স্ট্রীট ও শ্রীমানী বাজার তছনছ হয়। রাস্তার আলো ভেঙে দেওয়া হয়। শ্যামবাজার থেকে বালীগঞ্জ অবধি নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়। ডেকার্স লেন ও রাসবিহারী রোডে গোলমাল হয়। পুলিশ জগুবাবুর বাজারেও গুলী চালায়। সে রাতে ১০০টি স্থানে হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া যায়। দমদমে গুলী চলে। টিয়ার গ্যাসের সাহায্যে সেখানে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। সেন্ট্রাল এভিন্যুতে মোটরযান আক্রান্ত হয়। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এইসব এলাকায় পুলিশ জনতার সংঘর্ষ সাংঘাতিক আকার নেয়। বহুলোক সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। পুলিশ নাকতলা স্কুলের ৬০ বছর বয়স্ক শিক্ষকের মাথা থেতলে দেয়। রসা রোডের সদ্য বিবাহিত পি. এণ্ড. টি. কর্মী অজিত দে যখন বাজার থেকে ফিরছিলেন তাঁকে পুলিশ হত্যা করে। রাণী ভবানী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্রনাথ সরকার ও যাদবপুর স্কুলের ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধ শিক্ষককে নৃশংসভাবে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। নিউ মার্কেটের সামনে নারায়ণ স্বামী নামে এক দিনমজুরকে পুলিশ ডেকে এনে গুলী করে হত্যা করে। শুধু রাস্তা নয় বাড়ির ছাদ ও জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। করপোরেশন অফিসেই সাতজন জখম হন। স্টেটস্‌ম্যান ভবনের সামনে দাঁড়ানো পত্রিকা পিওনদের উপর গুলি চালানো হয়। সেখানে চারজন জখম হন। তামা-পিতল কারখানা শ্রমিক মন্মথ বর্মনকে নিরাপদ স্থান থেকে ডেকে এনে হত্যা করা হয়। মিলিটারী একাউন্টসের কেরানী প্রভাস মিত্র সাংঘাতিকভাবে জখম হলেন। ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটে সি-কে ব্রাদার্স এসোসিয়েশনের বোর্ডিং হাউসের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক ইয়াসিন নামক ভদ্রলোককে তাক করে পুলিশ গুলি ছোড়ে। ভবানী দত্ত লেনে ওয়াই-এম-সি-র ছাদে প্রৌঢ়া গৃহিণী প্রভাদেবী এইভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা বালীগঞ্জ থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত নানা স্থানে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মেটিয়াবুরুজে পুলিশ অজিত কুমার দে (একজন চটকল শ্রমিক)-কে গ্রেফতার করতে গেলে মহিলারাই প্রতিরোধে নামেন এবং তাকে মুক্ত করেন। সে রাতেই ছয়জন প্রাণত্যাগ করেন। নিহতদের নাম রবীন্দ্রনাথ সরকার, অজিত দে, নারায়ণস্বামী, ইয়াসিন, প্রভাবতী দেবী। পরদিন পুলিশের গুলিতে আহত সুশীল বসু (ডাঃ সহায়রাম বসুর পুত্র) হাসপাতালে মারা যান। সোমবার রাতে শিক্ষকদের গ্রেফতারের অব্যবহিত পর থেকেই পুলিশী সন্ত্রাস নেমে এসেছিল সারা কলকাতায়। ঐ দিনই শেষ রাতে ১৬৭ জন রাজনৈতিক কর্মীদের নিজ নিজ বাসস্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হাঙ্গামা সম্পর্কে মঙ্গলবার আবার ৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। খানা-তল্লাসী হয় বাড়ী বাড়ী। পুলিশ মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাসে সুপারিনটেণ্ডের বিনা অনুমতিতে ঢুকে হামলা করে। রাইফেল হাতে পুলিশ সেখানকার শিকল ও তালা ভেঙে ঘর-দুয়ার তছনছ করে ফেলে। সেখানে গুলি চালনা করে একতলার জানালায় বুলেটের চিহ্ন রেখে যায়। মেডিক্যাল কলেজ, মারোয়াড়ী হাসপাতাল ও নীলরতনে আহতদের ভর্তি করা হয়। অনেকেরই কণ্ঠার কাছে বুলেটের

ঘা দেখা যায়। সারা শরীর রক্তে লাল এই অবস্থায় নিহত ও আহতদের দেখা যায় প্রায় সকলের দেহে গুলি। ৫৭ জন গুরুতরভাবে আহত হন। এঁদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা ছিল সংকটাপূর্ণ। লাঠি ও টিয়ারগ্যাস ঘোড়ার লাথিতে অসংখ্য মানুষের মাথা হাত পা ভেঙ্গেছিল। এদের উদ্দেশ্যে বুক ফাটা কান্নায় অস্থির হয়ে যায় হাসপাতাল এলাকা। কান্না অনেক চোখে কিন্তু অনেকে আওয়াজ তুলতে ভয় পায়। যুবকেরা হাতে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বোন ভায়ের দুঃখে নিঃশব্দে অঝোরে কেঁদে চলে। ভয় সর্বত্রঃ শকুনের দৃষ্টিতে সাদা পোশাকে পুলিশ কোথায় লুকিয়ে আছে তাকেও ধরে ফেলবে। অনেক ছাত্র আহত হলেও হাসপাতালে ভর্তি হয় নি। আহত ছাত্র যুবকেরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে পারেনি। তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ। পুলিশ গত সোমবার রাতেই জ্যোতি বসুকে আটক করতে তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাস ভবনে যায়। তিনি ঐ রাতে তাঁর স্ত্রীর পিত্রালয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে ঐ সময়ে খবর চলে যায়। তিনি সহজে ধরা না দেবার সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষক ও গণ-আন্দোলনের বিষয়গুলি এবং এ সব কর্মীদের উপর ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিধান সভায় আলোচনা প্রয়োজন বুঝেছিলেন। একারণে ঐ দিন সুকৌশলে বিধান সভায় পৌঁছেছিলেন। অথচ বিধানসভা ভবনের চারপাশে রাইফেলধারী পুলিশ ও সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা ওৎ পেতে ছিল তাঁকে ধরতে। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর গাড়ী ঢুকে পড়বার পর সেখানে তাঁকে গ্রেফতার করা নিয়ে প্রচণ্ড শলাপরামর্শ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে সরকারী সিদ্ধান্ত হয় যে অধিবেশন মুলতবী হলে সে কাজ করা হবে। শ্রীযুক্ত বসু এই প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করলেন। তিনি তাঁর কাছে যতদিন গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহৃত না হচ্ছে ততদিন বিধানসভা ভবনেই থাকবার অনুমতি চান। কংগ্রেস সদস্যেরা এতে বিদ্রূপ করলে তিনি বলেন, "এটি অপর পক্ষের সদস্যদের হাসির ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে এটি গুরুতর প্রশ্ন এবং আমি বিনা বিচারে কারান্তরালে অবস্থান করতে রাজী নই। তা ছাড়া আমি বিশেষ করে বাজেট অধিবেশনকালে আমার কর্তব্য পালন করতে বিশেষ উদগ্রীব।" অনুরূপভাবে রণেন সেন ও হেমন্ত ঘোষাল স্পীকারের আশ্রয় চান। এর উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি। এই সভাগৃহ অধ্যক্ষের নয়। অন্য সদস্যদের যে অধিকার আছে আপনারও সে অধিকার আছে। যদি কোন সদস্য আমার আশ্রয় চান, তাহলে তিনি গ্রেফতারের হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন। অধ্যক্ষের এই রুলিং সরকার ও কংগ্রেস পার্টিকে চঞ্চল করে তোলে। এজন্য ডাঃ রায় অধ্যক্ষ শৈল কুমার মুখোপাধ্যায়কে পরে তিরস্কৃত করেন বলে জানা গিয়েছিল। এভাবে জ্যোতি বসু কিছু দিন বিধানসভায় থেকে যান। ঐদিন ব্যাপক হাঙ্গামা দমনে লালবাজারে পদস্থ পুলিশ অফিসারদের সভা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ঐ সভায় যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে মুখ্য সচিব এস. এন. রায় ও স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। ৫০টি ট্রাকে অসংখ্য আর্মড পুলিশ ব্যারাকপুর পুলিশ ছাউনি থেকে আনা হয়। রাত্রি সাড়ে আটটায় পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করতে সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়। রাত্রি ১১ টার পর অবস্থা শান্ত হয়। গভীর রাত পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী লালবাজারেই থেকে যান।

উন্নত আন্দোলন

শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শহরে এ রকম ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে এ কথা কেউই আন্দাজ করেনি। শিক্ষক নেতারা তো হতচকিত। কিন্তু মহৎ প্রেরণা থেকে যে আবেগের জন্ম হয় তা থেকে সমস্ত প্রতিকূলতা ভেদ করা যায় তার প্রমাণ মিললো।

এই অবস্থায় সংগ্রাম থেমে থাকলো না। কিছুকালের মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সেটি উন্নত আন্দোলনে পরিণত হলো। সেদিন অবস্থান থেকে শিক্ষকদের তুলে নেওয়ার সংবাদে শিক্ষকেরা আদৌ বিচলিত হননি। তাঁরা অনেক আগে থেকেই এ ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ঐ দিন দুপুরে কলেজ কোয়ারের সমিতি ভবনের সম্মুখে বহু শিক্ষক জমায়েত হয়েছিলেন। মফঃস্বল থেকেও কিছু শিক্ষক এসেছিলেন। তাঁরা জটলা করছিলেন এবং কি করা উচিত এই নিয়ে একমত হতে পারছিলেন না। অকস্মাৎ অল্প-বয়সী বিবাহিতা এক শিক্ষিকা শতাধিক শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা শুরু করলেন। ইনি বরাহনগর কুটিঘাট স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা বীণা চৌধুরী। জীবনে ইতিপূর্বে কোনদিন বক্তৃতা দেননি। তিনি আবেগ জড়িত হয়ে বলে চলেছেন, "এক অনিলা দেবীকে ওরা এ্যারেস্ট করেছে, ভয় নেই আমরা এখনও শত শত অনিলা দেবী রয়েছি। আসুন আমরা এখনই আবার অবস্থান শুরু করি।" তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেল রামাশীষ মিশ্রের নেতৃত্বে অবস্থানের ঠিক ঐ জায়গায় নতুন করে অবস্থান করা হবে। বেলা সওয়া দু'টায় সমিতির পতাকা হাতে ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা মিছিল করে ওল্ড কোর্ট স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে পেঁছিল। পুলিশ তাঁদের সেখানে গতিরোধ করলে তাঁরা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়লেন। বেলা পাঁচটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত যখন ঐ এলাকায় তাঁদের সম্মুখে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, তাঁরা নিশ্চুপ তার সাক্ষী হয়ে অবস্থান চালিয়ে গিয়েছেন। এই ছয় ঘন্টায় তাঁদের সংখ্যা ১৫০-এ পেঁছেছে। রাজভবন ও ইডেন উদ্যানের কোণায় জনতা পুলিশের এক ঘন্টার লড়াই হয়েছে। অসংখ্য কাঁদানো গ্যাসের সেল ফেটেছে। বিধানসভা, ডালহৌসী আর এসপ্লানেড এলাকায় দাঁড়াবার যখন কারো সাধ্য হয়নি এ সময়ে তাঁরা নিশ্চল হয়ে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। উপদ্রবের জন্য তাঁদের আহার্য সন্ধ্যায় কেউ দিতে পারেনি, মাথার উপরে ছাউনি নেই। রাতে আরও কত বিপদ হতে পারে। এই অবস্থায় রাত্রি আটটায় সাংবাদিকেরা তাঁদের এই সব ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। তাঁরা স্মিতহাস্যে জবাব দিয়েছেন, তাঁরা সত্যাগ্রহী। সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত। চারিদিকে নির্জন। ময়দানে কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁওয়া জমাট বেঁধে আসছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পোড়া ট্রামের পরিত্যক্ত লোহা কুড়ানো হচ্ছে। ধর্মতলা পেরিয়ে ওয়েলিংটন পর্যন্ত দারুণ পুলিশী তৎপরতা। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ী পাহারায় সান্ত্রীরা। অন্ধকারে তাদের মূর্তি প্রেতের মত দেখাচ্ছে। কোথাও কোথাও পিচের ড্রাম জ্বলছে। এই বিভীষিকার মধ্যে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাঁরা সেখানে অবস্থান চালিয়ে গেলেন। ঐ সময়ে তিনজন শিক্ষিকাসহ পঞ্চাশ জনকে পুলিশ জেলে নিয়ে গেল। কিন্তু তাঁরা রেখে দিলেন শিক্ষক সংগ্রামে অনন্য-সাধারণ অগ্রগামী বাহিনীর আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ এই অসাধারণ ঘটনা শিক্ষক আন্দোলকে অনির্বাণ শিখায় স্থাপিত করেছিল।

সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলো। হাঙ্গামাকারীরা বার খানা স্টেট বাস ও ট্রামে অগ্নিসংযোগ করেছে। বিভিন্ন স্টেট বাসের উপর এবং রাস্তায় আক্রমণ চালিয়েছে। করপোরেশন বিল্ডিং ও চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবন এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। হাঙ্গামার দরুন ৬০ জন লোক আহত হয়েছে। এর মধ্যে একজন পুলিশ সার্জেন্ট, একজন এ-এস-আই, তিনজন কনস্টেবল ও মাউন্টেড পুলিশ এবং কয়েকটি ঘোড়া রয়েছে। পুলিশ ঘটনার সূত্রে ৪৪ জনকে গ্রেফতার করেছে জানানো হলো। ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় একটা মহল ভাবলেন হিংসাত্মক ঘটনা প্রবাহে শিক্ষক আন্দোলন চেপ্টে গেল। কোন সংবাদপত্র পরদিনই প্রকাশ করলো শিক্ষক আন্দোলন বিস্মৃতির অতলে চলে গেল। বত্রিশজন বিধানমণ্ডলীর সদস্য ও শিক্ষাব্রতীরা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের

স্বাক্ষরের নীচে নাম রেখে সেদিনই বিবৃতি প্রচার করলেন, 'শিক্ষক আন্দোলন রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হওয়া উচিত নয়।' প্রধান শিক্ষক সমিতির জ্যোতি বিকাশ মিত্র, কামিনী কুমার ঘোষ, ধরণী মোহন মুখার্জী এবং বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা রেখে ধর্মঘট থেকে শিক্ষকদের সরে আসতে আবেদন করলেন। কিন্তু 'ধর্মঘট চলতে থাকবে' এই মর্মে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ঘোষণা করলেন। তিনি বিবৃতি দিলেন, "মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকরা যে দাবী করেছেন, গভর্নমেন্ট সে দাবী মঞ্জুর করেননি। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস অবস্থান ধর্মঘটী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রেফতার করে সেই দাবীর উত্তর দিয়েছেন। এখন এই আন্দোলন আর শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জনসাধারণ শিক্ষকদের পক্ষ সমর্থন করছেন। যে পর্যন্ত না ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া হবে ও শিক্ষকদের দাবী মঞ্জুর করা হবে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। আর একদল শিক্ষক যে রাজভবনের পূর্বদিকের গেটের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ করেছেন তাতেই প্রমাণ হয় যে শিক্ষকেরা দমননীতিতে ভীত হন নাই; আগামীকাল আরও শিক্ষক তাঁদের সংগে যোগ দেবেন"। ঐ দিনই বিকালে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের আরও সুযোগ-সুবিধা দানের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নতুন ঘোষণা ছিল সরকার ম্যানেজিং কমিটি নিরপেক্ষ হয়ে মাসে সাড়ে সতেরো টাকা ডি. এ. দিয়ে যাবে এই সিদ্ধান্ত। এর ফলে শর্ত পূরণের অপেক্ষা না করে '৫৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ঐ টাকা পাওয়া যাবে এবং ম্যানেজিং কমিটির দেওয়া ১০ টাকা ডি. এ. সহ প্রতি শিক্ষক সাড়ে সাতাশ টাকা প্রতিমাসে পাবেন। আগামী বছর জানুয়ারী মাস থেকে তাঁদেরকে দশ টাকা থেকে সাড়ে সতেরো টাকায় আনার প্রতিশ্রুতিও সরকার দিয়েছিলেন। ঐদিন ঘোষণা করা হয় শিক্ষণ-বিহীন গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বেতন পাঁচ টাকা নয় দশ টাকা বাড়ানো হবে। ডাঃ রায় জানান, গভর্ণমেন্ট তার সামর্থ্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন।

অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্কুল কলেজে পর দিন ধর্মঘটের আহ্বান রাখা হয়েছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে শহীদবেদী তৈরী হলো এবং মাল্যদান করা হলো। সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সমিতির পক্ষে নিহতদের উদ্দেশ্যে গভীর শোক প্রকাশ করলেন এবং মৃত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানালেন। আহতদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি এজন্য সরকারকে দায়ী করে আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সমিতির কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বললেন বিনা শর্তে কারাগারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষক আন্দোলন গতি পরিবর্তন করবে না। বর্তমানে ছাত্রদের শিক্ষার যে ক্ষতি হচ্ছে তা দীর্ঘ অবকাশ সংক্ষিপ্ত করে পূরণ করা হবে, জানালেন। সেদিনের সমস্ত পত্রিকাগুলি শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করে সরকার ভাল কাজ করেননি বলে সম্পাদকীয় রচনা করেছিল। কলকাতার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এটা দায়ী বলে তারা মন্তব্য করেছিল। গ্রেফতারের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগসুবিধাদানের নতুন ঘোষণা এর বৈপরীত্যমূলক কাজ বলে বর্ণনা করেছিল। সেদিন সকাল থেকে খোলা গাড়ীতে মিলিটারী রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। তারা রাইফেল উদ্যত করে লোকজন এবং বাড়ীগুলির দিকে তাক রেখে চলছিল। বৃটিশ শাসনেও একমাত্র আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাড়া ইতিপূর্বে কোনদিন এমন সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্বদিন রাত থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার শুরু হয়েছিল। কলকাতায় মোহিনী দাস, নন্দ শ্রীমানী, বিমলানন্দ মুখার্জী এবং ভাটপাড়ার সেবাব্রত বিশ্বাসের বাড়ী তছনছ করা হল। পুলিশ সকল দলের আস্তানাগুলিতে খানা-তল্লাসী

করে পাড়াগুলি অস্থির করে তুলেছিল। ১৭ই তারিখ গ্রেফতার হলেন মোহিত মৈত্র, লীলা রায়, সন্দীপ শেঠিয়া, বিভূতি ঘোষ, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, শিবদাস ঘোষ, অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জী, হীরেন দাসগুপ্ত, বেলা লাহিড়ী (সোমনাথবাবুর স্ত্রী) প্রমুখেরা। বেঙ্গল ভলানটীয়ার্সের অফিসে পুলিশ তালা ঝুলিয়ে দিল। ইতিমধ্যে যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে রাজ্যজুড়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। সেদিন শিলিগুড়িতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। দমননীতির প্রতিবাদে সর্বস্তরের শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। বাঁকুড়া শহরে সেদিন ও তার পর দিন প্রবল প্রতিবাদ ও জনসভা হয়। জলপাইগুড়ি শহরে মন্ত্রী খগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্তের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় বিধায়কের বাসভবনে বিক্ষোভ দেখায়। বিজয়গড় ময়দানে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সাধারণ মানুষের এক বিক্ষোভ সভা হয়। স্থানীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বায়ক শ্রীশচীন সেন এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষকদের নিগ্রহের প্রতিবাদে সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সৌভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করে এ-আই-টি-ইউ-সির তারবার্তা আসে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। অর্ধশতাধিক অধ্যাপক পৃথকভাবে এক প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সমিতিগুলির সংহতিজ্ঞাপক তারবার্তা ও পত্র আসে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ট্রাম মজদুর ইউনিয়নের প্রতিবাদের লিপি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংসদের পশ্চিমবঙ্গের ছয়জন সদস্য রেণু চক্রবর্তী, হীরেন মুখোপাধ্যায় ও ভূপেশ গুপ্তের নেতৃত্বে সহকারী শিক্ষামন্ত্রী কে. ডি. মালব্যের সঙ্গে এ বিষয়ে সাক্ষাৎকারের সংবাদ পাওয়া যায়। এসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল মুখার্জী, ডাঃ এম. এম. চক্রবর্তী, হীরেন বসু, ডঃ সুশীল কুমার বসু এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। খড়গপুর ও গোবরডাঙ্গায় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। পেপসু থেকে নির্বাচনী প্রচার সেরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নয়াদিল্লী পৌঁছেই কলকাতার সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর নেন। সেদিন কলকাতায় বড় ধরনের কোন হাঙ্গামা ঘটেনি। কিন্তু অবস্থা সর্বত্র নিরুপদ্রব ছিল না। সকাল বেলায় ভবানীপুরে রাস্তা অবরোধে বাধা অপসারণের চেষ্টা হলে সেখানে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। জনতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ তারা ট্রাম লাইন তুলতে শুরু করে। পুলিশ তাদের তাড়া করে ছত্র-ভঙ্গ করে দেয়। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বিদ্যাসাগর কলেজের সম্মুখে পুলিশের গাড়ী আক্রান্ত হয়। শ্যামবাজারে বোমা ফাটে। গত রাতে একটার সময় পুলিশ কমিশনার সারা কলকাতায় ১৪৪ ধারা বলবৎ করেন। তার আগেই এসবের প্রতিবাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করেছিল ১৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বেলা সাড়ে তিনটায় প্রতিবাদ সভা হবে। দুপুর থেকেই পার্কটির দখল নিতে পুলিশ এগিয়ে আসে। এসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ তার দলবল দিয়ে পার্ক থেকে সবাইকে বের করে দেয়। তবু বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ পার্কের আশেপাশে ইতস্তত জমে ছিল। জনতার সিদ্ধান্ত ছিল আইন অমান্য করেই তারা সেখানে সভা করবে। বিকেল পৌনে পাঁচটায় একসঙ্গে দুটি দল ফেস্টুন ও পতাকা নিয়ে পার্কে প্রবেশ করে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তখন লক্ষ্য করা যায় জনতার মধ্যে সাদা পোশাকের অনেক গোয়েন্দা রয়েছে এবং তারাই গ্রেফতারে তৎপরতা নিচ্ছে। এর পর সেখানে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। আশে-পাশের রাস্তাগুলি থেকে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। গোকুল বড়াল স্ট্রীট ও ক্রীক্‌রো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে। তারা ফেলে ঢিল আর ক্রেকার। পুলিশ তাড়া করলে এরা বাড়ী বাড়ী লুকিয়ে পড়ে। তারা

চলে গেলে আবার স্লোগান তোলে। এক ঘন্টা ধরে গেরিলা পদ্ধতির এ লড়াই দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে এ পদ্ধতির লড়াইয়ের সংবাদ দিয়ে রাজ্যের বাইরের সংবাদগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করে। ঐ দিন বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐদিন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। তাঁদের কার্যালয় থেকে পতাকা সহ এক একজন ডালহৌসী স্কোয়ারে বাস থেকে নামেন। তাঁরা একত্র হয়ে ধ্বনি দিতে দিতে আইন অমান্য শুরু করে দেন। ঐ দিন এমনভাবে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কারাবরণ করেন। এ'দের মধ্যে দশজনই ছিলেন শিক্ষিকা। এ'রা শান্তি রায়, অঞ্জলী গাঙ্গুলী, অনিমা দত্ত, ছায়া ব্যানার্জী, লীলা ভট্টাচার্য, তারা ব্যানার্জী প্রমুখ। মফঃস্বলের শিক্ষক-শিক্ষিকার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল। কলকাতা উপদ্রুত। অথচ তাঁরা সেখানে এসে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এটি বিস্ময় সৃষ্টি করে। শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে পি. এস. পি. দলের ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সেদিন পৃথকভাবে আইন অমান্য করে জেলে যান। পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী আইন অমান্যের দ্বিতীয় দিনও অনুরূপভাবে পালিত হয়। সেদিন বেলা ১০টার সময় পাঁচজন সত্যাগ্রহী ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে সমবেত হন। তাঁরা স্লোগান তোলেন—'শিক্ষকদের দাবী মানতে হবে' 'বিনা শর্তে শিক্ষকদের মুক্তি দিতে হবে' প্রভৃতি। ফেসটুন বহন করে রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চিম কোণে এগিয়ে যান। কেউ বাধা না দেওয়ায় তাঁরা গির্জার দিকে এগিয়ে আসেন। এ সময়ে নেতাজী সুভাষ রোডের দিক থেকে পুলিশের গাড়ী আসছিল। তাঁরা আবার দিক পরিবর্তন করে পুলিশ ভ্যানের দিকে শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন। জনৈক কনস্টেবল এক শিক্ষককে ঘাড় ধরে ভ্যানে তোলে। দ্বিতীয় দলটি বেলা ৫টায় রাইটার্স বিল্ডিং-এর সম্মুখে পেঁছায়। ঐ দলে ছয়জন শিক্ষক ছিলেন। রাইটার্সের পূর্ব কোণে পেঁছে তাঁরা বক্তৃতা শুরু করে দেন। লোকজনের ভীড় হয়ে যায়। তাঁরা 'শেম' 'শেম' ধ্বনি তোলে। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে লালবাজার নিয়ে যায়। সহানুভূতিসূচকভাবে পি. এস. পি. থেকে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক দ্বিতীয় দিনে কারাবরণ করে।

সেদিন শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে দেশ-বিদেশের আরও তারবার্তা এসে পেঁছয়। কটকের একদল ছাত্র, যোধপুরের একদল শিক্ষক তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। রাজস্থান টিচার্স ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচার্স ইউনিয়নের সভাপতি বিদেশ থেকে শিক্ষক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে তার পাঠান। শিক্ষক আন্দোলন ও তার সাথে কলকাতার হাঙ্গামার খবর রয়টার সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। বিশ্বের প্রখ্যাত সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতারা কলকাতা থেকে নিজ নিজ পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। খবর প্রচারিত হয় লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকা থেকে। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস্' দু'দিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, একদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে সংবাদ ছাপিয়ে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। তাতে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর নামও উল্লিখিত হয়। কলকাতার বাইরে দেশের সমস্ত দৈনিক পত্রিকা একাধিক দিন এ বিষয়ে সম্পাদকীয় রচনা করে। ওদিকে বিধান সভায় প্রতিদিন আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষক ধর্মঘটের প্রসঙ্গ উঠে, শিক্ষকদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে জনসাধারণের সাহায্য কামনা করে এক মহতী সভা হয়। সারা কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারী থাকবার জন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সভা ডাকা হয়েছিল। বিস্তীর্ণ হলের ভিতরে উপরে নীচে, হলের বাইরে ও রাস্তায় লোক ধারণের কোন স্থান ছিল না। এই অবস্থায় শ্রোতারা দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য শোনেন।

সভার সভাপতি অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, ডঃ ফুলরেণু গুহ, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ দশজন বক্তা বক্তৃতা দেন। সভায় নিরুপদ্রব অবস্থান ধর্মঘটীদের উপর পুলিশী প্ররোচনাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়। নিহতদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। সারা দেশে শিক্ষক আন্দোলন যে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছে তার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানানো হয়। সরকার বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সেগুলি সহ তাদের হিংসাত্মক ঘটনাগুলি বিবৃত করা হয়। এই কৃতকর্মের জন্য তাঁদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়। সভা সর্বশেষে আশা প্রকাশ করে জনগণের সমর্থনে শিক্ষক আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই। সেদিনও সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সমন্বয় কমিটি কলকাতার দু'স্থানে সভা আহ্বানের ডাক দেয়। হাজরা পার্ক ও আজাদ হিন্দ্ বাগ সভার স্থান হিসাবে ঘোষিত হয়। জনতা উভয় স্থানেই ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করতে অগ্রসর হয়। পুলিশ ও সৈন্যদল দুই স্থানেই কড়া পাহারা বসায় এবং সভার উদ্যোগীদের মধ্য থেকে যথাক্রমে পাঁচজন ও আটজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ও মিলিটারী রাজপথে টহল দেয়। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় একজন কনস্টেবল আহত হন। গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশী তৎপরতা সমানে চলে। বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মহঃ ইসমাইল গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন মনোরঞ্জন রায়, নীরদ চক্রবর্তী, পতিত পাবন পাঠক, ঋষি ব্যানার্জী, নসরুল্লা, মার্কেণ্ডেয় ঝা। ঐ দিন নীহার মুখার্জী, রমেন ব্যানার্জী, দিলীপ সিংহ, মনি চক্রবর্তী, শম্ভু ঘোষ, চিত্ত বসু, রাতুল চৌধুরী, অশোক ঘোষ, কানাইলাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আবার আশী জন অধ্যাপক এগিয়ে আসেন। আরামবাগ কলেজের শিক্ষকেরা তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। রাজ্যের মধ্যে গ্রামাঞ্চলেও প্রতিবাদ সভা হয়। তাতে কালিয়াগঞ্জের জনসভা উল্লেখ্য। শিক্ষকদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে এক বিবৃতি প্রচার করেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জে. সি. গুপ্ত।

১৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ট্রাম-বাস সন্ধ্যা পর্যন্ত চলাচল করে। পুলিশ ও মিলিটারী অভিযান অব্যাহত থাকে। রাইটার্সের সম্মুখে দু-বেলায় ৩ জন শিক্ষিকা ও দশ জন শিক্ষক আইন অমান্য করেন। ২৪ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের শিক্ষকেরাও এতে যোগ দেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে জনসভা করতে উদ্যোগী হয়। সেখানে সংঘর্ষের ফলে কনস্টেবলসহ বারো জন আহত হয়। উত্তর কলকাতার এক স্থানে পুলিশ গুলী চালায়। প্রেস-নোটে ইট, ঢিল ও বোমা ছোড়ার ছয়টি ঘটনা দেওয়া হয়। মির্জাপুর স্ট্রীটে অবরোধ সৃষ্টিতে পুলিশ ১৯ জনকে গ্রেফতার করে। সেদিন মোট ৭৫ জনকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ২৫ জন ছিলেন নিবর্তন-মূলক আটক আইনে বন্দী। সরকার এই কয়দিন হাঙ্গামায় কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে বলে জানান। দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে নাট্যকার, সংগীতশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও চিত্রশিল্পীরা প্রতিবাদে মুখর হলেন। চিত্র পরিচালক বীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রখ্যাত অভিনেতা উত্তম কুমার, শব্দযন্ত্রী অনিল বরণ ও আরও কয়েকজন ঘোষণা করলেন, "বাংলা দেশের শিক্ষকদের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ে পেঁছেছে। এই অবস্থায় কোন শিক্ষিত লোকই নীরব থাকতে পারে না। শিক্ষকগণ গত পাঁচদিন ধরে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না করে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তার প্রতি কোন নাগরিক আর উদাসীন থাকতে পারে না। সরকার সম্প্রতি তাঁদের গ্রেফতার করে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে তা আর কখনো ঘটেনি।" ঐদিন কর্পোরেশনের সভা

শুরু হলে সংযুক্ত নাগরিক পরিষদের সদস্যেরা শিক্ষকদের গ্রেফতার ও পুলিশের গুলী চালানোর ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার দাবী তোলেন। চূড়ান্ত বিশৃংখলার মধ্যে সে সভা সমাপ্ত হয়। ২০শে বুধবার কলকাতা স্বাভাবিক হয়। সারাদিন সমস্ত পথে ট্রাম-বাস চলে। সেদিন মিলিটারী আর দেখা যায়নি। সমন্বয় কমিটির আহ্বানে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও বেলেঘাটা সুভাষ পার্কে জনসভা করবার প্রচেষ্টা চলে। পুলিশ উভয় স্থানেই বাধা দেয় এবং ঐ দুই স্থান থেকে যথাক্রমে ৬ জন ও ৩ জনকে তুলে নেয়। সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে ৭ জন গ্রেফতার হন পুলিশকে আক্রমণ করবার অভিযোগে। গ্রেফতার হন সুধীর মুখার্জী, রবীন মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মজুমদার, ধীরেশ সান্যাল, বরদা মুকুটমণি এবং ডেমোক্রাটিক পার্টি ও আর. এস. পির কিছু কর্মী। ঐদিন নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চতুর্থ আইন অমান্য দিবসে ১০ জন শিক্ষক কারাবরণ করেন। এই নিয়ে আইন অমান্যে কারাবরণকারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯২ জন। এর মধ্যে ৪৭ জন ছিলেন শিক্ষিকা। পি. এস. পি. থেকেও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবী কারাবরণ করে। তাঁরা জানান যতকাল শিক্ষক আন্দোলন চলবে ততদিন তাঁদের দল থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা এই কাজ করে যাবে। কিঞ্চিৎ অধিক ১৬০০ ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে। শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন প্রায় নয়শত জন। অন্যান্য ৭৭৫ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। ২০শে ফেব্রুয়ারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষক দিবস শহীদ দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। জেলখানায় আটক ব্যক্তিরাও সেদিন এক বেলা অনশনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নিহত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। মালদহের গাজোল স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকেরাও এই কর্মসূচী পালন করে। ঐ দিন কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে অধ্যাপকদের সভায় পাঁচজন অধ্যাপক বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। হাওড়া টাউন হলে যে বিরাট সভা হয় সেখানে হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, অযোধ্যা নাথ অধিকারী, সুশীল ঠাকুর, ডঃ মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিভূতি নন্দী, রমাপ্রসাদ মজুমদার বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন হরিপদ ভারতী। প্রধান বক্তা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, 'ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে রয়েছে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাতে বুঝেছি আমাদের শিক্ষাদান ব্যর্থ হয়নি।' ঠিক ঐ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় পুলিশ-এর লাঠি, গুলী এবং কাঁদুনে গ্যাস চালানোর তীব্র নিন্দা করা হয়। ঐ সভা থেকে কলকাতায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা অমিতাভ সেন (বর্তমানে সমিতি পত্রিকার সম্পাদক)।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে নৃশংস পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদে সেদিন ত্রিপুরার আগরতলায় ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ও জনতার মধ্যে এই উপলক্ষে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তাতে ৪০ জন ছাত্র আহত হয়। এ সংবাদ দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এ সবের মধ্য থেকে শিক্ষক আন্দোলন যে আপন গতিতে নির্বিকারভাবে চলছিল এ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে।

প্রচন্ড বাঁকের মুখে পড়েও সঠিক পথ রচনা করে সমিতি যেভাবে এগিয়ে চলছিল তাতে তার বিজয় আসন্ন সেটি অস্পষ্ট ছিল না।

দশ

সংসদীয় লড়াই

শিক্ষক আন্দোলনে লড়াই পর্যায়ক্রমে আদালতে, বিধানসভা ও সংসদে গিয়ে পৌছল। সংগঠকেরা ও সহযোগীরা উপলব্ধি করলেন আন্দোলনকে উচ্চে নিয়ে যেতে হলে দৃঢ়তার সঙ্গে এসব স্থানেও লড়তে হবে। এ কারণে প্রতিদিন সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অধিকার-গুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের এক চিত্তাকর্ষক নজির স্থাপিত হয়েছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নতুন কায়দার লড়াই শিক্ষক আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনেছিল। শুধু মাত্র নতুন কিছু লাভের জন্য নয়, সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অবজ্ঞা করে আসছেন এবং তার কাজের মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্র কিভাবে আসছে সেগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বক্তারা এই সব জায়গায় উপস্থিত করেন। শিক্ষক আন্দোলন সূত্রে গণতন্ত্র রক্ষার এই লড়াই তাৎপর্য লাভ করে। বস্তুতঃ এখানকার সংবাদগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার ফলে আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিচিতি পায়। এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয়তার সৃষ্টি হয়। অবশেষে সমস্ত পরিস্থিতি শিক্ষক আন্দোলনের সপক্ষে এসে যায় এবং সফলতা লাভের দিকে এগিয়ে আসে। সংসদীয় লড়াইয়ের গুরুত্ব কতটুকু তার মূল্যায়ন এবং ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বিষয়গুলি উপস্থিত করা হলো।

আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে

অবস্থানকারী ধৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৩ নং ধারা এবং কলকাতা পুলিশের ৬২ "এ" ধারা প্রয়োগ করা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৪৪ জন ধৃত শিক্ষকদের এই উদ্দেশ্যে আদালতে হাজির করা হয়। মহিলাদের বিচার শুরু হলে আদালত আইনজীবী ও অন্যান্য লোকজনে পূর্ণ হয়ে যায়। উকিল ঐ সব আইনের ব্যাখ্যা করে আসামী পক্ষ সমর্থন করে বলেন এ অভিযোগ টিকতে পারে না কেননা বাধাদান সম্পর্কে কোন লোক-এর কোন অভিযোগ নাই। এটি তাঁদের আন্দোলন এবং ব্যাপকভাবে জনসমর্থনপুষ্ট হয়েছে। কিরণবালা রায় নামে একজন বৃদ্ধা মহিলা বলেন যে তিনি বিদালয়ের শিক্ষিকা নন। কিন্তু আন্দোলনের সমর্থক। কলকাতার রাজপথে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বালক-বালিকারা যে দুঃখ ভোগ করছিল তার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। তাদের সংগে অংশভোগী হবার জন্যই তিনি অবস্থানস্থলে ছিলেন। তাঁরা সকলে ব্যক্তিগত জামিন নিতে অস্বীকৃত হন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এন. সি. চ্যাটার্জীর আদালতে শ্রীমতী অনিলা দেবী ও ৪৩ জন মহিলার বিরুদ্ধে শুনানী শুরু হয়। অভিযুক্তা মহিলাদের পক্ষে সওয়াল করেন এডভোকেট অশোক কুমার মুখার্জী। তাঁদের পক্ষে ভূপেন মুখার্জী, বিজয় ব্যানার্জী, রামনাথ সেন, মধুসূদন পাল, এস. এস. সরকার প্রভৃতি ব্যবহারজীবী সমর্থন ঘোষণা করেন। তাঁরা আদালতে বলেন প্রকৃতপক্ষে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। শিক্ষকেরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাজপথে বসেছিলেন। নিজেদের নির্দিষ্ট দাবীর প্রতি সরকারী উপেক্ষা দূর করবার জন্য এ ভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তাঁদের কোন বিকল্প পথ ছিল না। পক্ষান্তরে সরকার পুলিশ বেষ্টনী তৈরী করে জনসাধারণের গমনাগমনের বাধা তৈরী করে তার প্রমাণ আছে। জনসাধারণকে যেতে পুলিশই বাধা দেয়। উপরন্তু ঐ রাজপথের বিশেষ কোন্ অঞ্চলে তাঁরা এমন অপরাধ-মূলক কাজ করেছেন তার উল্লেখ অভিযোগপত্রে নাই। মহিলারা সম্মিলিতভাবে এ কাজ করেছেন তারও প্রমাণ নাই। কাজেই একযোগে তাঁদের বিচার হতে পারে না। পরদিন ঐ এজলাসে

আবার মামলার কাজ শুরু হয়। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেত্রী সাগরিকা ঘোষ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত এক বিবৃতি পেশ করেন। শিক্ষক আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে এই সব কারণে কোন অপরাধ তিনি করেন নি। "যে অবস্থায় আমি ধৃত হয়েছি তা পুলিশেরই সৃষ্টি"। ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রায়দান স্থগিত থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঐ আদালতেই সত্যপ্রিয় রায় এবং আরও ৬৩ জন শিক্ষককে ২৮৩ ধারামতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁরা ট্রামের গতিরোধ করেন নাই বলেন এবং নিষিদ্ধ এলাকার ১৫০-২০০ গজ দূরে নিজেদের আন্দোলন করেছিলেন জানান।

সত্যপ্রিয় রায় অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন যে আইনসম্মতভাবে তাঁদের আটক করা হয়নি। রমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেন তাঁদের দাবী জানাবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন। একে অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। উকিলদের জেরার মুখে পড়েন হেয়ার স্ট্রীট থানার অফিসার ইনচার্জ। তিনি স্বীকার করেন রাজভবনের সম্মুখে অবস্থানের আগে তাঁরা কোথাও ট্রামের গতিরোধ করেননি। দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ এলাকার ১৫০-২০০ গজ দূরেই তাঁরা অবস্থান করছিলেন। তাঁরা কোন ফুটপাতও ব্যবহার করেননি। অবস্থানকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের সংগে তাঁর বক্তব্যের অনেক অমিল ঘটে। বিচারক ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রায়দান স্থগিত রেখে বিচারের কাজ শেষ করেন।

বিধানসভায় সর্বশেষে অনাস্থা প্রস্তাব

১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধানমণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনের ঘটনাক্রম পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। তার আগের রাতে অবস্থানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় হেমন্ত বসু ও জ্যোতি বসু অধিবেশনের সূত্রপাত হলেই মুলতবী প্রস্তাবের পৃথক পৃথক নোটীশ দেন। স্পীকার জানান এই প্রসঙ্গে আগামী তিনদিন আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। বিধানসভার সম্মুখে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস চালানো এবং হাঙ্গামা সম্পর্কে ঐ দিন সদস্যেরা তাঁদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বিবরণ সভাস্থলে দিয়েছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী জ্যোতি বসু পুনরায় মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশ বিধানসভায় উপস্থিত করেন। তিনি বলেন শিক্ষক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। তথাপি গভীর রাতে ব্যাপক পুলিশ আমদানী করে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে আরও একটি ঘোষণা করেছেন। অথচ ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। নাগরিকেরা শিক্ষকদের দাবী সমর্থন করছেন। অথচ পর পর কলকাতায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। সরকার পক্ষের এ রকম হিংসাত্মক কাজকর্মের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই বিষয়টি গুরুতর বিষয় বলে বিবেচিত হোক এবং সভাকক্ষে তার আলোচনা হোক। চীপ হুইপ দেবেন দে এর বিরোধিতা করেন। স্পীকার মুলতুবী প্রস্তাবের পক্ষে কতজন সদস্য রয়েছেন জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ৫০ জন সদস্য উঠে দাঁড়ান। তখন তিনি ঘোষণা করেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ৩টায় এ বিষয়ে আলোচনা হবে। তার আগের দু'দিনও বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে এ প্রসঙ্গেও তাঁদের অভিমত সভায় ব্যক্ত করেন। বাজেট অধিবেশনে বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ পাশের জন্য আলোচনায় এমন কি পরবর্তীকালে ৫ই মার্চ শিক্ষক আন্দোলনে হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে সদস্যেরা নিজ নিজ মতামত জানান। সেদিন বিধানসভায় বঙ্কিম মুখার্জী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুলিশ সুবোধ ব্যানার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সমর গুহ, নির্মল ঘোষ প্রভৃতির উপরও

যে নির্মম ব্যবহার করেছে তার বিবরণ দেন। শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "চার পাঁচ দিন পর্যন্ত তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ সেই অবস্থার পরিবর্তন করা হল। সেদিন ১৪৪ ধারা জারী করা হল যাতে এর অজুহাত দিয়ে তাঁদের আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়া যায়।" তারপর তাঁদের উপর আঘাত করা হয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আঘাত করবার পূর্বে তাঁদের এরেস্ট করা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করি যাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গল তাঁদের কেন মারা হল? কোন্ পুলিশের কোন্ অধিকার আছে যে এই রকমভাবে তাঁদের মারলো? যাঁরা আইন ভঙ্গ করে তাঁদের মারবার কি পুলিশের অধিকার আছে? পুলিশ ইচ্ছা করলে তাঁদের গ্রেফতার করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশেরা এই নীতি মানতো না। তার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে তাদের নিন্দা করা হতো। আজকেও সেই পুলিশের মনোভাব কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সেদিন যখন ময়দানে টিয়ার গ্যাস চলছে তখন সাধারণ কনস্টেবল বলছিল, 'আমরা শুধু হাতে কি করবো আমাদের আর্মস দেওয়া হোক।' হয়তো এদের সেই পৈশাচিক মনোভাব দূর হয়নি এবং এদের মনোভাব এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে তারা জনসাধারণকে গুলি করবার জন্য আর্মস চেয়ে পাঠিয়েছিল। লাঠিচার্জ করা হয়নি বলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হলে প্রবীণ সদস্য দাশরথি তা বলেছিলেন, 'আমি নিজ চক্ষে দেখে এসেছি, এরপরেও কি বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁদের উপর লাঠিচার্জ হয়নি?' এই সব ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে তার আগের দিন বরাদ্দ আলোচনায় বিধানসভায় তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ছড়া শুনিয়েছিলেন—

(মোদের) জনপ্রিয় মন্ত্রীদল
যেরূপ হয়েছে হাল
কথায় কথায় চালাইছেন গুলি।
শুধু গাঁজায় নাহি হবে
আফিং মিশাতে হবে
তবে গাঁজা হতে পারে 'গুলী'।

জনসাধারণ-এর প্রতি লাঠিচার্জ ও গুলি চালনা সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় তুলে জ্যোতি বসু ইংরাজীতে বলেন—এই ব্যাপারে সুখের কথা ন্যূনপক্ষে বিরোধী সদস্যেরা আজ একতাবদ্ধ। আটদিন ধরে শিক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে আছে। ৬ জন মানুষ মারা গিয়েছেন। বিগত ছয় বছর বার বার এই ঘটনাগুলিই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার জনগণকে উচিত শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। সরকারের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা এখানে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার কয়েকবার তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সুবিধা দেওয়ার তৃতীয় ঘোষণা কিভাবে এসেছে? বেলা একটার সময় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ডাঃ রায় পুলিশ কমিশনার মাধ্যমে যখন সারা কলকাতা জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করছেন ঠিক সে সময়ে এটি ঘোষিত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের কাছে পৌঁছল না। কেন না, তার আগের রাতে পাঁচশত পুলিশ তাঁদের সকলকে জেলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রস্তাবটি জেলে কিংবা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা বোধ করা হয়নি। একই সময়ে যখন এখানে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন তখন ডাঃ রায় পুলিশকে শিক্ষক ও কলকাতার নাগরিকদের উপর লেলিয়ে দিচ্ছেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, এ কারণে সরকারকে বিশেষতঃ ডাঃ রায়কে নিরপরাধ নাগরিকদের ঠাণ্ডা মাথায় বেপরোয়া ঘাতক হিসাবে অভিযুক্ত করতে চাই। মহাশয়, বার বার তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ক্ষতিসাধন করেছেন। প্রতি দু' তিন মাসে এই ভদ্রলোক এখানেই থাকুন কিংবা ভারতের অন্যত্র অথবা বিদেশে তিনি

দেশের শান্তি বিঘ্নিত করেছেন। তাঁরা গণতন্ত্র এবং সরকারের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে চলেছেন। এই কারণে কেবলমাত্র বাইরের জনগণের কাছে নয় আসন গ্রহণকারী সদস্যদের প্রতি, সকলে নাও হতে পারেন, আমার আবেদন তাঁরা অনুগ্রহ করে এটি বুঝবেন এবং আজকে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে আছেন তাঁদের চিনবেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি আমার আবেদন এই সব অপরাধী ও ঘাতকদের যারা রাইটার্সে ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে তাদের উৎখাত করবেন। তাদের হাত, মশায়, নির্দোষ নাগরিকের রক্তে লাল হয়ে আছে এবং শয়তানী হৃদয় প্রতিহিংসায় ভরে আছে এবং এই কারণেই তারা কলকাতায় পুলিশ আর মিলিটারী লাগিয়ে দিয়েছে।

স্পীকার—সদস্যদের প্রতি লক্ষ্য করে আপনি আপনার কথায় অপরাধী ও ঘাতক ব্যবহার করেছেন, এগুলি পার্লিয়ামেন্টারী শব্দ নয়।

জ্যোতি বসু—সদস্য এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি বলিনি। আমি বলেছি এমন যদি ভদ্রলোক ক্ষমতায় বসে থাকেন।

স্পীকার—বিরুদ্ধ (কংগ্রেস) পক্ষের ভদ্রলোকদের আপনি ঘাতক বলেছেন।

জ্যোতি বসু—আমি তা বলিনি। আপনি সভার বিবরণ দেখতে পারেন। ওদিকে যারা বসে আছেন সাধারণদের ঘাতক এই লক্ষ্য নিয়ে আমি বলিনি (বাধাদান, চিৎকার না বাইরে তাঁরা আমাদের লোককে হত্যা করছেন। এর জন্য দায়ী কে (চিৎকার 'তোমরা' গোলমাল)? স্পীকার সময় শেষ বললে, জ্যোতি বসু সভায় বলে চলেন, তাঁর আবেদন সরকার সর্বশেষ যে সুযোগ দানের নীতি ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হোক। এরপর শ্রীকুমার ব্যানার্জী, শংকর প্রসাদ মিত্র, সুধীর রায়চৌধুরী এবং জে. সি. গুপ্ত আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঝাড়ুদারদের চাইতে, আর্দালীদের চাইতেও শিক্ষকেরা কম বেতন পাচ্ছেন। এ ব্যাপারটা বাংলাদেশের লজ্জার বস্তু। এঁরা হতভাগ্য শিক্ষক, তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র অন্তঃকরণের। তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হোক। শিক্ষকেরা আইন অমান্য করবেন বলে হুমকী দিয়েছিলেন। তার ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে আশঙ্কায় সরকার তাদের বন্দী করেছেন এই যুক্তিকে খণ্ডন করে হেমন্ত বসু বলেন, শিক্ষকেরা আইন অনুসারে চারজন করে ন্যায়সংগতভাবে দাবী জানাবার জন্য আইন ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। কালী মুখার্জী মুলতবী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এখনও সময় আছে। সাবধান হোন। যাদের ধরেছেন তাদের সব ছেড়ে দিন। চলুন সকলে মিলে এই শিক্ষকদের যারা চিরদিন লাঞ্ছিত, যারা বাস্তবিক খেতে পায় না—তাঁদের কাছে যাই......সব মিটে যাবে।"

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়-এর বক্তব্য। তিনি বলেন যে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট ১০৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছিল। যদি অবস্থানের জন্য আরও ১২ ঘন্টা অর্থাৎ ১২০ ঘন্টা সময় দেওয়া হতো তাহলে কলকাতার অবস্থার এত অবনতি ঘটতো না। শিক্ষক ধর্মঘটও একটা মীমাংসায় পৌঁছে যেতো। তাঁদের গ্রেফতারের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে যদি সর্বশেষ সুযোগদানের নীতি সরকার ঘোষণা করতেন তাহলে তাঁদের গ্রেফতার করার দরকার হতো না। শংকরদাস ব্যানার্জী বিধান পরিষদে এই ব্যাপারে পলিটিক্যাল পার্টির ভূমিকাকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। ডেপুটেশন দেওয়া কি অন্যায়? এসেম্বলীতে আসা কি অপরাধ, না আইন বিরুদ্ধ? ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ডে কত বড় বড় ধর্মঘট হচ্ছে। সেখানে এ ধরনের ধরপাকড় হয় না। ১৯২৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গার সময় এই আইন ভঙ্গ করা হয়েছিল। কালী মুখার্জীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে কর্তব্যচ্যুত হবো যদি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত

অভিযোগ সেগুলিকে রূপায়িত না করতে পারি। যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করি।......প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই এটা কাজ।" তিনি আরও বলেন, "আমরা বিরোধীপক্ষ, আমাদের বিশেষ করে এটা কর্তব্য। আমাদের কাছে বার বার বলা হয়, এটা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা করবেন না। আমরা অত্যন্ত সিরিয়াসলি মনে করি এই গভর্নমেন্ট দেশ শাসনের অনুপযুক্ত। এই শাসনকে সরিয়ে দিতে পারলে আমরা এর চেয়ে ঢের ভালো ব্যবস্থা পত্তন করতে পারি। আমরা দুর্ভিক্ষ দমন করতে পারবো। শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের বাঁচাবার মত পয়সা দিতে পারবো, এই প্রোগ্রাম, কার্যক্রম আমাদের আছে। তাই আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি এই গভর্নমেন্টকে তার আসনচ্যুত করতে। এই রাজনৈতিক কর্তব্য আমাদের পালন করা উচিত এবং আজ আমরা শিক্ষকদের দাবী নিয়ে লড়ছি।"

আনন্দগোপাল মুখার্জী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলবার পর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি বলেন শিক্ষকদের অবস্থান কয়েকদিন ধরে চলছিল। তারা সরকারী নীতির প্রতিবাদে জনসমর্থনের জন্য এ কাজ করছিলেন। বিপুল জনসমর্থন ছিল। তাদের উদ্দেশ্য তো ইতিপূর্বেই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার ঠিক কাজ করেছেন। দেশের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। গুণ্ডাবাহিনী কলকাতাতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যতই সমালোচনা হোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি লালবাজার কন্ট্রোলরুমে থেকে কোন ভুল কাজ করেন নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন এই গুণ্ডাদের কে লাগিয়ে দিয়েছে? জ্যোতি বসু বলেন—"আপনি, আপনি"। ডাঃ রায় বলে চলেন তারা লুঠ করেছে। স্টেটবাসে আগুন ধরিয়েছে। কারা তাদের জোগাড় করেছে? জ্যোতি বসু বলেন, "আপনারা করেছেন"। ডাঃ রায় বলে চলেন, "বন্ধু, অধীর হবেন না। আমরা বের করবো কারা এটা করেছে। তাদেরকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।" তিনি এ. বি. টি-এর অবস্থিতি প্রসঙ্গে খানিকক্ষণ বক্তব্য রাখেন। অধিকাংশ শিক্ষকেরা এ সমিতির সদস্য নন এমন চিত্রটি উপস্থিত করেন। উপসংহারে তিনি গণতন্ত্র সম্পর্কে বক্তব্য রেখে বলেন, "চিৎকার করে, আগুন জ্বালিয়ে কিংবা পাথর ছুঁড়ে, লোককে খুনী বলে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। যা কিছু ভাল আপনি তার সব ধ্বংস করেছেন—একথা বলেও নয়। দেখা যাবে, অন্যকে গঞ্জনা দেবার পরিবর্তে তাঁরা নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃত ভাল প্রমাণ করতে পারেন কি না?"

সর্বশেষ প্রস্তাবের পক্ষে ৫৪ এবং বিরুদ্ধে ১২৮ ভোট পড়ে এবং মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

বিধান পরিষদে আলোচনায় তীব্রতা

১৭ই ফেব্রুয়ারী বিধান পরিষদে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা দেবেন সেন চেয়ারম্যানকে সম্বোধন করে এক মুলতবী প্রস্তাব রাখলেন। "শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবীর প্রতিকারে, কলকাতায় ১৬ই তারিখ গুলী চালানো এবং মানুষকে হত্যার প্রতিবাদে ঐ প্রস্তাব রচিত হয়।" কংগ্রেস দলের নেতা বিজয় সিং নাহার তাঁর বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি ভোটে তোলা হয়। চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থনলাভে অযোগ্য ঐ প্রস্তাব বাতিল হলো। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণের উপর পর পর কয়েকদিন বিভিন্ন বক্তা তাঁদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা নিজ নিজ লক্ষ্য অনুযায়ী এ সম্পর্কে মতামত দিয়েছিলেন। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা স্বাভাবিকভাবে এ ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন কিন্তু সরকার পক্ষের সদস্যদের বক্তব্যও যে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

১৮ই ফেব্রুয়ারী সভার শুরুতে মহীতোষ রায়চৌধুরী (শিক্ষক প্রতিনিধি) রাজ্যপালের ভাষণ সমর্থন করে বলেন ঐ ভাষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট প্রসঙ্গে এবং তাঁদের সমস্যা দূর করতে সরকার যে বেতনহার ও অন্যান্য সুবিধে দিয়েছেন সেগুলি যুক্ত হওয়া উচিত। ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য (শিক্ষক প্রতিনিধি) রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন মীমাংসার প্রস্তাব যখন চলছিল তখন তাঁর ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে। শিক্ষকদের দাবী সংগত এবং সরকারও সহানুভূতিশীল। তিনি বলেন, "ধর্মঘটের কথা উল্লেখ না করেও যদি সরকার ধর্মঘটের কারণ দূর করতে চেষ্টা করেন সেটাই কি অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? সুখের বিষয় সরকার সে দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।" সেখ মহম্মদ জান বলেন, ধর্মঘট সব সময় শান্ত ছিল না। দীর্ঘদিন ধরেই তো এই বেতনহার চলছে। তবে এখন কি উদ্দেশ্যে এই ধর্মঘট হচ্ছে! ডাঃ রায় শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিক্ষককে কিছুদিনের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতেই হবে। দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী বলেন, সাড়ে সতেরো টাকা ডি. এ. দেওয়া হবে শুরুতেই বলা উচিত ছিল। ডাঃ রায় তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, "১৬ই জানুয়ারী, এক মাস আগে বলা হয়েছিল।" শ্রীযুক্ত মুখার্জী বলেন এটি বিভ্রান্তিকর। তাঁদেরকে তখন পাঁচ টাকার কথা বলা হয়। এখন এই ডি. এ. ঘোষিত হয়েছে। তার জবাবে ডাঃ রায় বলেন দু দু'বার এ. বি. টি. এ-কে এই সুযোগের কথা বলা হয়, তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী জোরালো ভাষায় শিক্ষক আন্দোলনকে নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রায় সব সুপারিশ মেনে নিয়েছিল। শিক্ষকেরা এর ফলে ৭৫ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত লাভবান হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের উদাহরণ তিনি তুলে ধরে বলেন, এমন সুযোগ-সুবিধে অনেক রাজ্যে পাওয়া যায় না। অথচ শিক্ষকেরা রাজপথ জুড়ে দিনের পর দিন বসে থাকতে লাগলেন। রাস্তা দিয়ে চলাচল করবার অধিকার তাঁরও রয়েছে। "কলকাতা শহর কি শুধু শিক্ষকদের—সমানভাবে আসারও!" এর পরে তিনি কলকাতার হিংসাত্মক ঘটনাগুলির চিত্র তুলে ধরেন। সর্বশেষে তিনি বলেন "শিক্ষকেরা সুচতুর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছেন। এভাবে তাণ্ডব করা হলে তাঁরা দুর্ভাগ্য থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হবে এবং কয়েদে পুরে দেওয়া হবে।"

সদস্য দেবেন সেন তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণ ইংরাজীতে শুরু করে বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে অনেক কিছুই আছে কেবলমাত্র শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গটাই নাই। এটি এ রাজ্যে এক অভূতপূর্ব বিষয়। শুধুমাত্র বিস্তর লোক এতে অংশ নিয়েছেন সেজন্যই নয় এর রয়েছে এক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত। একে বলা যেতে পারে পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের পুঞ্জীভূত দৃঢ়বদ্ধ ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। মহাশয়, এই বাংলার এই মধ্যবিত্তরা চারিত্রিক আবেগ ও বিপ্লবী সত্তা নিয়ে আশা করছিল জাতীয় সরকার একটু অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। তার হতাশার মধ্য থেকে শিক্ষক আন্দোলনের জন্ম হয়েছে এবং এই কারণে প্রতি কোণ থেকে বিপুল সমর্থনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন এগিয়ে এসেছে। মহাশয়, আমরা মাঝে মাঝেই শিল্প এলাকায় যে মামুলী ধর্মঘট দেখে থাকি এটি তেমন নয়। এই তাৎপর্যটি যদি আগে থেকে বুঝতেন তাহলে এই ধর্মঘট এড়ানো যেত এবং কতকগুলি মূল্যবান জীবনহানি হতো না। তাৎক্ষণিকভাবে অনেকগুলি বিষয় এই ধর্মঘট থেকে আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে এসেছে। প্রথমতঃ শিক্ষকদের দাবীগুলি খাঁটি এবং পবিত্র। বোর্ডের সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই, আমাদের চাকরের চাইতেও কম বেতন শিক্ষক পান, এই তো কথা। দ্বিতীয়তঃ সরকার দীর্ঘদিন উদাসীন থেকেছেন। তাঁদের দাবী শোনেননি যার ফলে তাঁরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তৃতীয়তঃ ধর্মঘট

সর্বদা অদ্ভুত রকমের শান্তিপূর্ণভাবে থেকেছে। চতুর্থতঃ বাস্তবতার মুখে পড়ে যখন সরকারের ঘুম ভাঙলো তখন তাঁরা ছিটেফোঁটা করে সুবিধাদানের নীতি ঘোষণা করলেন। কর্মসূচী শিক্ষকদের সন্তোষবিধানের জন্য নয় প্রতিটি কনসেসন সরকার দিলেন তার উপর স্নায়বিক চাপ পড়লে। ধর্মঘটের আগে যা শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করতে পারতো স্বাভাবিকভাবে ধর্মঘটের পরে সেগুলিতে তাঁরা খুশী নন। এটাই ট্রাজেডি সরকার জনসাধারণের অনুভূতির গভীরতা মাপতে অসমর্থ। সম্ভবতঃ সরকার ভেবেছিলেন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিদ্যালয়গুলি এবং শিক্ষকেরা ছড়িয়ে আছেন। একটির সঙ্গে অন্যের বিস্তর দূরত্ব রয়েছে। ও'রা একটা সাধারণ ধর্মঘট করতেই পারবেন না। সাড়ে সতেরো টাকা অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা দেবার শেষ কনসেসন বর্তমানে চালু দশ টাকার উপর একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে নিতে পারতো। কিন্তু এ সংবাদ ধর্মঘটের নেতাদের দৃষ্টিতে যথাসময়ে আনা হয়নি এবং অনেক দেরীতে পৌঁছনো হয়েছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তিকর নীতি খেপে খেপে সুযোগ-সুবিধাদানের নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবস্থার অবনতির দিকে নিয়ে চলছিল। চূড়ান্ত সংকট এলো সরকার দমননীতি নেওয়ার পর পরই। গভীর রাতে প্রায় তিনশত শিক্ষক গ্রেফতার, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নেতাদের আটক করা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হলো। আপনারা জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলেন এবং তাদেরকে উত্তেজিত করলেন যাতে তাদের প্রতি গুলী তাক করা যায়। এই ভাবেই তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিলেন। বিদেশী শাসকেরা ঠিক এমনি করতো। আপনারা তাদেরকে নকল করেছেন। সম্ভবতঃ তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন। দেখুন, ১৯৪৮ সাল থেকে পুলিশের গুলী চালনায় যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তা বৃটিশ রাজত্বের কোন সময়ে হয়নি। গুলী চালনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল। মানব দেহের প্রতি তাচ্ছিল্য শুধু নয় প্রতিহিংসার ছবি ফুটে উঠেছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ জনসাধারণ যা করছে তার উপযুক্ত পাওনা নাগরিকেরা পাচ্ছেন।

সর্বশেষে তিনি বললেন, মুখ্যমন্ত্রী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটা অজুহাত খাড়া করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি অসহায় বলছেন। আইনসভায় আইন তৈরী হয়েছে. তিনি শুধু সেগুলির রক্ষকের কাজ করছেন, বলছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার জন্য স্বতন্ত্র আইন কি? পশ্চিমবাংলায় শুধু শিক্ষক আন্দোলন হচ্ছে না কি? ভারত সাধারণতন্ত্রে সর্বত্র শিক্ষকেরা রয়েছেন। কতকগুলি রাজ্যে তাঁরা ধর্মঘট করেছেন। কিন্তু ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর মাপের মান্য নেতাকে কোথায় গ্রেফতার করা হয়েছে? সর্বোপরি পুলিশ রাস্তায় গুলী করে লোক মারছে কোথায়?

১৯শে ফেব্রুয়ারী আলোচনার সূত্রপাত ঘটান ডাঃ চারু চন্দ্র সান্যাল। তিনি শিক্ষক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে বলেন, সরকারের অবস্থার চাবুক মূককে করলো বাচাল। এইভাবে নিরীহ শান্ত নির্বিরোধ শিক্ষকেরা ক্ষেপে গিয়েছেন। এখন সবাই মনে করবেন যে এই সুবিধা সরকার স্বেচ্ছায় দেননি। এটা রক্ত দিয়ে আদায় হয়েছে। তাই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ বা আনুগত্য রাখা শিক্ষকদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না—এইটেই হবে সবচেয়ে দুঃখের কথা।

কমিউনিস্ট সদস্য আবদুল হালিম পুলিশী তাণ্ডবের কথা তুলে ধরেন। সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনায় যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন সে ক্ষেত্রে ৯০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন না, তিনি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষক আন্দোলন ও পুলিশের পৈশাচিক হামলার বিবরণ তুলে বলেন, পুলিশ ও মিলিটারীরাজ কায়েম হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ কিছুতেই কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমা করবে না। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা রাজ্যশাসন করা যায় না। বৃটিশ আমলেও এ ধরনের সন্ত্রাস চলেছিল। ১৯৪২

সালে পুলিশ ও মিলিটারীর বর্বরতার বিরুদ্ধে অহিংস কংগ্রেসী জনতা প্রতিশোধের পথ গ্রহণ করেছিল। এবারে জনসাধারণ পুলিশ-মিলিটারীর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই বাধ্য হয়ে যে কোন পথ গ্রহণ করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশী তাণ্ডব যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, পুলিশ নির্বিচারে গুলী করে পথচারীদের পর্যন্ত হত্যা করেছে। বিধান পরিষদে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হুমকীকে হিটলারের দম্ভোক্তি বলে চিহ্নিত করেন। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের বেশী সুবিধের কথা বলেছেন তাতে তাঁরা যদি আরামেই থাকতেন তাহলে ধর্মঘটের পথ ধরতেন না। তাঁদের প্রতি কটূক্তি না করতে বলেন। শঙ্করদাসবাবু বলেছেন শিক্ষকগণ রাজনৈতিক পার্টির প্ররোচনায় ধর্মঘটে নেমেছেন এবং লুটপাট ও চুরিতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। এর চাইতে শিক্ষকদের প্রতি অপবাদ আর কি হতে পারে?

দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জী বলেন, শিক্ষকদের দাবী সম্পূর্ণ মেনে না নিয়ে গভর্নমেন্ট ভুল করেছেন এবং তার ফলেই যতো অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ডাঃ মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষকদের এই অবস্থাটা ঘটেছে যাতে করে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। এটা একদিনে হয়নি। ১৯৪৯ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, কলেজ শিক্ষক সমিতি বলে যত সংস্থা আছে তারা শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষক সংস্থা এ. বি. টি. এ. গত নভেম্বর মাসে এখানে বিধানসভার সদস্যদের কাছে একটা মেমোরাণ্ডাম দিয়েছিল এবং চুঁচুড়াতে গতবারে ১০ই ফেব্রুয়ারী এ সম্বন্ধে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তার পরে প্রায় এক বছর পার করে ১৯শে জানুয়ারী, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরে মুখ্যমন্ত্রী সময় পেলেন তাদের সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করবার।

ডাঃ রায়—আপনার ভূমিকাও রিসার্চ করা। সেইটে করুন গে—।

ডাঃ চক্রবর্তী—আপনার কাজও ডাক্তারি করা। সেই কাজটা করলেই তো পারেন।

অতঃপর ডাঃ চক্রবর্তী মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করে শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতনের অভাবে যে শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে না দেখান। তিনি বলেন, "আমি বলতে বাধ্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ক্ষমতাপ্রিয়তা ও দম্ভই এজন্য দায়ী। শিক্ষার সমস্যাকে উপেক্ষা করে কোন সমাধান করতে পারবেন ন। কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাও অগ্রসর করতে পারবেন না। পরবর্তীকালে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ নেন। সদস্য রবীন্দ্র লাল সিংহ বলেন, "ধর্মঘট করে, আমি বলব, ভারতবর্ষের শিক্ষকদের পবিত্র আদর্শের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করা হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে এ. বি. টি. এ-র সদস্য সংখ্যা ও রাজ্যের মোট শিক্ষকদের সংখ্যাতথ্য উপস্থিত করেন। তাঁর মতে মোট সংখ্যার ৩৩ শতাংশকে মাত্র এ. বি. টি. এ. নিয়ন্ত্রণ করে। কলকাতা শহরে তাদের আন্দোলন কি কি ক্ষতি করেছে তার বিবরণ তুলে ধরে বলেন, চোখ বন্ধ করে লাভ নাই। কাদের সঙ্গে মীমাংসা করব? তাণ্ডব সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে? ধ্বংস সাধনকারীদের সঙ্গে? কোনও সরকার এগুলি সহ্য করবে না। তাঁর বক্তব্যের পর মহীতোষ রায়চৌধুরী ও আবদুল হালিম কতকগুলি সংশোধনী পেশ করেন।

রাজ্যপালের ভাষণের পক্ষে ২৯ এবং বিরুদ্ধে ৬ ভোট পড়লে সভার কাজ শেষ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দীর্ঘকাল পরিষদের সদস্য সৈয়দ শাহেদুল্লাহ বলেন—শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় সত্যপ্রিয় রায় বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তিগুলি লিখে দিয়েও সদস্যদের সমৃদ্ধ করতেন।

রাজ্যসভায় বিতর্ক

শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সংসদের উচ্চকক্ষ ভারতের রাজ্যসভায় ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অন্ধ্র থেকে নির্বাচিত পি. সুন্দরাইয়া সভায় একটি নোটিশ উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি, শ্রীযুক্ত বি. সি. ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের পত্র আমি পড়েছি। যদিও আইন-শৃঙ্খলা ও শিক্ষা রাজ্যতালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় বিষয় নয় তবু সাধারণ অনুভূতির কথা বিবেচনা করে এবং সভার নেতা ও ডঃ কাটজুর সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে আগামীকাল সন্ধ্যে ছয়টায় এক ঘন্টা আলোচনার কার্যক্রম ধার্য করছি।"

১৮ই ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত সময়ে শিক্ষক ধর্মঘটে মিলিটারী নামানোর ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার সূত্রপাত করে বিখ্যাত কমিউনিস্ট ও বিরোধী দলের সহকারী নেতা ভূপেশ চন্দ্র গুপ্ত চেয়ারম্যানকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সংখ্যা, জনসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়, শিক্ষাখাতে রাজ্যের ব্যয়, শিক্ষক আন্দোলনের কারণ, সূত্রপাত এবং সাম্প্রতিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন এঁরা বরাবর আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত করছেন। আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করবেন, আমরা অনেক কিছুই হারিয়েছি, কিন্তু আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ধরে রাখছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া উত্তরাধিকার লাভ করে, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যা ভারতের অন্যস্থানের মানুষ গ্রহণ করতে পারে তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ শিক্ষকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, অবস্থান করতে তিনি একজনকে দেখেছিলেন তাকে কল্যাণীতে কংগ্রেসের অধিবেশনেও দেখা গিয়েছিল। কাজেই একে রাজনৈতিক দলের একটি কর্মকাণ্ড বললে মারাত্মক ভুল করা হবে। তিনি ১৫ ও ১৬ই তারিখের ঘটনাগুলি এবং এ সম্পর্কে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার মন্তব্য বলে চললেন। নাম ধরে ধরে কাদের কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার বিবরণ দেন। তিনি বলেন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা স্ট্রাইকে অংশ নেয়নি কিন্তু তাদের অফিসের পাঁচজন কর্মীদের উপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করেছে। নির্বিচারে নিবর্তনমূলক আটক আইনে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবেগময় ভাষায় তিনি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে বসে আছেন, তিনি এখনও আদেশ দিতে পারেন। তিনি সমস্ত আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার অনুকূলে মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন।...... আসুন এই ব্যাপারে আমরা একটা সম-মানসিকতায় আসি। আমরা কলকাতার শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার করি সেই সঙ্গে ঐ নগর-জীবনের স্বাভাবিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি।"

কমিউনিস্ট সদস্য বিমল চন্দ্র ঘোষ বোর্ডের সুপারিশের কথা উল্লেখ করে বলেন, একে কার্যকরী করতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক সাহায্যের কথা জানাননি, কিন্তু যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়-দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ বলেন, "আমি সম্ভবতঃ উল্টো দিক থেকে ধরছি। আমি মনে করি না বাংলার শিক্ষকদের সমস্যা রাজ্যতালিকার অথবা একটি প্রাদেশিক বিষয়। এটা একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় যা আমাদের সম্পূর্ণ জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। ঘটনাটি আকস্মিকভাবে কলকাতায় ঘটেছে। কিন্তু এটা প্রতীকী এবং উপসর্গ-প্রকাশক চরিত্রের। আমার সম্মানিত সহকর্মী বন্ধুদের সম্মুখে এই দুঃখকর প্রকৃতি হাজির করতে চাই। উপসর্গগুলি কি? আমরা যারা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত এই নিঃশব্দ অথচ দারুণ বিপর্যস্ত অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন এবং

আমরা সমাজ জীবনের পরিবর্তনে অনুপযুক্ত নীতি চালু রাখছি। সে কারণে ঘটনাস্থল ভৌগোলিকভাবে কলকাতা হলেও বিষয়টি সারা ভারতের এবং এই কারণে পার্লিয়ামেন্টের সদস্যদের বিশেষভাবে চেয়ারম্যানের যিনি জীবনের উল্লেখ্য সময় কলকাতায় শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।” তিনি প্রাঞ্জলভাবে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষক, প্রাথমিক ও কলেজ শিক্ষকদের মর্মান্তিক অবস্থা সভায় তুলে ধরেন।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও জননেতা অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ উঠে বলেন, “আমার সম্মানিত বন্ধুরা, সম্ভবতঃ কাগজে পড়েছেন, এ. বি. টি. এ.। এটি অল বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশন। হৈ চৈ করবার জন্য এক রাতে গজে উঠা ব্যাঙের ছাতার মত সঙ্ঘ বা সমিতি নয়। ২৫।৩০ বছরের পুরানো সংগঠন। দু'বার এর সভাপতি পদে থেকে আমি সম্মানিত। বছর তিন আগে আমার পণ্ডিত বন্ধু অধ্যাপক সত্যেন বসু যিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও আমাদের সহকর্মী, তিনি ছিলেন এর সভাপতি।” তাঁর কার্যকালে শিক্ষকদের এই সমস্ত দাবীগুলি প্রথম গৃহীত হয়েছিল জানিয়ে তিনি শিক্ষক আন্দোলন ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ রায় মিলিটারী নামিয়ে যে সমস্যা মোকাবিলা করছেন তাকে অনুমোদন না দিতে আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর অধ্যাপক জি. রঙ্গ প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় যেতে আবেদন করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কৈলাস নাথ কাটজু শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা উচ্চারণ করে বলেন তাঁরা রাজ্যপালের বাড়ীর পূর্বদিকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ দিতে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন জানান। পি. সুন্দরাইয়া বলেন, “ডঃ কাটজু আলোচনার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট করে দিচ্ছেন। আর এই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলি চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।” এরপর ডঃ কাটজু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বাজেটে অধিক অর্থ বরাদ্দের কথা তোলেন। ডাঃ রায় সম্পর্কে তিনি বলেন, সকলেই তাঁকে চেনেন। কলকাতার সেবায় তিনি জীবন অতিবাহিত করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন উপাচার্য এবং করপোরেশনের সভাপতি। শেষাংশে 'তিনি এই সব ব্যাপারে হিংসার আমদানীকে ঘৃণা করেন' জুড়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান চমৎকারভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা শেষ করে দেন।

লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব

১৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা ৮ মিনিটে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মবলংকর কলকাতায় শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তীর মুলতুবী প্রস্তাবের নোটীশ সভায় পড়ে শোনান। অধ্যক্ষ বলেন তিনি আলোচনার অনুমতি দিতে পারবেন না। শিক্ষা পুরোপুরিই রাজ্যের বিষয়। হৈ চৈ হলে তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলার বিষয়টিও রাজ্যের। তিনি বুঝতে অসমর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে এ বিষয়টিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। জনৈক সদস্য মিলিটারী ডাকা হয়েছে বললে, তিনি বলেন সদস্যদের সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। কেন্দ্র রাজ্যের স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। জাতীয়ভাবে জরুরী প্রসঙ্গ অন্য পদক্ষেপে দাঁড়াতে পারে। হাউসের কাছে এটি মুলতুবী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এ বিষয়ে জানবার কিছু থাকলে সংক্ষিপ্ত নোটীশ এই ব্যাপারে যথেষ্ট। এখানে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও নির্দেশে মিলিটারী চলছে। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, মুলতুবী প্রস্তাবটি সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগরীর জনজীবনে আজ অচলাবস্থা। গতিক এমন যে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হয়েছে। গতকাল অহিংস বিক্ষোভকারীদের সরাতে

গিয়ে এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে চান কেন না বর্তমানে হামেশা সরকার থেকে বলা হয় তাঁরা হিংসাত্মক ঘটনাবলী সমর্থন করছেন। তিনি বহুবার সভাকক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ রকম কথা বলতে শুনেছেন। এখানে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার এক সংস্করণ রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে অহিংস সমাবেশকে (প্রিটেক্যাট্) শব্দটি পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে স্পীকার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচিত হোক।

স্পীকার 'না' 'না' করলে তিনি এক বিবৃতি পেশ করতে চান। তাতেও তিনি অস্বীকৃত হলে তিনি বলেন এই রকম ঘটনায় পার্লিয়ামেন্টে আলোচনার সামান্য একটু সময় দিতে না পারায় আপনার রুলিং আমাদের ক্ষুব্ধ করছে। 'যদি এইভাবে মেডিস ও পার্সিয়ানদের আইন পার্লিয়ামেন্টে-এ অনুসৃত হয় তাহলে আমি মনে করি, হাউসে আমরা থাকতে পারি না।' স্পীকার থামতে বললে তিনি বলেন তাঁরা আজকের আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন না। স্পীকার বলেন, তিনি যা পছন্দ করেন সেইমত করতে পারেন। হট্টগোলের মধ্যে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, তাঁর দলের সদস্যেরা এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা ও এস. বি. খারে প্রভৃতি বিরোধী সদস্যেরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

পরদিন ডাঃ লঙ্কা সুন্দরম অধিবেশনের শুরুতে এক মুলতুবী প্রস্তাব তোলেন। 'কলকাতার সমস্যা আলোচনায় প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তিকারী সরকারের ব্যর্থতা' নামাঙ্কিত এই আলোচনায় স্পীকার দুই ঘন্টা সময় দিতে স্বীকৃত হন। তিনি বলেন এটা এক অদ্ভুত ধরনের মুলতুবী প্রস্তাব। সরকার এ আলোচনায় স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু মুলতুবী প্রস্তাবের মত এর আলোচনা হবে না। আধ ঘন্টা প্রস্তাবক এবং আধ ঘন্টা সমর্থকেরা বলতে পারবেন।

ডাঃ লঙ্কা সুন্দরম প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন সরকার সভার কাছে দায়ী হয়েছিল লোকসভায় কলকাতার ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা তুলতে না দিয়ে, পক্ষান্তরে তাঁরাই রাজ্যসভায় এ সম্পর্কে আলোচনায় সম্মতি দিয়েছেন। সরকারী নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংসদে প্রথম এই মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন-এর সুযোগ লাভ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে। কলকাতার ঘটনাবলী তুলে তিনি সময়ের সুযোগকে নষ্ট করতে চান না। গতকাল একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম প্রকাশ পেয়েছে দুই সভার মধ্যে। এমনিভাবে মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যেও সমন্বয়-এর অভাব লক্ষ্য করা যায়। গতকাল সভায় যে ঘটনা ঘটেছে, চেয়ারের প্রতি সম্মান রেখেই বলা যায়, সভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সরকারের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তাকে তাঁরা কাজে লাগান। কিন্তু বেঠিক পদ্ধতি তাঁরা চালু করছেন কেন? সরকারের সম্মান ও ক্ষমতাকে ফাঁপিয়ে তুলছেন কেন? যাঁর নিরপেক্ষতা ও শুচিতার মনোভাব সম্পর্কে সারা বিশ্বে পরিচিতি আছে, সেই নেতাকে বলব তিনি এই মুলতুবী প্রস্তাব মেনে নিন 'যে ভুল হয়ে গিয়েছে'। নতুবা আমাদের পরাজিত করুন। আমরা তাও মেনে নেব। আলোচনায় তামিলের নির্বাচিত সদস্য রঘুরামাইয়া, এস. এস. মোরে, মহাবীর ত্যাগী এবং সালেমের এস. ভি. রামাস্বামী এবং এন. সি. চ্যাটার্জী অংশগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী কলকাতার সাংঘাতিক ঘটনা এবং তাতে সারা দেশ কিভাবে উদ্বিগ্ন তা তুলে ধরেন। অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়-এর ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ঘটনা তুলে ধরে বলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ 'তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠে' গতকাল প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন। তিনি পার্লামেন্টের দুই কক্ষের বিপরীতমুখী আচরণের কথা বলতে চাননি। তিনি আপত্তি জানাতে চান যে যাঁরা লোকসভার নেতা হয়েও অগৌরবজনক আচরণ করছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলতে চান

কলকাতা ও বাংলাদেশের লোকেরা যে বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ সেই ব্যাপারে সরকারী মনোভাবও অগৌরবের, অপ্রত্যাশার এবং মূল্যহীন। এই কারণেই সরকারকে নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে আমি সভায় মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেছি।......আমি কেবলমাত্র এই কথা বলতে চাই সরকার দেশের জনতার কণ্ঠস্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বধিরতা অবলম্বন করছেন বিশেষ করে আমরা যেখানকার প্রতিনিধি সেই বাংলার লোকদের দারুণ মনস্তাপের প্রতি।”

আলোচনা শেষে প্রস্তাবটি তোলা হয় যে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে রাজ্যসভায় যে প্রস্তাব আলোচিত হয় সে সম্পর্কে লোকসভায় উত্থাপিত না হতে দেওয়া সম্পর্কে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনার মুহূর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা অনেকখানি সময় ব্যয়িত করেছি। মুলতুবী প্রস্তাব ভোটে তোলা হয়। পক্ষে ৬৬ এবং বিরুদ্ধে ২৫৯ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

শিক্ষক ধর্মঘটের প্রসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভার আলোচনাগুলি স্বভাবতঃই পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টিতে আসে। সকল সংবাদপত্র একে লোকসভার ইতিহাসে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব বলে আখ্যা দেয়। রাজ্যের বাইরে এগুলি কতখানি আলোচনা সৃষ্টি করেছিল তাও পরীক্ষা করা যেতে পারে। বিদেশের পত্রিকা বিশেষতঃ বিলাতের ‘টাইমস্’ পত্রিকা ১৮।২।৫৪ তারিখে পত্রিকায় কলকাতার গোলমালের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে প্রথমেই লোকসভার সংবাদ প্রকাশ করে। এই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার কমিউনিস্ট সদস্যেরা সংসদের সভা থেকে ওয়াক আউট করলেন। কলকাতার হাংগামা সম্পর্কে স্পীকার আলোচনার সুযোগ না দেওয়াতে তাঁরা এই কাজ করেছেন বলে জ্ঞাত করে। ঐ দিনই আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস্ ‘কমিউনিস্ট সদস্যদের আশ্রয়’ শীর্ষক শিরোনামা দিয়ে বিধানসভায় তিন কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু ও তাঁর সহকর্মী রণেন সেন ও হেমন্ত ঘোষাল যে সাংবিধানিক সুযোগ লাভ করেছেন তা জ্ঞাত করায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষার দৈনিক পত্রগুলি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে অনেকেই লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রসঙ্গগুলি তুলে ধরে। বিশেষ করে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার বম্বে ও নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত সংস্করণগুলি প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে এর বিস্তারিত সংবাদ সারা দেশে পরিবেশন করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচিত হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। “আরেক ওয়াক আউট” শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখে পাটনার সার্চলাইট পত্রিকা। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো পরিচালিত ঐ পত্রিকায় দেশে কমিউনিস্ট শক্তি যে সমস্ত কাজ করছে তার নিন্দা করে। ঐ পার্টি যাতে বে-আইনি ঘোষিত হয় তার জন্য জনতাকে অগ্রসর হতে বলা হয়। তারা ধর্মঘটীদের উত্তেজিত করতে বিপুল উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যে পার্টিকে জনপ্রিয় করে তুলতে কলকাতার সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে, বলা হয়। “অনাস্থা প্রস্তাব” শীর্ষক শিরোনামায় লক্ষ্ণৌ-এর “ন্যাশানাল হেরল্ড” পত্রিকা লেখে—“মঙ্গলবার লোকসভায় বিরোধীরা একটি গৌরবের স্পর্শ লাভ করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব সভায় পেশ করতে সফল হলো। তারা জানতো এ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হবে না। বাস্তবিকপক্ষে এটা তারা চায়নি। ......এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তারা যা বলতে চেয়েছিলেন তা থেকেও স্বতন্ত্র এক লক্ষ্য ছিল। সরকার অসাংবিধানিক-ভাবে কিছু করুন এই উদ্দেশ্যই।” দীর্ঘ ঐ সম্পাদকীয়তে সরকার কিভাবে দু'টি কক্ষে পৃথক পৃথক আচরণের মুখোমুখি হয়েছিল, ডাঃ লঙ্কা সুন্দরমের যুক্তি এবং ভবিষ্যতে কৌশল, বক্তব্য ও বক্তৃতায় সরকারী দলের কি করা দরকার তা তুলে ধরে। মাদ্রাজের ‘দি হিন্দু’ পত্রিকা ২০শে ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয় লেখে “পার্লামেন্ট ও শিক্ষক ধর্মঘট” শিরোনামা দিয়ে। তাদের সম্পাদকীয়তে লেখা হয় “ভাগ্য ভাল কলকাতায় শিক্ষক ধর্মঘট পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই উচ্চগ্রামে উঠেছে। বিষয়টি এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে সমস্ত দেশের দৃষ্টিতে তা আসা উচিত। কলকাতার শিক্ষকদের অসন্তোষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা তাঁদের দাবীগুলি নির্দেশ করেছি খুব সঙ্গতভাবে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এবং সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবার জন্য।” আন্দোলনের পূর্ব প্রসঙ্গগুলি শেষভাগে তুলে ধরে পত্রিকাটি বলেন “শিক্ষকেরা নিজেরাই সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে যেখানে অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে তাঁদের গ্রেফতার করা সম্পূর্ণ আইনসম্মত হলেও খারাপ মতলবের। ......দেশ-নেতাদের এই ব্যাপারটি এমনভাবে দেখা উচিত ছিল শিক্ষার অগ্রগতির সাম্প্রতিক প্রশ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারত জড়িত রয়েছে।”

এগারো

সাফল্য

আন্দোলন শুরু হবার কয়েকমাস আগে সরকার নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন যা রামস্বামী মুদালিয়র কমিশন নামে খ্যাত তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক চরিত্র সেখানে রয়েছিল। কমিশন বলে, শিক্ষা পুনর্গঠনে শিক্ষকদের প্রবল ভূমিকা থাকবে। কিন্তু শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান, বেতনক্রম, চাকুরীর শর্তাদি আকাঙ্ক্ষিত মাপ থেকে অত্যন্ত নিম্নে রয়েছে। দেশ পরিভ্রমণকালে তাঁরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন অতীতে যে অবস্থা ছিল তার চাইতেও অবস্থার অবনতি ঘটেছে। কমিশনের বক্তব্যঃ শিক্ষালয়গুলিতে সামান্য বেতন শিক্ষকেরা পান এবং যে দারুণ অনভিপ্রেত অবস্থার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় মূলতঃ তার ফলে এটি সৃষ্টি হয়েছে। "আমরা আমাদের অনুসন্ধানের ভিতর দিয়ে এই ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়েছি যে, দেশে শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যে পরিকল্পনা হচ্ছে তাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই হবে শিক্ষকদের সমস্যা।" অত্যন্ত বেদনার্ত হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আসল বিষয়টি আরও আগে বলেছিলেন যে পরিকল্পনার অভাব নয় শুধু অর্থের অভাবেই দেশে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।' পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে এ সময়ে দেশময় হৈ-চৈ হয়। পরিকল্পনার শিক্ষা শীর্ষক অনুচ্ছেদের ২০ নং ধারায় স্পষ্ট ভাবে লিখিত হয় "আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মান যে দুর্বল তার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকদের স্বল্পভাবে বেতন এবং তাঁদের চাকুরি জীবনে অসন্তোষজনক ব্যবস্থা।" গুরুত্বপূর্ণ দলিলের এই অংশগুলি আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলন আদৌ অযৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সুপারিশের পরিপূরক ও রূপায়ণের দাবীতে পরিপুষ্ট অনেকের মধ্যেই এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনায় দুর্ভাগ্যের আর এক উদাহরণ দিয়ে লেখে—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ শিক্ষকদের উন্নত বেতন দেবার বিষয়টি যে সপ্তাহে সোচ্চার করেছে সেই সপ্তাহেই রাজ্য সরকারের কাছে বেতনভাতার দাবী এক বছর ধরে জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে অল বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের এই শোষিত শিক্ষকদের প্রতি শাস্তিদান নিতান্ত অযৌক্তিক। কোন জাতীয় পর্যায়ে সর্বসম্মত সংস্থা দিয়ে মধ্যবর্তীকালে মীমাংসা করা হোক বলে পত্রিকাটি ধ্বনি তোলে। এভাবে নৈতিক জয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থিরভাবে এগিয়ে চলছিল। ঐদিন শেষরাত্রে শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি এ জন্য সরকারকেই দায়ী করে। ১৭।২।৫৪ তারিখে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় "এমন কোন বিবেকমান লোক নাই যিনি এই হতভাগ্য লোকদের জন্য গভীর মর্মবেদনা অনুভব না করবেন। ....কিন্তু জনসাধারণ ইহা দ্বারা কোন সান্ত্বনা পাইবেন না, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতির দাবী করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের বেতন ও ভাতার প্রশ্ন মীমাংসা করিতেই প্রস্তুত, তখন অকস্মাৎ গভীর রাত্রে সত্যাগ্রহী শিক্ষকদিগকে গ্রেফতারের কি দরকার ছিল? আইনসভার বিরোধীদলীয় সদস্যগণও বলিতেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে যে ঘোষণা দিলেন তাহা আরও কিছুকাল আগে প্রদান করিলে

কি ক্ষতি হইত? আমাদের বিশ্বাস যদি ধর্মঘটী শিক্ষকদের গ্রেফতার না করিয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার নূতনতম প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পেশ করিতেন, তবে সমস্ত অবস্থার পরিণতি এত শোচনীয় হইত না।" লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত "ন্যাশনাল হেরল্ড পত্রিকা" ঐ দিনই সম্পাদকীয় রচনা করে লেখে "ধর্মঘট সহসা শুরু হয়নি। অল বেঙ্গল টিচার্স এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের সুপারিশগুলি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতো নিজেরাই তৈরী করেছিলেন এবং সেগুলি রূপায়ণের জন্য দাবী করছিলেন। ......যখন শিক্ষক সমিতি অধৈর্য হয়ে উঠে তখন সরকার আর একটি তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিল যেন আগের কমিশন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। পাঁচদিন পর ডাঃ রায়ের সরকার যা দিলেন অধিকতর দূরদৃষ্টিতে সঠিকভাবে সেটি যথাসময়ে দেওয়া হলে গত মঙ্গলবার যে কুৎসিত ঘটনাগুলি ঘটেছে তা এড়ানো যেত।" ঐদিন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় "শিক্ষকদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির মনোভাব সকলেরই জানা আছে। আমরা মনে করি মঙ্গলবার প্রত্যূষে অবস্থানস্থল থেকে শিক্ষকদের গ্রেফতার করে সরকার ভুল করেছেন এবং যা ঘটেছে তার পটভূমি তৈরী করেছেন।" কলকাতার হিংসাত্মক ঘটনাবলী শিক্ষক আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করে দেবে অথবা নিতান্তই গৌণ বিষয় হয়ে যাবে বলে কেউ কেউ ভেবেছিলেন এবং মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত প্ররোচনা অতিক্রম করে শিক্ষকেরা আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ ও অব্যাহত রাখলেন। হিংসাত্মক ঘটনার মাত্রা কমতে লাগল। সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আন্দোলন ক্রমান্বয়ে আরও অনুকূল আবর্তে এসে গেল। মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের একদল নেতা প্রথম থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সুযোগকে তাঁরা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করলেন। কংগ্রেস দলের চীপ হুইপ দেবেন দে, মীরা দত্তগুপ্ত ও দু'জন বিধান পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি চেষ্টা লাগালেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সমিতি নেতা তারা কুমার মিশ্রকে সঙ্গে নিয়ে এঁরা প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। মীমাংসার প্রশ্নে একান্তে এক ঘন্টা এই আলোচনা চললো। ১৮ই ফেব্রুয়ারী টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া "বিবেকের আহ্বান" শীর্ষক বিখ্যাত সম্পাদকীয় রচনা করলেন। তাঁরা লিখলেন "সুদীর্ঘকাল ধরে অভাবক্লিষ্ট শিক্ষককুলের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে আমরা নিজেদের ওয়াকিবহাল করে ফেলেছি। বাধা রয়েছে এ কথা মনে না করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ জাতির বিবেকের কাছে পরিশোধযোগ্য ঋণ শোধের তাগিদ রেখেছেন। কাঁদুনে গ্যাস অথবা গুলি না পেয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযোগী কাজ করেছেন।" পরদিন মীমাংসার আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে যুগান্তর পত্রিকা লিখলো "শিক্ষক সমাজ পূর্বাপর তাঁহাদের ন্যায্য দাবী কার্যকরী করিবার জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলাকারেই আন্দোলনও চালাইয়া যাইতেছে। এই দাবী সময় থাকিতে মানিয়ে লওয়া, অবস্থা স্বাভাবিক করিয়া তোলাই হইত সুবুদ্ধির কাজ—দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চেষ্টা হয় নাই। উপরন্তু উত্তেজনা প্রশ্রয় পাইতে পারে এমন সমস্ত ঘটনাই অবিবেচনাবশে পর পর ঘটানো হইয়াছে।......যাহা হউক, এই অবিবেচনা, জিদ ও তাহার বিষময় পরিণাম আমাদের সকলের চক্ষুরুন্মীলনের সহায়ক হইলে এবং এখনো শান্তি ও শৃংখলার পথে সমস্যার সমাধান হইলে, শুধু আজিকার পক্ষেই তাহা শুভ হইবে না। আমাদের ভাবী কর্মধারা নিয়ন্ত্রণেও তাহার অভিজ্ঞতা লাভজনক হইবে।" উল্লেখ্য এ সময়ে যুগান্তর পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষক ধর্মঘট মীমাংসায় এক অভূতপূর্ব বিষয় লক্ষ্য করা গেল ১৮ই ফেব্রুয়ারী। দেশের শক্তিশালী বণিক সংগঠন ভারত চেম্বার অব কমার্স প্রত্যক্ষভাবে আসরে নেমে পড়লেন। শিক্ষকদের আন্দোলন ও

কলকাতার অবস্থা পর্যালোচনা করে তাঁরা এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন "শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এঁরা অবশ্যই উচ্চ বেতন পাবার অধিকারী। এজন্য তাঁরা নিশ্চয়ই দাবী-দাওয়া করতে পারেন। তবে তা রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটে নয়। এইভাবে তাঁরা নিজেদের হাতে আইন গ্রহণ করবেন না। তাঁদের পেশার পক্ষে এটি উপযোগী হবে না এবং এর ফলে তরুণদের মনে তাঁদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাবে। এছাড়া কলকাতার জনজীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দরকার। এজন্য সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষক সমাজও এগিয়ে আসুন এবং সমস্ত অবস্থা আয়ত্তে রাখুন। শান্তিপূর্ণ থেকে আরও সংযম ও উন্নত পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাবার জন্য চেম্বার শিক্ষকদের অনুরোধ করলেন। সেই সঙ্গে সরকারকে অবিলম্বে ধর্মঘট মীমাংসার জন্য কার্যকরী পথ নিতে আহ্বান দেওয়া হলো।" মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অপূর্ব কুমার চন্দ প্রথম থেকে মীমাংসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কলকাতা ও আশেপাশের স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে এক সভা হলো। শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গে এ সভা দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করলো। পুলিশের কাজকর্ম সেখানে নিন্দিত হলো। আটক শিক্ষকদের অবিলম্বে ছেড়ে দেবার দাবী করা হলো। শিক্ষকদের সব সময় শান্তিপূর্ণ থাকবার অনুরোধ করা হলো। তাঁরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকেও আন্দোলন তুলে নিতে আবেদন জানালেন। শিক্ষক অন্দোলন ও কলকাতার পরিস্থিতি একীভূত হয়ে সর্বভারতীয় আলোচনা ও আলোড়ন দেখা দিল। কলকাতার পরিবেশ পরবর্তীকালে ক্রমশঃ শান্ত হলেও চাঞ্চল্য দেখা দিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বিক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ অন্যত্র বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে, ২০ তারিখে আগরতলা তার নজির সৃষ্টি করে। রয়টার এ. পি. (এসোসিয়েটেড প্রেস), পি. টি. আই প্রতিদিন বাইরে ও দেশের অভ্যন্তরে এখানকার সংবাদ প্রচার করছিল। দেশের সমস্ত সংবাদপত্রগুলি গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। অনেকগুলি সংবাদপত্র এ সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয় এই সুরে সম্পাদকীয় রচনা করে। গৌহাটি থেকে প্রকাশিত 'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকা লেখে "মঙ্গলবার কলকাতার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে সকলকে এমন কি সরকারকেও শিক্ষা নিতে হবে।" এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'লীডার' পত্রিকা কলকাতার বিক্ষোভকারীরা গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশ করে। এই পদ্ধতির লড়াই এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে হাঙ্গামা (ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুলিশ-জনতার লড়াই) নিয়ে সংবাদ পরিবেশনায় দেশ বিদেশের পত্রিকায় শঙ্কিতভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে সংসদের উভয় কক্ষে কমিউনিস্ট ও বিরোধী সদস্যেরা সমস্ত বিষয় আলোচনা তুলতে প্রয়াস নেন। ১৮ই রাজ্যসভায় এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলেও লোকসভায় সুযোগ না দেওয়ার ফলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। লোকসভার স্পীকার বাধ্য হয়েই তারপর দিন দু'ঘন্টা সময় দিলেন। আলোচনাটি হয় অদ্ভুত ধরনের। টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য সরকারের সমালোচনা জাতীয় স্তরে ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় পরিণত হয়। এ সময়ে অধিকাংশ পত্রিকা একে সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজ্যসভায় ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজনীতিকেরা যেভাবে বিষয়টি উপস্থিত করেন তাতে জাতির ব্যর্থতা হিসাবে এটি চিহ্নিত হলো। এ প্রসঙ্গে ডঃ কালিদাস নাগের বক্তব্য লক্ষ্যণীয় (শেষ পর্যায়ে তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণটি দেওয়া হবে)। তিনি বললেন, "আমি লোকসভা ও রাজ্যসভার সমস্ত দায়িত্বশীল সদস্যদের দেশের শিক্ষকদের কথাই ভাবতে বলব যাঁরা বছরের পর বছর নীরবে এই দুরূহ ভার বহন করে চলেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার প্রত্যুষকালে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন 'আমি যদি আমার শিশু সন্তান অথবা পরিবারের জন্য

খাদ্য ও শিক্ষা না পাই তবে আমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ কি?' তাঁদের অসুস্থতায় তাঁরা ডাক্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন না। তাঁরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, চলুন না, তাঁদের কাছে যাই। আমরা সবাই জানি তাঁরা দায়িত্বশীল দীন শিক্ষক। তবু আমরা তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অস্বীকৃত। লক্ষ লক্ষ শিক্ষকদের এই অবস্থায় রেখে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারবো না। আগামীকাল কিংবা পরশুর বিষয় নয়। কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারও না। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের আগে আমরা অনেকেই সরে পড়ব। আমি প্রত্যেক সদস্যকে এই শিক্ষকদের সম্পর্কে বিবেচনা করতে বলব।" বস্তুতঃ ব্যাপক প্রচারে বিষয়টি এমন অনুভূত হয় যে রাজ্য সরকার নয় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি শিক্ষকদের আন্দোলনের জন্য দায়ী। বিদেশের পত্রিকাগুলি স্পষ্টই লেখে ভারত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষকেরা লড়ছেন। এ কারণে এটি খুব স্বাভাবিক যে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য শর্তে মীমাংসায় বসতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দেন এবং বিষয়গুলির উপর নজর রাখেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য সরকারের মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে এখন গ্রামের সব হাই স্কুলগুলি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কর্মবিরতি ঘোষিত হলেও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলির কাজ প্রথম থেকে যথারীতি চলছে। শিক্ষক সমিতি সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে বিবৃতি দেয়। তবে বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মীমাংসার প্রস্তাবকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসে। সভায় গৃহীত হয় কর্মবিরতির দরুন ছাত্র সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে আগামীতে দীর্ঘ অবকাশের মধ্য থেকে কতকগুলি দিন বের করে সে দিনগুলিতে শিক্ষাদান করে এ ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হবে। পত্রিকাগুলি এ ঘোষণাকে মূল্য দেয়। সভায় ডাঃ রায়ের সর্বশেষ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়ে স্থির হয় যে এই উদ্দেশ্যে সমিতির কার্যকরী কমিটির সভা ডাকা হবে। রবিবার (২১।২।৫৪) সমিতির কার্যকরী সমিতির জরুরী সভা বেলা ২টায় কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস্ হলে আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমিতির ছয়জন নেতা জেলে রয়েছেন। তাঁরা যাতে ঐ সভায় যোগ দিতে পারেন এজন্য তাঁদেরকে মুক্তি দিতে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ভূপেশ গুপ্তকে নিয়ে সমিতির অফিসে নেতাদের সংগে আলোচনা করলেন। সমিতির মনোভাবের কথা নিয়ে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত পরদিন মুখ্যমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাত করলেন। সংবাদপত্র লিখলো 'এ. বি. টি. এ-র চীফ্ পশ্চিমবঙ্গের চীফ্ মিনিস্টারের সঙ্গে'। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি অপূর্ব চন্দ ও ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং দেবেন দে আলোচনার সময় বরাবর উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় আটক নেতাদের যোগদানের প্রসঙ্গে ডাঃ রায় প্রস্তাব দিলেন ঐ সভা অন্যত্র না করে জেলের অভ্যন্তরেই করা হোক্। তাতে আটক সদস্য সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ কুণ্ডু ও সাগরিকা ঘোষ যোগ দিতে পারবেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন এ প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাবেন। পরদিন এ প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন। প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হলো। জেলের অভ্যন্তরে কার্যকরী সভা করে আন্দোলনের ইতিহাসে শিক্ষক সমিতি এক নতুন নজির স্থাপন করলো। ১৯৬৬ সালের আন্দোলনে দ্বিতীয়বার এ অধিকার ভোগ করা হয়েছিল জেলের অভ্যন্তরে কারা-ভোগীদের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের সভা করে। সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতিতে আশী জন সদস্যবিশিষ্ট সভায় উপস্থিত ছিলেন ষাট জন সদস্য। এক ঘন্টা আলোচনার পর সভা পরদিন বিকাল পর্যন্ত মুলতুবী থেকে যায়। অবশ্য মীমাংসার সূত্র হিসেবে কয়েক দফা

প্রস্তাব রচিত হয়। ঐ প্রস্তাবগুলি নিয়ে রাতে মনোরঞ্জন বাবু ডাঃ রায়ের বাড়ীতে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেবেন দে। সেখানে ডাঃ রায় তাঁর অফিসারদের নিয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে সমিতির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। ডাঃ রায় তাঁকে জানান যে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলে হিংসামূলক কাজে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকী সকলকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। কর্মবিরতির জন্য সরকার থেকে কাউকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আনা হবে না। সরকার স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে সরকারের মনোভাব জানিয়ে দেবে। তার ফলে সেখানেও শাস্তি দানের কোন ব্যাপার ঘটবে না। সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে যে শর্তগুলি দেওয়া হয়েছিল—

(১) আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার থাকবে সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির উপর।

(২) শিক্ষকদের সম্পর্কে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না।

(৩) সরকার পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের প্রতি কোন রকম শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা চলবে না।

(৪) সরকার ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে শিক্ষকদের দাবীর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার দরজা খোলা রাখতে হবে।

এই শর্তসাপেক্ষে সমিতি আন্দোলন প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক জানিয়ে মনোরঞ্জনবাবু ভারত সভা হলে চলে আসেন। সেখানে আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক সাধারণ সভা ডাকা ছিল। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ উপস্থিত করলেন সমিতির সভাপতি। মীমাংসার সূত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন সমিতির নেতৃত্বের একাংশ। এমন কি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা হীরেন্দ্র নাথ রায় মনে করতেন আন্দোলন আরও কিছু দিন চালালে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে নত করানো যাবে। মনোরঞ্জনবাবু বক্তব্য রাখবার পর মঞ্চে উঠে বিভিন্ন কর্মীরা বিশেষতঃ মহিলারা এই শর্তগুলি সম্পর্কে আপত্তি জানান তীব্র ভাষায়। তাঁদের বক্তব্য সরকার এবং বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিগুলি যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে না এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তাঁরা বললেন কর্মবিরতি ও পিকেটিং চালিয়ে যাওয়া হোক। আপস মনোভাব সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করবার হেতু যথেষ্ট ছিল। ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাসী চলেছিল। আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের বহু কর্মীকে ঐ দিনও গ্রেফতার করা হয়েছিল। কেশব সেন স্ট্রীটের বস্তীতে এবং গৌর দে লেনে বাড়ীতে বাড়ীতে সাঁড়াশী অভিযান চলেছিল। তা ছাড়া কালীধন ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটি ও সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সভা থেকে সকালে আটজন এবং বিকেলে সমন্বয় কমিটির সভা থেকে দশজন যোগদানকারী কর্মীকে গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ এসেছিল। ভারত সভার উত্তপ্ত আলোচনাকে শান্ত করতে উদ্যোগী হলেন শ্রীসুরেশ চন্দ্র মৈত্র, শ্রীসুশীল ঠাকুর, শ্রীঅন্নদা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত এবং শ্রীঅজিত দাস। অবশেষে তাঁরা ক্ষুব্ধ সদস্যদের বুঝিয়ে শান্ত করতে পারেন। সমস্ত বিষয়টি কার্যকরী সমিতির বিবেচনাধীন বলে শৃঙ্খলা সহকারে সবাই চলে আসেন।

ঐদিন রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বিবৃতি রেখে সমিতির সভাপতি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করে সমিতির সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন যে সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাড়ে সতেরো টাকা করে প্রতি মাসে শিক্ষক পিছু ডি-এ দিতে বলছেন তাতে স্বাভাবিকভাবে ছাত্র বেতন বাড়বে। এ ক্ষেত্রে

ডাঃ রায় বলেছেন ছাত্র বেতন বাড়বে দু'তিন আনা। তিনি হিসাব দিয়ে বলেন অন্ততঃ পাঁচ আনা মাসিক বেতন বাড়তে বাধ্য। ছাত্র বেতন বৃদ্ধির তিনি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করলেন। সংবাদ সংস্থা পি. টি. আই. ধর্মঘট প্রত্যাহার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিবৃতি পুনঃ প্রচার করে। সেটি—"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে যে কর্মবিরতি আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। রাজপথে বাধাসৃষ্টি ও ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগ যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রেফতার হইয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের আদেশদানের জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বিধানসভার বিরোধীদলের যে সমস্ত নেতা আন্দোলনে আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শক্রমে আমরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। যাঁহারা আমাদিগকে আমাদের সংগ্রামে সহায়তা করিয়াছেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দুঃখের বিষয় অন্যান্য অভিযোগে যাঁহারা গ্রেফতার হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। তাঁহারা যাহাতে সত্বর মুক্তিলাভ করেন তাহার জন্য আমরা অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া যাইব। বেতন ও মাগ্‌গীভাতা সম্পর্কিত দাবী পুরোপুরি ভাবে আদায়ের জন্য সরকারকে বাধ্য করিতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলাপ আলোচনা ও অন্যান্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির সাহায্যে চেষ্টা করিবেন।" মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ঐ দিনই বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন, "ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক গড়িয়া তুলিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করাই যাঁহাদের প্রধান দায়িত্ব সেই শিক্ষকগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন যে কর্মবিরতি আন্দোলন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং যাহা মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। গত ১৬ই তারিখের ঘটনায় সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, সবিশেষ চিন্তা না করিয়া এইরূপ আন্দোলন আরম্ভ করার চেষ্টা করা উচিত নয়।" তিনি মীমাংসায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। যাঁদের সাহায্যে সেটি সম্ভব হয়েছে তাঁদের বিশেষ করে দেবেন দে-কে সেজন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।......পুনরায় কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করায় ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষকদের পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।" সে রাত্রেই মুখ্যসচিব শ্রী এস. এন. রায়ের স্বাক্ষরিত সরকারী নির্দেশনামা তৈরী হয়। সমিতির সভাপতির কাছে তিনি ঐ বিষয়গুলি উপস্থিত করে পত্র লেখেন। ঐ নির্দেশ-নামায় ১৪৪ ধারা অমান্য করবার ফলে যাঁরা কারান্তরালে রয়েছেন তাঁদের ছেড়ে দেবার আদেশ জারি হয়। পরদিনই পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতে হাজির হয়ে সরকার মামলা চালাতে ইচ্ছুক নয় বলে ধৃত ৩২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৭১ জন নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তিদের (এর মধ্যে অনেক শিক্ষক ছিলেন) বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেন। দেশের সর্বত্র এ সংবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসাবে প্রচারিত হয়। রাজ্যের ছাত্র, শিক্ষক ও গণসংগঠনগুলি উল্লসিত হয়। শিক্ষক আন্দোলনে তাঁরা সহযোগী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। কাজেই এই নিষ্পত্তিকে তাঁরা নিঃশর্তভাবে স্বাগত জানান। রাজনৈতিক দলগুলি অভিনন্দন জানায়। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির ব্যাপারে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালনের ডাক দেয়। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে বলা হয়—জনগণের আন্দোলনের চাপে বিধান সরকার জনমতের কাছে নতিস্বীকার করে শিক্ষকদের আংশিক দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষকদের দাবী আদায় হয়েছে—এটি কেবলমাত্র শিক্ষকদের জয় নয়, বাংলার জনমতের জয়।

সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারী শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে রাজভবনের কাছে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকারী অথবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ কার্যকর করেন। সরকারী আদেশনামা বেলা ১২টার আগে প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে পৌঁছল। বিকাল ৫টায় পাঁচজনের এক একটি দলে দফায় দফায় মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রথমে মুক্ত হন ধৃত ৪৭ জন শিক্ষিকা ও ৬ জন নেতা। জেল গেটে বিপুল সম্বর্ধনা তাঁদের দেওয়া হয়। নেতারা মাল্যভূষিত হন। তাঁরা সরাসরি কলেজ স্কোয়ারে সমিতির কার্যালয়ে পৌঁছলে সেখানেও বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। উপস্থিত শিক্ষকদের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী ও শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকালে বিধানসভায় প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়। শ্রীজ্যোতি বসুর প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি দেন। জানান, নিবারক আটক আইন ও অপরাপর আইনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি এবং মহানগরী থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ার বিষয়গুলি সরকার বিবেচনা করছেন। সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির মুলতুবী সভা মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে মহাবোধি সোসাইটী হলে শুরু হলো। সভায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের স্বাগত জানানো হয়। প্রথম প্রস্তাবে বিগতকালে পুলিশের গুলি চালনায় নিহতদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সমিতির তরফ থেকে "শহীদ তহবিল" খুলবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকার কলকাতার এলাকা ও সংখ্যা নির্বিশেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে যাঁদের গ্রেফতার করেছেন তাঁদের সকলকে মুক্তি দেননি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভা আশা করে আগামী বুধবারের মধ্যে তাঁদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রস্তাবে কলকাতা থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেবার দাবী করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে ধৃত ও পরে মুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজে যোগদানের জন্য যথেষ্ট সময় মঞ্জুর করতে অনুরোধ জানানো হয়! সমস্ত ধৃত বন্দীদের মামলা পরিচালনার প্রয়োজন হবে বলে সভা মনে করে। সে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে এ ব্যাপারে সমিতি বরাবর সাহায্য দান করে চলবে। সেই দিনই সমিতির সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় সরকারের কাছে এক পত্র লেখেন। ধৃত ব্যক্তিদের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার দিন স্থির করবার বিষয় নিয়ে ঐ চিঠি লেখা হয়।

সপ্তাহকাল পরে আবার সাংবাদিকরা সত্যপ্রিয় রায়ের সাক্ষাতকারে অগ্রসর হন। সত্যপ্রিয় রায় সাংবাদিক সভায় সর্বপ্রথমে নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাঁদের পরিজনবর্গের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষক আন্দোলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবী জাতীয় মর্যাদা লাভ করেছে। আন্দোলনের ফলে শিক্ষকদের দীর্ঘকালের জড়তা ভেঙ্গে গিয়েছে। শিক্ষকেরা জাতির স্রষ্টার ভূমিকায় নতুনভাবে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন। শিক্ষক সমিতির আহ্বানে চারশতের অধিক শিক্ষকের কারাবরণ ভারতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সমিতির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁরা অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। যে পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা কারাগার থেকে বের হয়ে এসেছেন সে সময়ে কি পাওয়া গিয়েছে এবং কি পাওয়া যায় নাই তার হিসাবের কি মূল্য আছে? তবে তাঁরা এটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে পারেন যে, শিক্ষকদের দাবীর কিছু অংশ অনিচ্ছুক সরকারের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষক সমাজ সংহতির যে অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন তার জন্য তাঁদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি সকলকে কাজে যোগ দিতে আহ্বান দেন। সর্বশেষে যে সব রাজনৈতিক দল শিক্ষক আন্দোলন সমর্থন করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতেও এই সমর্থন ও সহানুভূতি দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন পূর্ণ মর্যাদায়

মহিমান্বিত হবে। শিক্ষক সমিতি সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। পরদিন "ধর্মঘট" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে—"দেশের সমস্ত সংবাদপত্র এক বাক্যে শিক্ষক সমাজকে সমর্থন করিয়াছেন। জনসাধারণ শিক্ষকদের প্রতি তাঁহাদের অকুন্ঠ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।......নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বর্তমান সিদ্ধান্তে উহার উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট দৃঢ়তা ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।......ইহাতে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষক সমিতির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে।" সাফল্যের এই মনোভাব শিক্ষককুলকে আত্মমর্যাদা দিয়েছিল। একই সুরে এই ধরনের কবিতা লিখছিলেন শিক্ষকেরা—

"এত খুন ঢালা, অপমান জ্বালা,—সকলেই ব্যর্থ হবে?
আশার অরুণে ঢাকিয়ে রাখিবে হতাশার মেঘ ছায়া?
জাতির জনক পাবে না কনক, ঝুলি ধুলি ভরা রবে?
সবুজ পৃথিবী—নেহারিছে কবি—আহ্বানে ভাবীকাল
শিক্ষাব্রতীর—এ মহারথীর শিরে শোভে জয়মাল।"

বারো

মহামিলনের মোহনায়

"যদিও আমার বুকে পাষাণ চাপায় চারিদিকের দেওয়াল তবু দূরতম নক্ষত্রের তালে তাল দিয়ে স্পন্দ-মান আমার হৃদয়" নাজিম হিকমতের উদ্ধৃতি ঊর্ধ্বে রেখে "জীবনের রূপ" শিরোনামায় শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকায় কবি শিক্ষকের মধ্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

"বেদনার লাঞ্ছনার বঞ্চনার দিন
শেষ হোয়ে এল কি রে?
ভোর হোয়ে এল বুঝি?"

সমর্থন পেয়ে শিক্ষক উৎসাহ প্রকাশ করেন—

"তাই দেখি ভাই—
পূর্বাচলে চেতনার রক্তিম উন্মেষ,
মুক্ত পারাবতকুল আশার সংবাদ
বহে আনে বহু দূর হোতে।
তাহাদের অমলিন সে শুভ্র ডানায়
নতুন যুগের এলো রক্তিম ইঙ্গিত
শুনি যেন আগমনী গান।"

সমিতির পত্রিকায় এই ধরনের অনেক রচনা প্রকাশ পায়। চির মূক চির নীরব শিক্ষক সমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সম্ভ্রম বা মর্যাদা পেলেন তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার এক সামান্য অংশই পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে এ সব থেকে বোঝা যায় শিক্ষক সমাজের সামনে নতুন আশার দিগন্ত খুলে গিয়েছিল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শিক্ষক আন্দোলনকে ঘিরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণের কাহিনী লিপিবন্ধ হয়েছে। আন্দোলনের শেষ দিকে এই অংশ গ্রহণে গুণগত পরিবর্তন অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বোম্বাই থেকে অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাদের সৌভ্রাতৃত্ব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা একে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মর্যাদা দেন। ডক মজুর, ট্রাম মজুর, ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকেরা এমন কি স্টেট বাস শ্রমিকেরা নিজ নিজ শক্তি দিয়েই সাহায্য সহযোগিতা ও প্রচারে নেমেছিলেন। গ্রেপ্তার ও গুলি চালানোর পর শ্রমিক সংগঠনগুলি স্থানীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে আসতে শুরু করে দেয়। আক্রমণের প্রতিবাদে ও শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতা ও শহরতলীতে এবং খড়গপুরে বড় বড় শ্রমিক সমাবেশ হলো। তাদের ডাকে বন্দী মুক্তির দাবীতে মিছিল হলো আসানসোলে। বার্নপুরে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি হরতাল ডাকলো। সেখানে এই উপলক্ষে সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রমিক নেতা ছোটেলাল ব্যাস। আর বক্তব্য রাখলেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা শ্রীএস, এ, ডাঙ্গে। আন্দোলনে শিক্ষকদের সমর্থনে আগরতলার ছাত্রদের ভূমিকা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কটক থেকেও একদল ছাত্র তারবার্তা পাঠিয়ে সংহতি জ্ঞাপন করেছিল। ছোট বড় শিক্ষক সংগঠন সারা ভারতে যা ছড়িয়ে ছিল তারা কেউ উদ্বেগ, কেউ সমর্থন বা সংহতি জানিয়ে পত্র অথবা তার পাঠিয়েছিল। দিল্লী টিচার্স ডেমোক্রাটিক পার্টি, আহম্মদ-নগরের জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, মধ্যপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশন, পাটনার এ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল, অল আসাম এইডেড সেকেণ্ডারী টিচার্স এসোসিয়েশন, দিল্লী স্টেট টিচার্স, দারসিং-সরাই এর হাই স্কুল শিক্ষকেরা, রাজস্থান টিচার্স ফেডারেশন, সাতিমপুর সেকেণ্ডারী টিচার্স এসোসিয়েশন, সৌরাষ্ট্র সেকেণ্ডারী

টিচার্স এসোসিয়েশন, পাঞ্জাব সাব-অর্ডিনেট এডুকেশনাল সার্ভিসেস্ ইউনিয়ন, দি অল ত্রিবাংকুর প্রাইভেট সেকেণ্ডারী স্কুল টিচার্স এসোসিয়েশনের বার্তা ছিল। শিক্ষকেরা মনে করতে পেরেছিলেন তাঁদের উৎসাহে অনুষ্ঠিত মাসাধিক কাল আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের কথা। তার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগীয় সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিরা তাঁদের আসন্ন সংগ্রামের সমর্থনের প্রস্তাব তুলেছিলেন। সেদিন বোম্বাই, কর্নাটক, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ধর্মঘটকে সাহায্য করবার অঙ্গীকারে বোম্বাই-এর প্রতিনিধি রেদকার বলেছিলেন যে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রামের সাহায্যের জন্য তিনি দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেবেন। সদ্য অনুষ্ঠিত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধি। তিনি ছাত্রদের সহযোগিতার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেছিলেন। কর্নাটকের প্রতিনিধি কুলকার্নি সরকারের দীর্ঘসূত্রিতার নীতি এবং শিক্ষকদের জীবনধারণের নিম্নতম দাবির প্রতি সরকারের উদাসীনতাকে তীব্র নিন্দা করেছিলেন। বিহারের শিক্ষক নেতা শিউদীপ নারায়ণ বলেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকদের শ্রমিক ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত নেওয়া উচিত। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বিহারের শিক্ষক ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে থাকবেন। বস্তুতঃ ফেব্রুয়ারির পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলন বিহার রাজ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। উত্তর বিহারের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এই আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন করে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী মজঃফরপুর শহরে আন্দোলনের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য প্রদেশের শিক্ষক সম্মেলন থেকে প্রস্তাব নিয়ে বার্তা পাঠানো হয়—"পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব অন্যায় ও অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এ. বি. টি. এর সঙ্গত দাবীগুলিকে উপেক্ষা করে চলেছেন।" সমভাব লক্ষ্য করা যায় দেশের বাইরেও। ইংলণ্ডে এ আন্দোলন সংবাদে চাঞ্চল্য শুরু হয়। সেখান থেকে মাসিক লেবার পত্রিকা সম্পাদক প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী রজনীপাম দত্ত সমিতিতে চিঠি লেখেন—"আমরা বৃহত্তম উৎসাহ ও লক্ষ্য নিয়ে এই চিত্তাকর্ষক সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে আছি।" ইন্দোনেশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন সি-টি-ইউ-ও-আই লেখে—"তাদের পাঁচলক্ষ সদস্য উন্নত বেতন প্রার্থী কলকাতার পঁচিশ হাজার শিক্ষকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সংহতি জানাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকেরা বিশ্বাস করে কলকাতার শিক্ষকেরা শ্রমিক ও সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সাফল্য অর্জন করবে।" বুদাপেস্ট থেকে হাঙ্গেরীয়ান টিচার্স ইউনিয়ন এক তারবার্তায় বলে "হাঙ্গেরীর শিক্ষকেরা নিম্নবেতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ধর্মঘটকে ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ শুভেচ্ছায় ভূষিত করছে। দুঃখ ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যারা অধিকতর মুনাফালাভ করতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিষময় করে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির জন্য এটা হচ্ছে বিশাল প্রতিরোধ। আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও সমর্থন গ্রহণ করুন। আমরা বরাবর অক্ষত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও শিক্ষকদের সুখী জীবনের পক্ষে আমাদের কন্ঠস্বরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরব।" শিক্ষকদের উপরে আক্রমণ নেমে এসেছে সংবাদে বিচলিত হয়ে বিশ্বসংস্থা ওয়ার্লর্ড ফেডারেশন অব টিচার্স ইউনিয়ন তার পাঠায় "বন্দী সহকর্মীদের পাশে থাকলাম এবং জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বাংলার শিক্ষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি।" জাকার্তা থেকে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষক সমিতি তারবার্তায় জানায় "আপনাদের দাবীর প্রতি সহমত পোষণ করছি। যারা বলিগ্রস্ত তাদের পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছি। সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে।"

আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রমিক নেতা শ্রীমনোরঞ্জন রায় বলেন "এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য যে শুধু আবেদনের মধ্য দিয়েই আন্দোলনের ঐক্য গড়ে উঠেনি। শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঐক্য গড়ে তুলেছিল। শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে বহু আন্দোলনের মধ্যে সেই ঐক্য আরও সংহত হয়েছিল।” আন্দোলনের আলোকে শিক্ষকেরা ও সচেতন মানুষ দূরতম নক্ষত্রের দিকে দৃকপাত করতে পারলেন। অভিনব বিষয় এই যে আমাদের দেশের শিক্ষার এই সংকটকালে ভারতের মত জনবহুল দেশের শিক্ষার অগ্রগতি প্রসঙ্গে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল। তাস প্রকাশিত আলেকজাণ্ডার সালোভিয়েক রচিত নিবন্ধের উপর আলোচনা হলো। সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষার অবস্থা এবং শিক্ষকদের মান মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোচনায় বলা হলো সেখানে শিক্ষাখাতে বছরে মাথা পিছু বরাদ্দ ৩০০ রুবল। সাতশালা পরিকল্পনায় চৌদ্দ বছর বয়সী সব বালক বালিকাকে শিক্ষিত করে তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এদের সকলের শিক্ষার গ্যারান্টি এসেছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেস শিক্ষার বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড় বড় শহর আর শিল্পাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করবার সুপারিশ সেখানে গৃহীত হয়েছে। শিক্ষকদের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। তাঁরা ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিসিয়ানদের মত বেতন পাচ্ছেন। পাঁচ বছর অন্তর বেতন হারের সংশোধন ঘটেছে। তাঁদের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে আরামপ্রদ বাসস্থান। কৃতী শিক্ষকেরা আরও উন্নত বেতন পাচ্ছেন। ২৫ বছর কাজ করলে তাঁরা অবসর নেবেন। অবসরে তাঁরা পাবেন পেনসন এবং বিশ্রাম আর আরামের উপকরণ। শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি পাশাপাশি তাদের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। তাদের জন্য স্বাস্থ্য-নিলয়, চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদর্শনী ক্ষেত্র দেখবার ব্যবস্থা তারাই করে থাকে। এছাড়া প্রতি বছর ইউনিয়ন রিপাবলিকের সভাপতিমণ্ডলী শিক্ষকদের “সম্মানিত শিক্ষক বা শিক্ষিকা” পদে ভূষিত করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করে থাকে। সদ্যমুক্ত চীনের শিক্ষার অগ্রগতির সংবাদপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘পিপল্‌স চায়না ১৩ খণ্ড ১৯৫৪’ থেকে ইয়াং চুং ল্যানের লেখা ইংরাজী ও বাংলায় অনূদিত হয়। মুক্ত চীনে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে শিক্ষায় ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়, অতীতে যেখানে শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। বিধি নিষেধের ডোরে স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত ছিল। সেগুলি বাতিল করে সেখানকার সরকার সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার দিতে যে চেষ্টা করছেন তা প্রচারিত হয়। এখানকার শিক্ষকদের খুব অল্পদিনের মধ্যে যে সব সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা বর্ণিত হয়। ৪০ বছর শিক্ষকতা করবার পর ৬৩ বছর বয়সে শিক্ষকরা অবসর নেন। অবসর কালে শ্রম আইন অনুসারে তিনি আনুপাতিক মাসোহারা ও অবসরকালীন পূর্ণ বিশ্রাম-এর সুযোগ পান। পাশাপাশি পত্র পত্রিকাগুলি আমাদের দেশের শিক্ষার দুরবস্থা এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করে রচনা প্রকাশ করে। যুগবাণী পত্রিকায় অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণ “শিক্ষা সংহার নীতি” শিরোনামায় লেখেন, “জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কংগ্রেসী সরকার সঙ্কুচিত করে চলেছেন। শিক্ষা সংহার নীতি হইল কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের গদী আকড়ে থাকার প্রধান আয়ুধ। জনসমর্থন হারিয়ে পুলিশী রাজের উপর যখন কোন সরকারকে শাসন চালাবার কু-নীতি অবলম্বন করতে হয় তখন তাতে সর্বপ্রথম হাত বাড়াতে হয় শিক্ষার উপর। শিক্ষা উপযুক্ত দেশপ্রেমিক নাগরিক গঠন করে যারা আত্মস্বার্থের চেয়ে দেশস্বার্থকে বড় দেখেন। পুলিশী সরকার দেশপ্রেমিকদের ভয় করে তাই সচেষ্ট হন শিক্ষাকে গলা টিপে মারতে। তাই কলকাতার বৃদ্ধ শিক্ষকের মাথায় লাঠি মেরে তাকে হত্যা করতে, নিরপরাধ নাগরিকদের নির্বিচারে

লাঠিপেটা করতে, এমন কি সাংবাদিককে প্রহার করতে কংগ্রেসী সরকার একদিনে পুলিশের জন্য পেট্রোল খরচ করতেই পারেন ৫৩০০০ টাকার কিন্তু শিক্ষকদের বাঁচবার জন্য ৩৫ টাকা এলাউন্স দাবী করাকে ‘অন্যায় আপত্তিজনক’ বলে উড়িয়ে দেন। বিধান রায়ের গদী নিরাপদ করার জন্য ভোটে পরাজিত জন-অবাঞ্ছিত মন্ত্রীদের হাজার হাজার টাকায় রাখা যায়। দেড় ডজন অকারণ উপমন্ত্রী পোষায় মোটা টাকা জোটে, মিনিস্টার অব স্টেটস-এর ভেঙ্কীর জন্য টাকার শ্রাদ্ধ হয়। কিন্তু শিক্ষার জন্য টাকার কথা উঠলেই চিৎকার ওঠে ‘টাকা নেই—টাকার অভাব।’ ধর্মঘট অবসানের কয়েকদিন পরেই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একই সুর ব্যক্ত হয়। “শিক্ষকেরা যদি সত্যিই জাতির মেরুদণ্ড হইয়া থাকেন তবে, সেই মেরুদণ্ডে ক্ষয় রোগ ধরাইল কে? কিসের জন্য আজ গোটা শিক্ষক সমাজ জীর্ণতাগ্রস্ত, অভাব প্রপীড়িত ও ছাত্র সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম? যে পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থা, মধ্যযুগীয় সমাজ সংগঠন ও গণতন্ত্রবিরোধী প্রবঞ্চনার নীতি ও কৌশল গরীব জনসাধারণকে প্রতিদিন বিক্ষোভ ও বেদনার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহাই কি শিক্ষক সমাজকেও পবিত্র ব্রতের মধ্যে “অপবিত্র ধর্মঘটের” প্রেরণা দেয় নাই? এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিলে ভণ্ডামী কিংবা মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হইবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকগণ আন্দোলন করিতেছেন এবং নিম্নতম বেতন ও ভাতার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ভিত্তির জন্য ক্ষমতাবানদের দুয়ারে বার বার সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ীই শিক্ষকেরা এই দাবী তুলিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কোন গরম রাজনৈতিক দলের পাল্লায় পড়িয়া “কলের কুলিদের মত” মারমুখী হন নাই এবং কোন মনগড়া দাবীতেও লাল ঝাণ্ডা হাতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেন নাই। তথাপি তাঁহারা সুবিচার পান নাই।

“কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে না আছে শিক্ষার কোন নীতি বা বিজ্ঞানসম্মত কোন পরিকল্পনা। একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে শিক্ষামন্ত্রী করা হইয়াছে (এবং তাহাও পশ্চিমবঙ্গের মত একটা প্রকাণ্ড সমস্যাসংকুল দেশে) যিনি বর্তমান যুগ ও জীবন সম্পর্কে “ভাওয়াল সন্ন্যাসীর” জমিদারী আমলে বাস করিতেছেন। আমরা স্পষ্টই বলিতে চাই যে, নতুন যুগের সমস্যা মিটাইবার পক্ষে এই সমস্ত মন্ত্রী উপযুক্ত নহেন। সাহস, দূরদৃষ্টি এবং প্রভূত উদ্যমের দ্বারা যিনি আমূল সংস্কার ঘটাইতে পারিবেন, একমাত্র তিনিই বর্তমান সঙ্কটের দিনে নেতৃত্ব দিতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই লোক আজ সরকারী মহলে কোথায়?”

বস্তুতঃ বুদ্ধিজীবীদের এই সকল মন্তব্য ও মনোভাব পশ্চিমবঙ্গের জনচিত্তের প্রতিফলন মাত্র। দেশের অভ্যন্তরে মানসিকতা পরিবর্তনের ঢেউ আগেই উঠতে শুরু করেছিল। শিক্ষক আন্দোলন তাকে বাইরে টেনে এনেছিল মাত্র। আন্দোলন চলাকালে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় “কলকাতার মেজাজ” শীর্ষক সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য (শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশিত)। তাঁরা লিখলেন “কোন বহিরাগত ভাবতে পারেন যে কলকাতা হিংসাত্মক কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাহলে ভুল হবে। অধিকাংশ নাগরিক বাড়াবাড়িতে বিরক্ত কিন্তু ভীত ও অসহায়। যদিও কেউ কেউ শিক্ষকদের অসন্তোষকে মুনাফা করছেন বলে বিরোধীদের নিন্দা করেন তবে অন্যান্যরা নিশ্চিত নন এ কারণে দায়দায়িত্ব কার উপর বর্তায়। অনেকের গোপন মনের প্রতীক বলে আমরা এক দোকানদারের কাছে যাচাই করতে যাই। তিনি বললেন, গোলমালের সূত্র দূর করতে পারে যে কোন রাজনৈতিক চরিত্রের এমন সরকারকে তাঁরা সমর্থন করবেন। ধারণাতীত বিষয় এই যে অনেকেই বাজে কমিউনিস্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী যে সরকার তার দালালদের দিয়ে ট্রাম ও আপন বাসগুলিতে আগুন লাগিয়ে বিরোধীদের অপদস্থ করেছে। পাশাপাশি বহুল প্রচারিত

ধারণা এই যে সরকার অপ্রস্তুত এবং যোগ্য ব্যবস্থা নিতে ও সঠিক কাজ করতে বিলম্ব করছেন এবং তারাই দায়ী। উল্টোভাবে এই মনোভাবও রয়েছে সরকার অনেককে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন ও উৎসাহিত করতে পারেন। যদি ইতিমধ্যে পুরো ঝুঁকে না পড়ে থাকে, তাহলে, তাঁরা বলেন, কলকাতা শহর সরকারবিরোধী হয়ে পড়ছে। তারা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে যদি সঠিক বিষয়ে যথার্থ ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা নিয়ে কঠোর মনোভাবের সঙ্গে তাদেরকে বিপাকে না ফেলে কাজ করা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি তুচ্ছ বিষয় রয়েছে যাতে ছোটখাট মানুষেরা অসন্তুষ্ট; এটা নতুন দিক। গত জুলাই মাসে (ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে) যা দেখা গিয়েছিল তার চাইতে এবারে অনেক স্পষ্ট। শিক্ষকেরা কম বেতন পান তাদের সংখ্যা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি জনিত প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যার চেয়ে কম। তা সত্ত্বেও শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য এবং তাঁদের দাবীগুলি বর্ধিতভাবে উচ্চে এসে উঠেছে যদি না বোঝা যায় সরকার শেষ অবধি তাঁদের জন্য ভালই করেছে।" আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে "শিক্ষা ও সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী লেখেন........"সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চনার নীতি নির্লজ্জভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। বাংলার মানুষ শিক্ষার জন্য স্বভাবতঃই ব্যগ্র—সেই পথেই তাহার স্বাধীনতার তথা অস্তিত্বের উজ্জল স্বপ্ন সে দেখে। ক্ষমতার মোহেই মদান্ধ যাঁহারা এই কথাটি উপেক্ষা করেন তাঁহারা অনাগত দিনের বিচারসভায় হয়ত আসামী হইয়া দাঁড়াইবেন।" স্বাধীনতা লাভের আগে শিক্ষক সমাজের ধারণা ছিল দেশ স্বাধীন হলে বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। শিক্ষার মান উন্নত হয়ে উঠবে। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষক সমাজ নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে নব চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছেন তার স্পষ্ট ও নির্ভীক অভিব্যক্তিতে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। "এই নব চেতনাকে অস্বীকার করায় শিক্ষক সমাজ পথে নেমে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।" এ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। কর্মবিরতি প্রত্যাহৃত ও সফল হয়েছে। শিক্ষকেরা মর্যাদার জন্য লড়াই করেছিলেন। সমাজ তাঁর মর্যাদাকে স্বীকার করেছে। বিপুল জন-সমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘদিন কোন আমল না দিলেও সরকারের সঙ্গে তাঁদের সন্ধি সম্মানজনকভাবে হয়েছে। তাঁরা নিজেরাই বললেন, "প্রথম রাউণ্ডে লড়াই ভালই হলো।" মূল দাবীর অনেকটা অনিচ্ছুক হাত থেকে বের করে আনা গেল বলে তাঁরা মনে করলেন। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে শিক্ষার সমস্যা আরও নানা জরুরী সমস্যার মত জাতির সম্মুখে এসে পড়লো। আন্দোলন অবসানে তাই বিজয় কেতন উড়িয়ে সমিতির লোকেরা বিদ্যালয় ক্ষেত্রে পেঁছিলেন। কোন পরিচালন কমিটি কোন চাকরী ছেদ না করতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কতকগুলি পরিচালন কমিটি শেষ অবধি ভেবেছিল অন্ততঃ ধর্মঘটকালীন অনুপস্থিতির দিনগুলির জন্য তাঁদের বেতন কেটে নেওয়া যাবে। প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিন্তু পিছু হঠলেন। সমিতির আন্দোলনের মান উন্নত হলো। আন্দোলনে আটক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে আর কলকাতায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি লাগাতার কর্মসূচী নিল। এ কারণে খুব স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় নিহত সাতজন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হলো। বক্তারা হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারকে দায়ী করলেন। এই পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারকে অগ্রসর হতে বলা হলো। শিক্ষক আন্দোলন অবসানের পরও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে নিন্দা করা হলো। অবিলম্বে কলকাতা থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ার এবং আটক বন্দীদের মুক্তিদাবী করে প্রস্তাব নেওয়া হলো। সত্যপ্রিয় রায় বললেন এই

দমননীতি প্রতিহিংসামূলক এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার পথে বিঘ্নস্বরূপ। বক্তব্য রাখলেন অনিলা দেবী, রামাশীষ মিশ্র, বামনদাস মণ্ডল, জ্ঞান সেনগুপ্ত, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ শিক্ষক নেতারা। সভাপতিত্ব করেছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি জ্যোতি বসুর গ্রেফতার প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসুকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে গ্রেফতার করতে পুলিশ উদ্যোগী হয়। পরদিন বিধানসভা ভবনে তিনি আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে বিধানসভা ভবনে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি শিক্ষক আন্দোলনকে সাহায্য না করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে তাঁকে আটক রাখবার সরকারী পরিকল্পনা এভাবে ভেস্তে দেন। সপ্তাহ কাল সেখানে থেকে প্রতিদিন গণ-আন্দোলনের বিষয়গুলি নিয়ে বাজেট অধিবেশনকে উত্তপ্ত করে তোলেন। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপন করে তিনি বিধানসভা পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে পথে বের হতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে। উল্লেখ্য ঐ দিনের সভার ২৪ ঘন্টা আগে তাঁর গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে যায়। সমিতির সভাপতি সেদিনের সভারও সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই ঘটনায় তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে এক উত্তেজক অবস্থা তৈরী করে ফেললেন। বৃদ্ধ সেনগুপ্ত মশায় বলেন, "শিক্ষক আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য জ্যোতিবাবু যে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন তা আমি নিজে জানি, কিন্তু শিক্ষক আন্দোলন মীমাংসার পর তাঁকে গ্রেফতার করে সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।" স্বভাবশান্ত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দুর্বল কন্ঠ বজ্রগম্ভীর কিন্তু উত্তেজনায় প্রকম্পিত হবার সঙ্গে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর উত্তেজনা চরমে উঠল। সরকার যে অত্যন্ত অসমীচিন কাজ করছে সভায় এ প্রত্যয় দৃঢ় হলো। ৮ই মার্চ শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে হাওড়া ময়দানে সভা আহূত হলো। প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে ঐ সভায় সমিতির নেত্রী সুধা রায় বক্তব্য রাখেন। শিক্ষক আন্দোলনে ধৃত তখনও আটক ২৫০ কর্মীর মুক্তি দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২২শে মার্চ ইউনিভার্সিটি হলে বিশাল শিক্ষক সমাবেশ হয়। সংগ্রামের পর প্রথম এই অনুষ্ঠিত সমাবেশে সমিতির নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষকদের বুঝিয়ে বলেন। সত্যপ্রিয় রায় কিভাবে শিক্ষকদের দাবীগুলি অনিচ্ছুক সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে তার বিবৃতি দিয়ে বলেন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। শিক্ষা জাতীয় বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় শেষ অবধি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের সংগঠন বলে বর্ণনা করে তাকে মর্যাদা না দিলেও সমিতির গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শত শত মানুষ আর সংগঠনের শুভেচ্ছা লিপি ও তারবার্তা এসেছে। ৫০ লক্ষ শিক্ষকের বিশ্ব শিক্ষক সংস্থা সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়া ৪০০ শিক্ষকের কারাবরণ এক নজিরবিহীন ঘটনা। তিনি এই ঐক্যকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার আবেদন রাখেন। সভায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বত্র শিক্ষকদের অগ্রসর হতে আহ্বান জানানো হয়। আন্দোলনের সময় প্রধান শিক্ষক সমিতির ভূমিকাকে শিক্ষক স্বার্থবিরোধী বলে প্রবলভাবে নিন্দা করা হয়। বিধান পরিষদে শিক্ষক সদস্য হয়ে কামিনী ঘোষ ও মহীতোষ রায়চৌধুরী যে সব বিবৃতি দিয়েছেন সেগুলি প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয় এবং তাঁদের পদত্যাগ দাবী করা হয়। শিক্ষক আন্দোলনে আটক সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে পৃথক এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। সভাপতির ভাষণে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন, "গত আন্দোলনে শিক্ষক সমাজ যে ঐক্য প্রদর্শন করেন তাকে দৃঢ়তর করে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।"

সংগ্রামে অর্জিত ফল আরও অধিক লাভ করা যেতে পারে কিনা এ সম্পর্কে কর্মীদের মনে অতিরিক্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আন্দোলন তুলে নেবার সময় সমিতি

নেতৃত্বকে এজন্য অনেক আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করতে হয়। কোন্ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে আগামীদিনে শিক্ষক সংগঠন ব্রতী হবে, এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি থেকে। আন্দোলনের অব্যাহিত পরে স্বাধীনতা পত্রিকা রচনা করে—

"দ্বাদশ দিবসব্যাপী অপূর্ব সংগ্রামের পর মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির অবসান ঘটিল। কিন্তু ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রামের অবসান ঘটে নাই। যে ন্যায়সঙ্গত দাবীর উপর দেশের স্বভাবশান্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়া আসিয়াছেন এবং নিজেদের অতুলনীয় একতা এবং আত্মত্যাগের মধ্যে যে দাবিকে তাঁহারা সমগ্র জাতির দাবিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই দাবি আজও সম্পূর্ণ পূরণ হয় নাই। ইহার জন্য তাই শিক্ষক সমাজ ও জনসাধারণকে আগামীদিনে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন কায়দায় আন্দোলন ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। শহীদের রক্তে ভবিষ্যতে সংগ্রামের যে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রচিত হইল তাহা কেবল শিক্ষক সমাজকেই নহে, সমগ্র জাতিকে নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

শোষকের হাত হইতে দাবি আদায় যে কত কঠিন তাহা মেহনতি জনসাধারণ ভাল করিয়াই জানেন। গোটা রাষ্ট্রশক্তি যেখানে দরিদ্রের দাবীকে দমন করিতে পশুর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেখানে শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে অনেক সময়ই পরিপূর্ণ জয়ের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আংশিক দাবী আদায়ের পর পরবর্তী সংগ্রামের জন্য নিজেদের একতা ও সংগ্রাম তখন আরও দুর্বার করিয়া তুলিতে হয়। এদিক হইতে বিচার করিলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষকরা সঠিক পথই গ্রহণ করিয়াছেন।

......তাঁহাদের দাবির পিছনে আজ সমগ্র ভারতের সমর্থন ব্যক্ত হইতেছে এবং এই দাবির সংগ্রাম দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সচল রাখিবার সংগ্রামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম করিয়া সমাজে যাঁহারা বাঁচিতে চাহেন, সমগ্র দেশবাসীর এইরূপ সক্রিয়, ঐকান্তিক সমর্থন তাঁহাদের নিকট নিশ্চয়ই এক অমূল্য সম্পদ। উহা তাঁহাদের নিকট পরিপূর্ণ জয়ের এক অমোঘ অস্ত্র।

দেশের জনসাধারণের সহিত মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন রচিত হইল তাহা আজ আরও বেশি দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। শিক্ষক আন্দোলনের ধৃত সকল বন্দীর মুক্তির জন্য অবিরাম আন্দোলনের সংকল্প শিক্ষকেরা গ্রহণ করিয়াছেন। শহীদদের পরিবারের সাহায্যার্থে তাঁহারা ইতিমধ্যে একটি শহীদ তহবিল খুলিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই সকল পবিত্র সংকল্প পশ্চিমবাংলার সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নতুন শক্তি ও নতুন সমাবেশ সৃষ্টি করিবে।

পরিশেষে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরা আর একবার অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। বৃহত্তর গণ আন্দোলনের সম্মুখে তাঁহারা এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন।

পশ্চিমবাংলার বিজয়ী মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ দীর্ঘজীবী হউক।"

কয়েকদিন পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অভিনন্দন জানান— "পলিটব্যুরো মাধ্যমিক শিক্ষকগণকে তাঁহাদের বীরত্বপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহাদের এই সংগ্রাম শিক্ষকদের দাবীকে শুধু জাতীয় দাবীতে উন্নীত করিয়াছে তাহাই নহে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা আংশিক জয়ও অর্জন করিয়াছেন। জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চিরদিন উজ্জ্বল স্মারক চিহ্নরূপে বিরাজ করিবে।"

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর প্রতিশোধ গ্রহণের তৎপরতা দেখা দিয়েছিল। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির একাংশ সহ সরকার নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন না। কোন অভিজ্ঞতা বা অবস্থা থেকে শিক্ষা নেবার মানসিকতার অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ছাত্র ও শিক্ষক ধর্মঘট সম্বন্ধে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমে নানা সার্কুলার বিদ্যালয়ে পাঠানো হলো। শিক্ষকেরা তাতে সন্ত্রস্ত হলেন না। পরবর্তীকালে সরকার মহার্ঘভাতা দেবার ঘোষণাকে কার্যকরী করবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটালেন। করণিক, গ্রন্থাগারিক ও প্রাথমিক শাখার শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত করা হলো। সমিতি অসীম ধৈর্য্য সহকারে ঐ সব সমস্যা সমাধানে তৎপরতা নিল। বেতনকাটার ব্যাপারে মাত্র ৩০টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উৎসাহী হয়েছিল। উপযুক্ত প্রতিরোধের ফলে দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য পরিচালন কমিটি এই শাস্তি দিতে অক্ষম হয়। বন্দীমুক্তি বিষয়টি অত সহজসাধ্য ছিল না। শিক্ষক ধর্মঘটের অবসানের পরও রাজনৈতিক কর্মীরা কারারুদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্যণীয় ৪৭ জন শিক্ষিকা সহ শতাধিক মহিলা আটক হয়েছিলেন। ঐ সময়ে ২৫০ রাজনৈতিক কর্মীর আশু মুক্তি সমিতি আকাঙ্ক্ষা করছিল। এক মাস আন্দোলনের ফলে এঁরা সবাই জেল থেকে বের হয়ে আসতে পারেন। ১৪৪ ধারা বা ঐ জাতীয় আইন ভঙ্গের অপরাধে কিছু ব্যক্তি ইতিপূর্বে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন আইনে ১৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলে অনেক কাল। ঐ মামলাগুলিতে সহায়তাদানের প্রশ্নে নৈতিকভাবে সমিতি কাজ চালিয়ে যায়। লক্ষ্যণীয় ১৫০টি মামলার মধ্যে ৮ জন শাস্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁদেরকে ৩০ টাকা করে জরিমানা দিতে হয়। এইভাবে শিক্ষক ও সমর্থকদের সর্বপ্রকার শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়। শহীদ পরিবারগুলির প্রতিও মমত্বের নিদর্শন সমিতি দেখাতে পারে। ঐ পরিবারগুলির ছাত্রদের শিক্ষার সহায়তা করতে সমিতি উদ্যোগ নেয়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে সমিতিকে দীর্ঘ আন্দোলনে নামতে হয়। আন্দোলনের ফলে আংশিকভাবে দাবীগুলি মেনে নেওয়াতে মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে সরকারকে অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করতে হয়েছিল। শিক্ষকদের দাবী ছিল রাজ্য সরকারকে শিক্ষার জন্য বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে। গত বছর রাজ্যের বাজেটের ৭ ভাগ মাত্র শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল। বছরের লড়াইয়ের ফলে বরাদ্দের পরিমাণ অনেক বাড়াতে হয়। সর্বশেষে সেটি দাঁড়ায় ১৩·৪ শতাংশে। ইতিপূর্বেই পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন বেড়েছিল। কর্মবিরতির পর ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবীই মেনে নিতে হয়েছিল। যদিও পুরোপুরি সফল করবার প্রতিশ্রুতি ছিল পরবর্তী বছর থেকে। যে সাংগঠনিক তৎপরতায় এই দাবীগুলি আদায় হয়েছিল তাকে আরও নিবিড় করতে সমিতি সচেষ্ট হলো। রাজ্যের জুনিয়ার হাই স্কুলগুলিতে সমিতির পতাকাতলে সমবেত করবার উদ্যোগ নেওয়া হলো। মাদ্রাসাগুলির সমস্যা স্বতন্ত্র। সমিতি সদস্য করে তাদের এই সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা হতে লাগলো। স্থানীয়ভাবে আন্দোলনের স্বার্থে মহকুমা স্তরের নীচে আর একটা সংগঠন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সমিতি একে সাংগঠনিক স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগ নিল। আঞ্চলিক শিক্ষক পরিষদ গঠনের আহ্বান এলো। সম্মুখে এলেন রাজনৈতিক শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষকরা। এঁদের অনেকেই মনোভাবের দিক থেকে কংগ্রেস দলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সংগ্রাম তাঁদের মনোভাবটা পালটে দিল। "সেদিনের শিক্ষকদের আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রমিকশ্রেণী, কর্মচারী, ছাত্র ও অন্যান্য অংশের মানুষের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছিল। সরকারের তীব্র দমনপীড়নের মুখে গড়ে উঠেছিল শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় ঐক্য।" এই সংগ্রামী ঐক্য আরও প্রশস্ত ও উন্নত করবার উদ্দেশ্যে কিছু প্রচেষ্টা বহির্বিশ্বে সমিতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর প্রত্যুত্তরে ১৯৫৪ সালের ৭ই এপ্রিল অস্ট্রিয়ার

ভিয়েনা থেকে বিশ্ব শিক্ষক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পল ভেলানউ সমিতিকে লিখেছিলেন—

"প্রিয় বন্ধু—আপনাদের পাঠানো "টিচার্স অব দি ওয়ার্ল্ড" এবং অন্য সমস্ত নথিপত্র পেলাম। সেগুলি উৎসাহ সহকারে দেখলাম। আমাদের প্রকাশনার পরবর্তী সংখ্যায় এর আংশিক প্রকাশ হবে। তাছাড়া পরের সপ্তাহে প্রাগে আমাদের যে এক্জিকিউটিভ ব্যুরোর সভা হবে তাতে ঐগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং আপনাদের অনুরোধ অনুযায়ী এ ব্যাপারে আমাদের মতামত ও পরামর্শ দেব। আমি উল্লেখ করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রাম সারা বিশ্বে সাংঘাতিক সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।" এর কয়েকদিন আগে চেকোশ্লাভাকিয়ার প্রাহা থেকে ইউনিয়ন অব এডুকেশনাল ওয়ার্কারস্-এর চেয়ারম্যান-এর বক্তব্য তাদের আন্তর্জাতিক বিভাগের সচিব জোসেফ কুটনহরস্কি পাঠিয়েছিলেন—

প্রিয় বন্ধুগণ—আমরা ইউনিয়ন অব এডুকেশনাল ওয়ার্কারসের চিঠির অনুবাদ পাঠাচ্ছি—বন্ধুগণ, সরকারের অবিবেচনার ফলে বাংলার শিক্ষকদের নিম্ন পর্যায়ের সামাজিক অবস্থা থেকে উন্নত হবার লড়াইয়ে অনুগ্রহ করে আমাদের অকৃপণ সংহতি জানুন। সকল শিক্ষকদের জানান, আমাদের প্রতিবাদ উৎসাদনের জন্য পুলিশ যে সন্ত্রাস চালিয়েছে তাকে চেকোশ্লাভাকিয়ার শিক্ষকেরা ক্ষোভ ও ক্রোধ সহকারে ধিক্কার দিচ্ছে। কোন কর্তৃপক্ষের এ অধিকার নেই যারা তাদের কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক চায় তাদের গুলী করে অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করে। আমাদের ধারণা এই বর্বরোচিত কাজগুলি আপনাদের সদস্যদের ঐক্য অনুভূতিকে আরও তীব্র করেছে এবং যে সমাজে বাস করেন সে সমাজে স্থান লাভের জন্য বাংলার শিক্ষকদের দাবীকে আরও জোরদার করেছে।" আন্দোলনের কিছু কাল পরেও মে দিবসের শুভেচ্ছা লিপি এলো গণতান্ত্রিক জার্মান সাধারণতন্ত্র থেকে। তাঁরা লিখলেন, "জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের মুক্ত জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের, ইউনিয়ন অব টিচার্স এণ্ড এডুকেশনিস্ট মে দিবসের সহযোদ্ধার ভ্রাতৃত্বসূচক শুভেচ্ছা জানায়। আপনারা যার জন্য লড়াই করছেন সেই লক্ষ্যে আরও বড় রকমের সফল হোন কামনা করছি। আসুন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। আসুন অন্য দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে আরও নিবিড় ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলি।" এই আবেদন শিক্ষক সমাজের একাংশে সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছল। তাঁদের নিজেদের পত্রিকায় এরকম উদ্ধৃতি দিয়ে নিবন্ধ দেখা যায় "ওই চেয়ে দেখ কত দূর হতে তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে আসে লোক শত শত।" অত্যন্ত স্পষ্ট অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁরা সে বছর ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে ৬৫ হাজার ব্যাঙ্ক কর্মচারী ধর্মঘটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ এর সমর্থনে ও সাহায্যে অগ্রসর,—ঘোষিত হলো।

চুয়ান্নর এ আন্দোলন সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কাছে নতুন প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। প্রাথমিক, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এর প্রভাবে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠলেন। শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবীতে পরিণত হলো। জাতির জন্য শিক্ষা প্রয়োজন এবং তাঁদের আন্দোলন জাতির চাহিদার পরিপূরক এই বোধ ও আত্মমর্যাদা নিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হতে লাগলো। এমনকি বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি তুচ্ছ নয় মূল দাবীর সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এই ভাবধারা প্রসারে কোন বাধা এলো না। লোকে শিক্ষার দৈন্য অবস্থাকে বুঝতে শিখলো। সে দশকে শিক্ষার হার ছিল ১৮ শতাংশ। অথচ মানুষকে সাক্ষর করে তোলবার কোন বাস্তব কর্মসূচী ছিল না। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষা প্রসারের জন্য যে কথা বলেছিল তা ছিল নিরর্থক। সারা দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয় ১৫১·৬৬ কোটি

টাকা। তাতে জন প্রতি শিক্ষার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ হয় ১৪ আনা মাত্র, বর্তমানের ৮৭ পয়সা। সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করে শিক্ষার ব্যয়ের সঙ্গে পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্পর্ক রয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে সরকারের কোন শুভ ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে না। "সেদিনের শিক্ষক আন্দোলন শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে যেমন উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল, অপর দিকে শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যাকে জাতীয় সমস্যার স্তরে উন্নীত করতেও সমর্থ হয়েছিল।" অল আসাম এইডেড হাই স্কুল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন এর দৃষ্টান্তে এই আন্দোলনের এক মাস পরে তাঁদের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। সমস্ত ভারতব্যাপী নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য অনতিকাল মধ্যে শিক্ষকেরা কিভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করা, শিক্ষকদের নাগরিক ও আর্থিক অধিকার, গঠনতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে লব্ধ করা, চাকুরী ক্ষেত্রে সর্ববিধ অবিচারের বিরুদ্ধে অধিকার সম্প্রসারণের জন্য ১৯৫২ সালে বিশ্ব শিক্ষক সংস্থা ১৫ ধারাযুক্ত 'শিক্ষা সনদ' তৈরী করেছিলেন। এই ধারাগুলি অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালের ৭ই আগস্ট 'সনদ দিবস' পালনের ডাক দিলেন এ. আই. এফ. ই-এ, সর্বভারতীয় শিক্ষা সংগঠন। সনদ দিবসকে ঘিরে অদ্ভূত সাড়া দেশব্যাপী লক্ষ্য করা গেল। এই প্রথম শিক্ষার দাবীতে এক সর্বভারতীয় কার্যক্রম সর্বত্র অনুসৃত হলো। আর প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষকেরা একই মঞ্চে দাবীতে নেমে পড়লেন। সংবাদে প্রকাশ বোম্বাই, আমেদাবাদ, বেলগাঁ, মাদ্রাজের টুমকুর, চিকমাগালুর, সিমোগাঁ, হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, গোয়ালিয়র, বাঙ্গালোর, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের সাগর, কাটনি, ওয়ার্ধা, বিহারের জামসেদপুর, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে ঐদিন সাড়া পড়ে যায়। শিক্ষকেরা দাবী সনদ পাঠ করেন ও ব্যাখ্যা করেন উপযুক্ত জমায়েতের মধ্য দিয়ে। দেশের এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এক শিক্ষক সমিতি—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই সব কর্মকাণ্ডের বিশেষ ভূমিকায় নির্বাচিত হতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষক সম্মেলনে তাঁরা আহূত হন। সমিতির নেতারা সভাপতি প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। জাতীয় ইতিহাসে নতুন পাতা সংযোজিত হয়েছে বলে সে সময়ে শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী লিখলেন—

"বর্তমানের বিদ্যালয়ের বদ্ধ আবহাওয়া বিদেশী অনুসৃত পথে বিদ্যাদানের নামে এখনও চলে জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংকোচনের যে সরকারী নীতি, শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকার দোহাই বেড়ে চলে যে ভুয়ো উপদেশ ও বঞ্চনার ধোঁকাবাজি, তার নগ্ন স্বরূপকে দেশের ও দশের সামনে উদ্ঘাটিত করে শিক্ষা দাবীকে জাতির দাবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের জাতীয়তা বিরোধী ব্যর্থ নীতির কথা তুলে ধরে জনসাধারণের কাছে শাসকদের বিচার প্রার্থনা করাই ছিল শিক্ষকদের এই প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে, ব্যবধানের জড়তা ভেঙ্গে ফেলে, পশ্চিমবাংলার লাট প্রাসাদের পাশে উন্মুক্ত রাজপথে স্বদেশী সরকারের পুলিশ বেষ্টনীর সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিরোধে দৃঢ় পশ্চিমবাংলার সহিষ্ণু শিক্ষক সমাজ পাঁচটি দিনের জন্য যে নব বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন—সে বিদ্যালয় থেকে জনসাধারণ পরম শ্রদ্ধায় পাঠ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার দাবী আজ জাতীয় দাবীর পর্যায়ে উন্নীত। সংগ্রামী শিক্ষক আজ সংগ্রামী মানুষের মাঝখানে আপনাদের স্থান চিনে নিতে পেরে মহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।"

সমকালে এই সুর অনুরণিত হচ্ছিল শিক্ষক সমাজের মনোজগতে। শিক্ষক কানাইলাল গোস্বামী লিখেছিলেন—

"ওহে শিবযোগী সনাতন
তান্ত্রিক বিভূতি নয় এ যে ধূলি তব অঙ্গে
পথের ধূলির অংকন,
এ যে বাস্তবের রাজপথের ধূলি
এঁকেছে আপন ছন্দে পবনের তুলি,
দেহভঙ্গি দেখে হাসে আকাশের তারা,
নীচে হাসে বিপণির ধারা,
অদূরে ছায়ান্ধকারে অদৃশ্য আবাসে
খরশান ক্রূর হাসি হাসে
আত্মঘাতী পিশাচের দল
হাসে খল খল।
জন সমুদ্রের অন্তরের অভ্যন্তর হ'তে
নৃত্যময় অভিযান পথে
মহেশ্বরী বাহু প্রসারিয়া
ধীরে আসে চরণ ফেলিয়া
মহামিলনের মোহনায়—
দৃষ্টি যেন দেখা দিল প্রলয়ের দিগন্তরেখায়।"

"তার পরে উড়িয়াছে মেঘ কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো শান্ত ছবি"

১৯৫৮ সালে আবার এক বৃহত্তর শিক্ষক আন্দোলন হয়। শিক্ষকদের দাবীদাওয়া মুখরিত করে ব্যাপক জনসাধারণ এতে এগিয়ে এসেছিলেন। আন্দোলনের প্রথম দিনে রাজ্যের দু'লক্ষ ছাত্র এতে যুক্ত হয়েছিল। অন্যান্য দিনে নানা স্থানে স্কুল কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়। '৫৪ সালে মীমাংসার সময় সরকার যে আশ্বাস দিয়েছিল কার্যকর করবার মুখে তাতে অনেক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এর প্রতিবাদে শিক্ষকদের বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক পরবর্তী ২ শ্রেণী যোগ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর করতে সুপারিশ করে। অথচ সেটি কার্যকর করবার নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবৈজ্ঞানিকভাবে ১১ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করে। এর প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ গঠনের দাবীতে '৫৮ সালে আন্দোলন আবার গড়ে উঠল। অন্যান্য আন্দোলনের চেয়ে এ আন্দোলন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এ কারণে যে "আবেদনের শেষ পর্যায় হিসাবে আত্মনিগ্রহের পথে" শিক্ষকেরা পনেরো দিনের অনশন কর্মসূচী নিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বসে পড়েছিলেন। কলকাতায় ৩৩ জন এবং মফঃস্বল শহরে সাতটি কেন্দ্রে আরও শিক্ষকদের একটানা অনশন চলছিল। এই কর্মসূচীতে জেলায় জেলায় শিক্ষকেরা প্রতীক অনশন করছিলেন। সর্বত্র সভা, মিছিল, অনশন শিবিরে হাজার হাজার মানুষ, ছাত্র, রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের কর্মীদের উপস্থিতি চাঞ্চল্য এনেছিল। ওদিকে সরকার আগের চেয়ে আরও কঠিন মনোভাব গ্রহণ করছিলেন। "আলোচনা নিষ্প্রয়োজন", মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সাফ বলে দিয়েছিলেন। সাত দিনের মধ্যে এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়। বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্যোতি বসু, দেবেন সেন, হেমন্ত বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টায় সরকার তার অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। দশম দিনে ডাঃ রায় স্বয়ং নির্দিষ্ট দাবীগুলি মানা হলো বলে সমিতি নেতৃত্বকে সাক্ষাতকারে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন। সমস্যা জর্জর শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দাবীতে বিশেষ করে

সঙ্গতিহীন মাধ্যমিক শিক্ষাধারা চালুর প্রতিবাদে, রাজনৈতিক আদেশে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে বেতন ও ভাতা বাড়ানোর দাবীতে পরবর্তীকালে আন্দোলন হয়েছে। এগুলি গণ মিছিল, প্রতীক ধর্মঘট, অনশন, একটানা কর্মবিরতি এবং অবস্থান আন্দোলনের আকারে এক একবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়েছে। বরাবর তদানিন্তন সরকার সমিতিকে প্রতিপক্ষ মনোভাবে দেখেছেন এবং সে রকম ব্যবহার করেছেন। খণ্ড করবার কৌশলে নতুন নতুন শিক্ষক সংগঠন হয়েছে এবং এগুলি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়ার কাজ চলেছে। এমনকি আইন করে শিক্ষক আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় কি না এই মতলবে "ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউশন বিল" আনা হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। এই সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লড়েছেন। ঐ বছর সরকার নাগরিক অধিকার খর্ব করতে উদ্যত হয়েছিল "পশ্চিমবঙ্গ মিছিল ও জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রন বিল" উপস্থিত করে। গণতন্ত্র রক্ষায় সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শিক্ষকেরা এগিয়েছেন এর বিরুদ্ধে। এগুলি প্রত্যাহার করবার লড়াই করে তাঁরা এই ধারণা নিয়েছেন যে বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। আর একাকী থেকে গিয়ে বাঁচা যাবে না।' ১৯৬২ সালে চীন ভারত বিরোধে আবার সমিতির উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। রবীন্দ্র সরোবরে নির্ভয়ে সমিতির পতাকাতলে দাঁড়িয়ে এবং শোভাবাজারে সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে ঐক্যের সুরে তাল দিয়ে কাতারে কাতারে সমিতি সদস্য ঐ আঘাতকে চূর্ণ করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিধি দিয়ে ভারাক্রান্ত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বিভক্ত করা, মাঝে মাঝে নবনীতির নামে বিদ্যালয়ের অস্তিত্বকে আতঙ্কিত করা, সর্বোপরি শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের বঞ্চনামূলক আর্থিকনীতিতে অসন্তুষ্ট করা ছিল শিক্ষাপ্রশাসনের চিরায়ত অভ্যাস। ষাট দশকের শুরুতে এগুলির বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রাম চলেছে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবীতে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ব্যয় বাড়াতে সমিতির কর্মসূচী সর্বভারতীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব শিক্ষক সংস্থা "ফিজে" নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবু এ সময় শিক্ষক আন্দোলনের নেতারা বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার হয়েছেন। স্কুলে যাবার পথে ভারতরক্ষা আইনে তাঁদের আটক করেছে। এসব অভিজ্ঞতায় শিক্ষকেরা উপলব্ধি করেছেন—সর্বস্তরের বঞ্চিত মানুষ, তিনি শিক্ষক হোন আর শ্রমজীবী মানুষ হোন, সবার বাঁচার লড়াই এক সূত্রে বাঁধা। তাইতে সে দশকের মাঝামাঝি সংগ্রামের কঠিন দিনে কৃষক শ্রমিক শিক্ষকের এক মঞ্চ "রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি" গড়ে উঠেছে। সর্বস্তরের শিক্ষকেরা বার বার বিপুল সংখ্যায় মিছিলে মিলেছেন। এভাবে শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষকের মিলিত বিশাল সংগঠন "১২ই জুলাই কমিটি"র জন্ম হলো ১৯৬৬ সালে। সমিতির দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতিতে এ সময়ে বৃহত্তর আন্দোলনও জন্ম নেয়। বাইরে সরকার বিরোধী গণ বিক্ষোভ প্রচণ্ড উত্তাল হয়। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে ২৬ দিন শিক্ষকেরা নানা পর্যায়ের শক্তিশালী আন্দোলন করলেন। কর্মবিরতি ও রাজপথে দিনরাত অবস্থান থেকে আইন অমান্য আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁৗছাল। দৈনিক আইন অমান্য করে আড়াই হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা জেলে থাকলেন। এমন তীব্র শিক্ষক অন্দোলন নজিরবিহীন ঘটনা। তবু সরকার নমনীয় হলেন না। আন্দোলন এক তরফা প্রত্যাহৃত হলো। কিন্তু কারাগার থেকে নব চেতনার জন্ম হলো। সেখান থেকে উদ্ভূত ভাবনায় সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় এবং জনগণকে আহ্বান দেয় "চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে শিক্ষাবিরোধী ও জনস্বার্থের ক্ষতিকর সরকার বদল কর"। অনতিকালের মধ্যে সমস্বর উচ্চারিত হলো বিভিন্ন গণসংগঠনের মঞ্চ থেকে। মহীরূহ বলে খ্যাত কংগ্রেস সরকারের পতন হলো সেই নির্বাচনে। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠল। নতুন সরকারের শিক্ষানীতি প্রনয়ণে সমিতির সংগ্রামী

শক্তি দায়িত্ব পালন করতে চায়। নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধুভাণ্ড শোধন করবার স্বার্থে সমিতি পাঁচদিনের শিক্ষা সেমিনার করে। ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের পরিশ্রমে গড়া এর ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। সমাজের প্রতি সমিতির দায়বদ্ধতার প্রকাশ সেমিনার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। আর গণতান্ত্রিক মানুষের শিক্ষার স্বত্ব হিসাবে সুপারিশে সরকার ও শিক্ষা পরিচালনার তত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্বল্পকালেই মিলিয়ে যায়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের তৎপরতা দেখা যায়। এ সময়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষকেরা অন্যান্য স্তরের মানুষের সঙ্গে একযোগে প্রতিবাদে অগ্রসর হন। সরকারের পতন হলেও তার অভিজ্ঞতা মানুষের মনে গেঁথে যায়। তাই পরবর্তীকালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার আসে। আর তার শিক্ষামন্ত্রী হন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমিতির সংগ্রামী রূপকার সত্যপ্রিয় রায়। তাঁর প্রচেষ্টায় সে সরকার জনসাধারণের সম্মুখে এক সুসংবদ্ধ শিক্ষা-নীতি প্রকাশ করে। দেশে সর্বপ্রথম এ ব্যাপার। সরকারী কার্যকলাপ—শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা, ব্যাপকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রকে উদ্দীপ্ত করে রাখে। শিক্ষার দাবী সমূহের ভিত্তিতে বিশেষ করে অবৈতনিক শিক্ষার দাবীতে রাজ্যের সর্বত্র মিছিল, মিটিং, কনভেনশন, দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবীপত্র পেশ এবং ১৯৭০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হয়। সমাবেশে শিক্ষার দাবীতে অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয়তার উদ্দেশ্যে চল্লিশটি সংগঠনের সাধারণ ও বঞ্চিত মানুষেরাই এসেছিলেন। যোগদানকারীদের অধিকাংশের সন্তান সন্ততি সেদিন স্কুলে পড়তে পারতো না, কিন্তু তাঁরা একটা স্বপ্ন দেখে এসেছিলেন এবং তাঁদের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে সমাবেশ থেকে এই প্রত্যয় বহন করতে পেরেছিলেন। শিক্ষকেরাও বুঝেছিলেন আসলে তাঁদের ভবিষ্যত জন-সমাবেশের মাধ্যমেই। তাইতে একে শিক্ষার দাবীতে মহা-সমাবেশ বলা হয়। এ উচ্ছ্বলতাও অল্পকালের মধ্যে শেষ হলো—দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হলো। তার পর ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত সমিতির জীবনে প্রত্যক্ষ করা গেল। চন্দননগর বার্ষিক সম্মেলনে সমিতি থেকে একদল শিক্ষক সরে আসলেন। '৭০ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর আঘাত শিক্ষাক্ষেত্রেও নেমে আসলো প্রচণ্ড আকার নিয়ে। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর আক্রমণ সর্বত্র। বিভিন্ন মূর্তিতে সেগুলি সাধারণ শিক্ষককেও আতঙ্কিত করে তোলে। পাশাপাশি সে সময়ে এমন সরকারী নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতে থাকে যাতে স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ে। ছিয়াত্তর সাল অবধি এ তাণ্ডবে শারীরিক আক্রমণের মুখে সংখ্যাতীত শিক্ষক শিক্ষাকর্মী গৃহচ্যুত ও কর্মচ্যুত হন। ঘাতকের হাতে নিহত হন কয়েকজন সমিতি নেতা ও কর্মী। আর গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে থেকেও অন্যান্য নেতাদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। সমিতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাত্মক ঐ আক্রমণের মুখে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা নিয়ে সেদিনও লড়াই চলেছে। শিক্ষা হঠাবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমিতির "শিক্ষা বাঁচাও" আন্দোলন সমিতিকে অজেয় রেখেছে। বৃহৎ ও ব্যাপক গণআন্দোলনের সুরে তার আওয়াজ মিশে গিয়ে একদিন সমস্ত অপশক্তির অবসান ঘটিয়েছে। "সমিতি তার লক্ষ্য সাধনার জয় পরাজয়ের আঁকাবাকা পথে এগিয়ে চলেছে। চলার পথের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাই তাকে শিখিয়েছে শিক্ষাসমস্যা বৃহত্তর সমাজ জীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজ কল্যাণের প্রশ্ন থেকে দূরে থেকে শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীজীবনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও অসম্ভব। শিক্ষা আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে।" তাইতে '৭৭ সালে গণতন্ত্র

সচেতন মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এঁরা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এর পর থেকে সমিতি প্রয়াস নিজেকে চরম বিজয়ী বলে মনে করে যখনই বামফ্রন্ট সরকার তার শিক্ষানীতিতে রূপায়িত করতে অগ্রসর হন। কেন না এগুলির জন্যই পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। তবু শিক্ষা সমাজের উপরি-কাঠামো। বিপ্লবোত্তর সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রের কোন সমস্যার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের বিপ্লব চেতনা, ও প্রয়োজনবোধ বিকশিত হবার পক্ষে শিক্ষা একটি মূল্যবান হাতিয়ার। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নিজস্ব উন্নয়নের দাবীর সাথে এই হাতিয়ারটিকে সর্বদা শানিত করে চলেছে। তাই নিজ ও দশের স্বার্থে ১৯৮১ সালে সাধারণ সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' সমিতিরও লক্ষ্য বলে স্থির করেছে।

১৯৫৪ সলের আন্দোলনের কথা ফিরে আসে। সেদিনের উপস্থিত জনগণকে শিক্ষকেরা আপন বৃত্তের সীমায় থেকেই দেখেছিলেন। সংগ্রামী সমিতি শিল্পীর সচেতন সৃষ্টি-কৌশলে সেখান থেকে স্পর্শক টেনে বৃত্তায়ত এ সমাজকে নিয়ে গেল বিশাল পরিমণ্ডলে। এভাবে কোন এক সময় শিক্ষকসত্তা জনগণের সংগ্রামশীল চেতনার সুবিশাল কায়ায় অচ্ছেদ্য হয়ে গেল। সার্থক কবি ও শিক্ষক যিনি ১৯৫৪ সালেই আন্দোলন প্রবাহে এর ভবিষ্যত দর্শন করে "মহামিলনের মোহনায়" সেদিন নিজেদের অবস্থানটি ঘোষণা করেছিলেন। মোহনা তো সাগর পথে যেতে। তারপর বিগত তিন দশক ধরে প্রবাহমান স্রোতধারা এঁদের সাগরে ঠেলে দিয়েছে যার রূপটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে দিয়েছেন—

"হারাইয়া চারিধার   নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোল ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, উর্ধশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কুল—" † ৫১

তেরো

শিল্প-সাহিত্য ও আন্দোলন

"এই চিরাচরিত প্রথায় চলে আসছিল তাদের পুরুষানুক্রমিক জীবন। দুধে ভাতে না হোক, মোটা ভাত ডাল এবং খাটো মোটা কাপড় গামছার অভাব এতে হয় নাই। হঠাৎ কেমন নতুন ঢেউ এল। ঐ তেরো'শ সাল সেটা নিয়ে এসেছে। আড়াই মাইল দূরে ভদ্রজনের গ্রাম রত্নহাট। রত্নহাটেই হল এক মাইনর স্কুল।......তারপর পাঁচ সাত বছর ধরে রত্নহাটেই হল বড় ইস্কুল—এইচ. ই. ইস্কুল। এরপর গাঁয়ে যেন হিড়িক পড়ে গেল।" † ৪৯ দেশ কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও জীবনের রূপ ফোটানো গ্রাম্য জীবনের চারণ কবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবে 'সন্দীপন পাঠশালা' রচনা করেছিলেন। লিখেছেন স্কুল গড়ার কাহিনী। গ্রামের দু' এক জন যুবক যৎসামান্য লেখাপড়া শিখে বিদ্যাটাকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগাতে চায়। সীতারাম কৃষক সন্তান হয়েও দুঃসাহসিকভাবে গড়ে তুলেছে সন্দীপন পাঠশালা। নিম্নবর্গের মানুষেরা পয়সা দিয়েও পাঠশালায় আসে, কারণ ঃ 'কাল এখন পালটেছে, এখন আর মুখের কথায় বন্দোবস্তও হয় না, দলিল—'ডেমি' কাগজে দু'খানা দলিল হয়, টাকা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। তাও প্রথম ওরা টিপছাপ দিয়ে রসিদ নিয়ে চলে আসত সরল বিশ্বাসে। কিন্তু কাল যত এগুচ্ছে এতে গোলমাল বাড়ছে। আজকাল রসিদে গোলমাল বেরিয়ে পড়ছে। তাই নাম সই আর দলিল পড়তে পারবার মত লেখাপড়াটুকু মাত্র ওরা শিখতে চায়, তার বেশি নয়।" এবং 'সাঁওতালরা ক্রীশ্চান হয়ে ডেপুটি হয়েছে। সে শুনেছে। শুনেছে, এইসব ছোটজাত বলে যারা পরিচিত, তারা লেখাপড়া শিখলেই গভর্ণমেন্টের ঘরে ভাল চাকরি পায়।' নব প্রচেষ্টার বিপরীত মেরুতে এসে দাঁড়িয়েছে বাবু (সামন্ত)-রা। শিক্ষকদের শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে অন্য বৃত্তি করে বেঁচে থাকার আহ্বান ছিল। সৎ ও কর্মদক্ষ পরিচিতি সীতারামের ছিল। কিন্তু তা পরিহার করে ব্রত হিসেবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করে। দুরন্ত ছাত্রের ভালবাসায় ভাঙাগড়ার খেলায় সে টিকে থাকতে পারে। রাজনীতি আসে স্কুল গড়তে। বাবুরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পদ লেহন করে পাঠশালা ধ্বংস করতে চায়। স্বদেশী আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভোটে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সীতারামের গড়বার শক্তি সাহায্য প্রায়। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন নিয়ম-নিগড়ে বিদ্যায়তনগুলি বেঁধে ফেললো। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন। সীতারাম পাঠশালার স্রষ্টা। পাঠশালার নাম পরিবর্তিত হলেও বেঁচে আছে, তাঁর মূল লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত, সে আনন্দ পায়। আবার দুঃখিত যে সেখানে স্বাধীন-সত্তার অভাব ঘটেছে। এই দুঃখবোধ দেশের প্রবাহমান স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মিশে শিক্ষকের কামনার বিন্দুটিকে বড় করে তোলে। আর একটি ছোট গল্প "কাক পণ্ডিত"-এ তারাশঙ্কর শিক্ষকের ছাত্র-প্রীতির এক অনবদ্য কাহিনী লিখেছেন। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের জন্য নিঃস্বার্থ পণ্ডিতমশায় আপন মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে অম্লান হয়ে আছেন তাতে। বাস্তবিকপক্ষে গল্পে নয় এই বাস্তবতার মধ্যেই অতীত থেকে শিক্ষকেরা নিজেদের আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থার এক আবেগময় চিত্র 'পল্লী সমাজ'-এ তুলে ধরেছেন। 'ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ

করিতে লাগিল। মাস্টার পণ্ডিত চারিজন এবং তাঁহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাইনর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তাহাদের নামধাম বিবরণ পাড়ুই মহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকদের কোনমতে ও গভর্ণমেন্টের সাহায্যে আর একজনের সঙ্কুলান হয়, শুধু একজনের মাহিনাটা গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন চারি মাস ক্রমাগত ঘুরিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে আট দশবার করিয়া হাঁটাহাটি করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশী আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং পাঁচ ছয়টা গ্রামময় তিনমাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া সাতটাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল আপনার মাহিনা কত?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার। পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্ণমেন্টের হুকুম কিনা, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সাব ইনস্‌পেক্‌টর বাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে। আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন—আমি মিথ্যে বলছিনে।

রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মান হানি হয় না?"

ব্যবস্থার নির্মম পরিহাসে শিক্ষকদের এই অমর্যাদা শুধু শিক্ষকেরা নন, তাঁদের প্রিয় ছাত্রেরা সর্বাঙ্গে মেখে ক্ষোভে থাকতো। "এই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না" লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী তার "চাচা কাহিনী"র পঞ্চম খণ্ডে। সেখানে সৈয়দ সাহেবের পরম আত্মীয়ের ও শ্রদ্ধার পণ্ডিত মশায়ের ব্যথায় জর্জরিত হয়েছে তাঁর লেখনী। বিদ্যালয় পরিদর্শনরত লাট সাহেবের সাথী তিন পাওয়ালা কুকুরের জন্য বরাদ্দ পঁচাত্তর টাকা জেনে ক্ষুব্ধ পণ্ডিত মশায় ছাত্রদের অঙ্ক দিয়েছিলেন। তাহলে তিনি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধমাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আট জনকে নিয়ে মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পেলে লাট সাহেবের কুকুরের কয় ঠ্যাংয়ের তিনি সমান?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সঙ্কট আরও ঘনীভূত। জনজীবনে যুদ্ধের প্রেত কালো ছায়া। বুনো রামনাথের মত যাঁরা তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে জ্ঞান তপস্বী আচার্যের মানসিক প্রশান্তি নিয়ে খুশী থাকবেন তাঁরাও টাল খেলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দুঃশাসন' গ্রন্থের 'ভাঙা চশমা' গল্পে তার চিত্র উপস্থিত করেছেন। যুদ্ধ সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষকতা বৃত্তি থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা চলে গেলেন সরকারী চাকুরীতে। অতি সহজে তখন তাঁরা সেটি পেয়ে গেলেন। যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের শূন্য মূল্যবোধের স্পর্শ প্রাক্তন শিক্ষকদের বিবেকবিদ্ধ করত লেখক এমন এক 'কথক' চরিত্র উপস্থিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসলেন এক ভদ্রলোক অথবা ভূতপূর্ব ভদ্রলোক বললে বোধহয় নির্ভুল হয় এমন এক ব্যক্তি। ময়লা জামা কাপড়, ছেঁড়া কেম্বিসের জুতো যার মধ্য দিয়ে পায়ের তিন চারটি আঙুল বের হয়েছে। সাদাকালো দাঁড়ি, চোখে ভাঙ্গা চশমা। না, তিনি কোন রিলিফ নিতে আসেন নি কথক একটু পরেই বুঝতে পারেন। সগর্বে ঘোষণা করলেন "তিনি মাইনর স্কুলে হেড মাস্টার।" বলেন, "আচ্ছা বলুন তো প্রিপজিশন না পড়লে কি ইংরাজী শেখা যায়?" লোকে তাকে পাগল বলতো। "মৃত বাংলার প্রেত মূর্তি" আকস্মিকভাবে একদা কথককে ধরে বসে এক জ্যোৎস্না রাতে তিনি যখন নির্জনতা উপভোগ করছেন। কথক পালাবার অছিলা করেন, চেষ্টাও করেন।

কিন্তু হিপনেটাইজ হয়ে যান। জ্বলন্ত চশমাকে অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। তাঁর মনে হয় যেন অশরীরী আত্মার আহ্বানে শ্মশান ঘাটের দিকে যাত্রা করেছেন। "আসুন স্যার দয়া করে আসতেই হবে আপনাকে।" "বুড়ো মানুষ, আধপেটা খেয়ে স্কুল গড়ে তুলেছি। আপনি একবার দেখবেন না।" তিনি নিয়ে যান আটচালা বাড়িতে যার অর্ধেক ধ্বসে পড়েছে। মেঝেতে পচা খড় আর গোবরের ভ্যাপসা গন্ধে সেখানে টিকে থাকাই দায়। মাস্টার মশায় বলেন তিল তিল করে কেমনভাবে স্কুল গড়েছিলেন। দেশের ছেলে তৈরী হতো সেখানে। এলো দুর্ভিক্ষ। "কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা।" মরে গেল। পালিয়ে গেল। সারা জীবনের স্বপ্ন শেষ। পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন "আছে, সবাই আছে। তারা কোথাও যায়নি, যেতে পারে না। আপনি শুনুন। কেমন করে পড়াতে হয়।" তাঁর দরদভরা অত্যন্ত উন্নত পাঠদান প্রদর্শিত হলো। কথক স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। নিজেকে এই বৃত্তি থেকে পলাতক মনে করে আত্মগ্লানি ভোগ করলেন। কর্তব্যপরায়ণ অবিচল দুঃখজর্জর শিক্ষকের সম্মানে তাঁর মাথা নত হয়ে রইল। সত্যই তখনকার সমাজে বেশ কিছু শিক্ষককে এবং সাধারণভাবে শিক্ষকদের এই অপবাদ দেওয়া হতো যে তাঁরা প্রকৃতিস্থ নন। প্রতিকূলতা ও বিপর্যয় এবং তার মধ্যে অবিচল ও আদর্শে অটুট থাকা শিক্ষকদের এই প্রতিচ্ছবি এই গল্পে সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে। এই সময়কালের স্কুল নিয়ে দুজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক দু'টি বড় উপন্যাস লিখেছেন। মনোজ বসুর "মানুষ গড়ার কারিগর" ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনুবর্তন" রচিত হয়েছে। মানুষ গড়ার কারিগর সম্পর্কে স্বনামধন্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আমরা উচ্ছ্বসিত মনোভাব পোষণ করি যে, ইহাদিগকে এক আদর্শ যবনিকার অন্তরালে দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। লেখক এই আদর্শ যবনিকা সরাইয়া ইহাদের প্রকৃত বাস্তবরূপে আমাদের দেখাইয়াছেন। আদর্শব্রতে দীক্ষিত শিক্ষক আজ পেটের দায়ে তাঁহার মহিমান্বিত আদর্শ ভুলিয়া যে কতটা হীন কৌশল, ঈর্ষ্যাদিগ্ধ প্রতিযোগিতা ও উঞ্ছবৃত্তিতে নামিয়েছে উপন্যাসে তাহাই দেখানো হইয়াছে।...... যাঁহারা জীবন শিল্পী ছিলেন তাঁহারা আজকাল কারখানার কারিগরে রূপান্তরিত হইয়াছে। হাতের দক্ষতা হারাইলে কারিগরের যেমন চাকরি যায় পাশ করাইবার কৌশল নষ্ট হইলে শিক্ষকের সেইরূপ মূল্য কমে।" প্রখ্যাত সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর মন্তব্য "অনুবর্তনের হাই স্কুলটি কলকাতা শহরের এবং শিক্ষকদেরও বাস শহরেই। কিন্তু তাঁরা এমনি হতচ্ছাড়া এবং দারিদ্র পীড়িত যে যেন শহরে নয়, কোন এক ভাঙা গ্রামে বাস করছে। এবং বিভূতিবাবুও ঠিক এমনি পরিবেশে নিজের আনন্দ শিল্পক্ষেত্রটিকে খুঁজে পান। এই পরিবেশে শিল্পীরূপে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সেই জন্যই শহরের বড় রাস্তা থেকে তিনি গলির ভিতরে প্রবেশ করে শিক্ষকদের অথবা দরিদ্র পাঠ্যপুস্তক লেখকদের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন বার বার। এমনকি দমবন্ধ করা রান্না ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করে তিনি তার দৈন্যের চেহারাটা উদ্ঘাটিত করেছেন। এ জন্য তিনি স্কুল মাস্টারকে পাড়াগাঁ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। শিক্ষকেরা কেউ বা তার হীনতাকে মেনে নিয়েছে। তা নিয়ে কারো বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন অভিযোগ নেই।

কেউবা তাদের দুরবস্থার প্রতিকার চায় অথচ প্রতিকার আদায়ের সাহস নেই, সামর্থ্য নেই। কত নিচের ধাপে নামলে একজন শিক্ষক ছাত্রের জন্য বরাদ্দ পয়সা অথবা খাবার চুরি করতে পারে সে দৃশ্য করুণ।...হতভাগ্য যদু মুখুজ্যের মত এক ট্রাজিক চরিত্র সৃষ্টি বিভূতিবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়। এবং সে হতভাগ্য বলেই তা এমন জীবন্ত, এমন হিউম্যান, এমন সফল। সে অপমানে বিচলিত হয় না। অভাবের জ্বালায় স্ত্রীকে আর এক দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়ীতে ফেলে আসে। উদ্ধারের নামও করে না, চিঠি দিলে উত্তর দেয় না। ...অন্তিমকালে সে চিন্তা করছে, দু'একটা অন্যায় কাজ। দু'একটা চুরি ঠিক বলা যায়

না—চুরি নয়, তবে হ্যাঁ, একটু আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকার করিতেছেন। ভগবান গরীব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, অসামান্য সমাপ্তি।"

বস্তুতঃ দুটি উপন্যাসই সমকালের, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত ও চিরায়ত ইতিহাস। শিক্ষক নির্বাচন, তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচী, তাঁদের পরিচালন প্রক্রিয়া, তাঁদের প্রাপ্য মান-অপমানের জ্বালা নিখুঁতভাবে উপস্থিত। শিক্ষকদের পাঠদান, ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা ও তার প্রতিদান, তাদের ফাঁকি দেওয়া, আর্থিক দৈন্য ও তার জন্য প্রক্ষেপ সহজ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেক্রেটারী ও বিদ্যালয় সভাপতি প্রধান শিক্ষকদের কিভাবে দেখেন, তাঁদের সভা পরিচালনার জনপ্রিয় চিত্র রয়েছে। আত্মদহনে দগ্ধ শিক্ষক কিভাবে সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচবার প্রচেষ্টায় সময় কাটাচ্ছেন যার জন্য নিজ সন্তান উপেক্ষিত ও শিক্ষাবঞ্চিত এবং স্ত্রী মনুষ্যত্বের সামান্য পাওনা থেকে বর্জিত তার নির্মম চিত্র উভয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিক্ষককুল। অসংখ্য গল্প প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা শিক্ষক জীবন ঘিরে রচনা করেছিলেন। আত্মভোলা প্রকৃতির অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে তারাশঙ্করের 'মধু মাষ্টার' তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছে। বিভূতিভূষণ শিক্ষক নারায়ণবাবু'র গল্প লিখেছেন 'অনুসন্ধানে'। দেশসেবকের মৃত্যুতে স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় সভা করেছিলেন বলে তাঁর চাকরী গেল। একমাত্র ছেলে বিপথগামী—ছেলে জেলে আটক হয়ে আত্মহত্যা করে। নারায়ণবাবুর পরিচিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই দুঃসংবাদ জানান। রোগ শয্যায় শায়িতা স্ত্রীর সামনে সে চিঠিটা তুলে ধরেন।

"সন্ধ্যা হয়ে এল। বাইরে থেকে ছেলেরা এসে হাঁক দেয়—স্যার বাড়ী আছেন? নারায়ণবাবু স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে ছেলে পড়াতে যান বাইরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তিনি একদল গ্রাম্য বালকদের মধ্যে বসে ভূগোল ব্যাখ্যা করছেন—

পৃথিবীর একভাগ স্থল তিনভাগ জল—।"

এই বিড়ম্বিত শিক্ষক জীবনের আলেখ্যটি সুবিখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসুর চিত্রনাট্যে প্রকাশ পায়। অনুরূপ এক নাটক শত দুঃখকষ্ট ও নিজ সন্তানের ব্যবহারে লজ্জিত মার্জনাহীন মানসিকতায় বলীয়ান শিক্ষককে দেখানো হয় "ভোলা মাষ্টার" নাটকে। শুধু শহরে না, গ্রামের অসংখ্য মঞ্চে এ নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল বহুকাল ধরে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর নিজ জীবন সংগ্রামের সূচনাতে কিছুকাল মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে গিয়ে বহু কর্মনিষ্ঠ শিক্ষকদের পরিচয় যেমন পান তেমনি অনেকের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতা দেখতে পেয়েছেন। এর এক মর্মস্পর্শী উদাত্ত বিবরণ তিনি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত উপন্যাস "রাত্রির তপস্যা" গ্রন্থে রেখেছেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে ডাঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়—

"রাত্রির তপস্যা" গজেন্দ্রকুমার সাহিত্যকৃতির প্রথম পর্বের সার্থক সৃষ্টি। ইতিপূর্বে তাঁর অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে তাঁর রচনারীতি ও মনঃপ্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে। "রাত্রির তপস্যা" এই পর্বের সর্বাধিক পরিণত উপন্যাস।

ভূপেন আদর্শবাদী দরিদ্র ছাত্র। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যৌবনে উপনীত হল এবং মফঃস্বলের শিক্ষক জীবনকে বৃত্তি বলে গ্রহণ করল। কিন্তু কাজে যোগ দিয়ে এবং শিক্ষক বৃত্তির অধঃপতন দেখে বিস্মিত ও বিষণ্ণ হল। দিনগত পাপক্ষয়ের বৃত্তিকে নীচতা ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য সমস্ত বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে তার নিঃসঙ্গ সংগ্রাম এই উপন্যাসের মূলকথা। কঠোর বাস্তব ঘটনা ও ক্লেদাক্ত নীচতার পাষাণ প্রাচীরে আহত হয়ে অনেকেরই শিক্ষকবৃত্তির স্বপ্নের ফুলগুলি ফুটবার অবকাশ পায় না। কেউ আশাহীন আনন্দহীন বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য জীবনে চলে যায়। কেউ বৃথা বাদপ্রতিবাদের মধ্যে না

গিয়ে সেই অপ্রীতিকর জীবনকেই আঁকড়ে ধরে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে। আবার মুষ্টিমেয় দু' একজন শুধু যে শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ আঁকড়ে থাকে তা নয়, দূষিত পরিবেশ ও ভ্রষ্টাচার থেকে শিক্ষকদের সেই আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায় আনতে চেষ্টা করে। হয়তো তারা ব্যর্থ হয়। কিন্তু কখনো নৈরাশ্যের বলি হয় না। ভূপেন্দ্র মরচে ধরা লৌহ পিণ্ডবৎ শিক্ষক জীবনকে স্বর্ণখণ্ডে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিল। গজেন্দ্রকুমার এই উপন্যাসে এমনি একটি যুবকের স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই উপন্যাসে তিনি শিক্ষা, শিক্ষকজীবন ও গ্রাম্য পরিবেশের যে নিঃশ্বাস-রোধকারী ধূম্রজালের বাতাবরণ এঁকেছেন তার নিষ্প্রাণ, নিরুৎসুক ও প্রায় নিঃস্পন্দ পরিবেশ ও চরিত্র আমাদের চেতনাকেও যেন অসাড় করে ফেলে। শিক্ষকজীবনের এই জ্বালা যন্ত্রণা, হতাশা ও আদর্শহীনতার ধূমাঙ্কিত কালিমা ভূপেন্দ্র নিজের জীবন থেকে মুছে ফেলেছে। প্রতিকূল গ্রাম্য পরিবেশ ও আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষকদের সাহচর্যে থেকেও সে নতুন প্রভাতের স্বপ্ন দেখেছে। হয়তো দুটি-একটি ব্যক্তি দু'একজন বালক শিক্ষার্থী তার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। দু'একটি মনে সে প্রদীপ জ্বালাতে সমর্থ হয়েছে। সেইটুকুই তার প্রাপ্তি। তাতেই সে সার্থক।" † ৬৪

মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধকে বিপর্যয়ের মধ্যে ধরে রাখবার কাজে শিক্ষকদের প্রয়াসকে সমাজ পছন্দ করতো। এই মহত্ত্বের মধ্যে দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে চাইত বলে বাস্তব ছিল। নিজেদের মানসিকতার প্রতিফলন দেখে সন্তোষলাভ করতো। শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের এই রকম একটা অনুভূতি ছিল যে দেশ স্বাধীন হলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে। এই আদর্শবোধ যথাযোগ্য মূল্য পাবে। এক সময়ে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু অবস্থাটা যথাপূর্বম থেকে গেল। স্বাধীন সরকার শিক্ষার জন্য কিছু করলেন না। কবি আশরাফ সিদ্দিকি লিখলেন—"যুদ্ধ থেমে গেছে। আমরা তো স্বাধীন। কিন্তু তালের মাষ্টারের তবু ফিরল না তো দিন।" চিরকালের জন্য তাঁর "তালের মাষ্টার" কবিতাটি বিখ্যাত হয়ে আছে, সাহিত্য হিসাবে এবং যুগের জিজ্ঞাসা হিসাবে। দুঃখের বিষয় সরকার দেশের মানুষের চাহিদাকে, তাদের আন্দোলনকে যেভাবে তৎক্ষণাৎ দেখলেন তাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হলো। এই ব্যাপারটি চমৎকারভাবে ঘটেছে যে সচেতন মানুষ হিসেবে এ থেকে পাঠ নিতে এ রাজ্যের শিক্ষকেরা কালক্ষেপ করেননি। তাঁরা আশা-হত হয়েছেন ও রূঢ় বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আর সেই শিক্ষা দিয়ে জীবনের পথে পা বাড়াতে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আহ্বান করেছেন। ১৯৫২ সালেই যে ছবি তৈরী করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক তার 'নাগরিকে' এ চিহ্ন আমরা দেখতে পেয়েছি। রামু কলকাতার অগণিত নাগরিকের মধ্যে একজন, মধ্যবিত্ত যুবকেরই মত ভাল করে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় সে বিভোর। সমস্ত দিক দিয়ে রূঢ় জীবনের ছায়া তার কাছে রাখা হলেও সে রোমান্টিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলে "আমি মানব না, গলিতে গলিতে খ্যাপাটে বেহালাবাদক যে মনমাতানো সুর বাজিয়ে যায়, তার মূর্চ্ছনায় এবং ক্যালেণ্ডারের সুরম্য চিত্রপ্রীতির মধ্য দিয়ে যে শোনে নতুন জীবন সংকেত!" দীর্ঘকাল নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষকতা করেছেন রামুর বাবা, তাঁরও অবসর জীবনে গুরুতর আর্থিক সংকট। কদর্য সমাজ ব্যবস্থার অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত পৌঢ় মানুষটি পরিমণ্ডলের ওপর সমস্ত আস্থা হারিয়েছেন। আছে কেবল অবিমিশ্র নৈরাশ্য, চাকরী পাওয়া যে প্রায় লটারি জেতার সমান, এই কথায় জীবনযুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছেলেকে তিনি কেবল নিরুৎসাহিতই করেন।" অনতিকালের মধ্যে শিক্ষকেরা এতে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন, তার উদাহরণ দেখি 'উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ'-এ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পে।

'স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র হাসিমুখে বরণ করে

বিদ্যালয়ের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যত মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ ধুলোয় দেবে, শিক্ষাদীক্ষা-হীন অসভ্য মজুর ধাঙগড়ের মত হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায়বাহাদুর (রাজমাতা হাই স্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার) তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ রায়বাহাদুর শোনান শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক অনেক ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে, দমক গমক মূর্চ্ছনা আমদানি করে গুরু গম্ভীর চালে। 'আপনারা কি বলেন?'

প্রৌঢ় শশাঙ্ক হেডমাষ্টার। গিরীন তাঁর জামাই। সেও শিক্ষক। সেক্রেটারির জিজ্ঞাসা 'গিরীন খুব পলিটিক্স করে বেড়ায় নাকি?'

তাই উপলক্ষ্য করে গিরীন খুব তোষামদ করে এক রাতে রায়বাহাদুরকে নিজের বাসায় নিয়ে ফেলে। বাড়ীঘর অনুষ্ঠান যেভাবে সজ্জিত হওয়া দরকার তা না দেখে তিনি সন্দিগ্ধ হলেও ঢুকে পড়লেন গিরীনের ওখানে। প্রবেশ করে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হন পর পর। দারিদ্র্যের ভারে সংসার একেবারেই ন্যুব্জ ও অবিন্যস্ত। সেখানে অথর্ব গিরীনের বাবা ও কদাকার তিনটি সন্তান। একটি অস্বাভাবিক জ্বরে চিৎকার ও বিকার করছে। তখনও ওষুধ আনা হয়নি। গিরীনের স্ত্রী সম্মুখে আসতে ইতস্ততঃ করছে। কেন, বিয়ের শাড়ীটা পরেই আসুক না কেন একথা অতিথির সামনেই বলতে হয়। যে মেয়েটা আস্ত ডাল খেয়েছে বলে শাস্তি পেলো তাকেই পর মুহূর্তে রায়বাহাদুরের খাবারের প্লেট এগিয়ে দিতে হয়। নির্মম দারিদ্র্যের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। রায়বাহাদুর বিচলিত হন। তিনি ভয় পেয়ে যান এর পর আরও কিছু হতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি গিরীনের দশ টাকা বেতন বাড়াবার প্রস্তাব দেন। গিরীন প্রত্যাখান করে বলে, 'তা করবেন না স্যার, লোকে বলবে ছেলের মুখে ভাতের ছলে আপনাকে বাড়ীতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি। বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।'

তারপর 'সোমবার গিরীন নোটিশ পায়, বরখাস্তের নোটিশ। সে প্রত্যাশা করেছিল, ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিতেন রায়বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায়বাহাদুর ভুলতে পারবে না। তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়ামায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।'

দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তখন থেকে রাজনীতি। এই প্রতিবাদ পঞ্চাশ দশকের কিছু আগে থেকে শিক্ষকেরা শুরু করেছিলেন। তাঁদের আন্দোলনের ভাষায় চিরায়ত ধ্যানধারণাগুলোকে পরিবর্তনের বাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয়—এই আত্মোপলব্ধি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কাব্য 'একলব্য'-এ প্রকাশিত। শিক্ষক সমাজের কোন্ শ্রেণীর পক্ষে কাজ করছেন এবং সুবিচার করছেন কিনা এই আর্তনাদ দ্রোণাচর্যের মুখ থেকে উচ্চারিত—

"পালা পালা, একলব্য পালা।
যা তুই, যেদিক চোখ চলে।
বল 'না'। 'না' বল। শুধু একবার 'না' বল আমি ফিরে চলে যাই।
বিবেক ঝিমিয়ে পড়েছে ঝিম্‌ঝিম্ আফিমের নেশা,
প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে জাগা, জাগা—একবার 'না' বল।
দ্বিধাকে নির্দ্বিধা দে রে। ঝন্‌ঝন্ ঝাঁকুনি আন সংশয়ের শ্লথ স্নায়ু ছিঁড়ে—
'না' বল একবার।

পঙ্গুকে জুগিয়ে দে রে, সামর্থ্যের লাঠি, আমি ফিরে চলে যাই।"

"বন্ধুতা না দিলে তারো প্রতিদান—রাজরোষ নাই" এই সত্যকে উপেক্ষা করে শিক্ষকেরা এক সময়ে বের হয়ে আসলেন। শাসকশ্রেণীর সঙ্গে থেকে যে বিবেক যন্ত্রণা-দগ্ধ হয়ে উঠেছিল সে আত্মগ্লানি কাটিয়ে শিক্ষকেরা হতে চাইলেন সমাজের শোষিত মানুষের বন্ধু। এই ঘটনার নাটকীয় বিবরণ রেখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'হেড মাষ্টার' ও 'ছোট দিদিমণি' ছোট গল্প দুটিতে। "সেকেন্ড মাষ্টার মশাইর মাষ্টারী ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে। থার্ড মাষ্টার মশাইর আছে মুদী দোকান। হেড পণ্ডিতের উপার্জনক্ষম দুই ছেলে, সেকেন্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি, কিন্তু হেডমাষ্টার মশাইর সম্বল ছিল চৌধুরীরা।" এই চৌধুরীরা যখন স্থানচ্যুত হন পড়াশুনায় অত্যন্ত সফল ছাত্র হেডমাষ্টার মশাই যিনি এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েও অনেক প্রশান্তি নিয়েছিলেন তিনি বিচলিত ও কক্ষচ্যুত হলেন। প্রিয় ছাত্র ব্যাংকের অফিসারের দৌলতে তার ব্যাংকেই চাকুরী হল। সাজ পোশাকে এল আমূল পরিবর্তন। কিন্তু নিত্য নতুন সমস্যার তিনি জন্ম দিতে থাকলেন। মাষ্টার মশাই ইংরেজী ভুল ধরেন। প্রকাশ্যে ইয়ার্কি, ক্লিক করা আর ভদ্রঘরের কর্তব্যরতা মহিলাদের বিরুদ্ধে অশোভনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ও স্পষ্টবক্তা কর্মচারী ছেলেটির সমর্থনে আসেন। তাঁকে বরখাস্ত করা দরকার। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর ছাত্র অফিসার কেয়ার টেকার কাজ ছেড়ে দিয়েছে সে জায়গায় মাষ্টার মশায়কে রাখলেন। তিনি অপমানিত বোধ করে বললেন, "বেয়ারাদের সর্দারি করা ছাড়া তাঁকে কোন কাজের যোগ্য মনে করা হচ্ছে না।" কিন্তু সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরনগুলি অন্যরকম হতে শুরু করল। মাষ্টার মশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ঝগড়া করছেন। কোনো বেয়ারাকে একটু কড়া কথা বলবেন, উপায় নেই। মাষ্টার মশাই তেড়ে এসে প্রতিবাদ করবেন। কোন ব্যক্তিগত কাজকর্মে তাদের পাঠানো চলবে না। মাষ্টার মশাই বলেন, "তাহলে অফিসের কাজ সাফার করে। বাবুদের কেবল পান সিগারেট যোগাবার জন্য ওদের রাখা হয়নি।" অকস্মাৎ এক রাতে অফিস ফেরত অফিসার ছাত্র লক্ষ্য করেন ব্যাংকের সিঁড়ি ঘর থেকে পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠছে। "আচ্ছা, স্বাধীনতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমরা?" বিস্ময়ে সে স্থানে লক্ষ্য করলেন সবাইকে ছাড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলে ভর্তি তাঁর (মাষ্টার মশাইর) মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। মাষ্টার মশাই ক্লাস নিচ্ছেন। উত্তর দেন "না না ক্লাস ট্যালাস্ কিছু নয়।...অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো করে আয়ত্ত করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল?"

দ্বিতীয় গল্পে ছোটদিদিমণি বনমালী বিদ্যাপীঠের গার্লস সেকশনের কেরাণী। স্বামী কম্পাউন্ডার। শহরের গিঞ্জিতে গলির মধ্যে বাসা বাড়ী। তার একমাত্র ছেলে শিবু পড়াশুনা না করে চাকতি খেলে। তার বন্ধুরা বলে 'আয় বিড়ি খাবি'। নম্বরের খাতা থেকে সেক্রেটারির ছেলে সঞ্জীবের প্রতি তার দৃষ্টি যায়। মনে তীব্র আকাঙ্খা এই ছেলের সঙ্গে থেকে শিবুর লেখাপড়াটা যদি হয়। সভয়ে সেক্রেটারি বাবুর সংগে কথা বলে তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্যানার্জী (চিত্র শিল্পী)-এর অনুমতি নিয়ে সমীরের সঙ্গে শিবুর বন্ধুত্ব জুড়ে দেন। কয়েকদিন বাদে অভিযোগ আসে—সমীরকে শিবু গাট্টা মেরেছে। আর যা নাই তা গালাগালি করেছে। সঙ্গে ছিল বস্তির ছেলে ফটিক আর মদন। হাজার নিষেধ সত্ত্বেও শিবু তাঁদের সঙ্গে মেশে। সমীরের বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায়। ছোট দিদিমণি মুখ দেখাতে লজ্জা পান। তবু কথা ছিল সমীর বাংলায় খুব ভাল নম্বর পেলে তাকে পুরস্কৃত করবেন। তাই পরীক্ষার পরে ছোট দিদিমণি 'নৈবেদ্য' নিয়ে হাজির হন সেক্রেটারির বাড়ী। সেখান থেকে অপমানিত বোধ করে বই হাতে বাড়ীতে ফেরবার গলির মুখে শিবুর মা

ওদের তিন জনকে ডেকে নিয়ে যান বাড়ীতে। বিস্মিত তিন বন্ধু বসল পাশাপাশি—'পড় দেখি একটা কবিতা।'

ফটিক লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি প্রথম ভাগের কয়েকটা পাতা অবধি পড়েছিলাম। অত কঠিন বইতো পড়তে পারব না'। মদনের দিকে তাকাতে সে লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমি সব ভুলে গেছি।' শিবু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি পারি মা, আমি পড়ব। মজা পেয়ে রিন্টু মিন্টারাও এগিয়ে এসে মাকে ঘিরে বসল।'

নিজের ও দশের স্বার্থে সমাজের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের কাজের বাস্তব রূপ বাইরেও ফুটে উঠেছিল। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে শিক্ষকদের যৌথ আন্দোলন, ছাত্র ও অন্যান্য স্তরের মানুষের পাশে তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহাসিক ২৪শে ফেব্রুয়ারী মিছিলের অন্যতম সংগঠক কবি দিনেশ চন্দ্র দাস এক কথা সোচ্চার করেছেন "শিক্ষক মিছিল, ১৯৫৩" কবিতায়—

ইডেন উদ্যানের পাতাঝরা পথের ওপর
বসে আছে পাঁচ হাজার মানুষ,
পাঁচহাজার নীরব দুর্গের মত।
অ্যাসেম্বলি হাউসের পাশে
একটানা ঝিঁঝির সুতোয় বাঁধা রাত্রি
রাত্রির লক্ষ চোখ আকাশে জ্বলে।
স্তব্ধ কঠিন প্রাচীরের আড়ালে।
ভাড়াটে প্রহরীর পাহারায়
তোমরা ধুক পুক করো।
আর আমরা শুয়ে আছি দেশের কোলে
ধূসর নরম মাটির বিছানায়—
কপোতের পাখার মতই কবোষ্ণ, মসৃণ।
তোমাদের দম্ভের হিমালয় থেকে
যদি একবার নেবে আসতে,
দেখতে পাঁচ হাজার রক্তের নদী,
দেখতে শুধু হাজার হাজার জ্বলন্ত নক্ষত্র।

চুয়ান্নর শিক্ষক আন্দোলন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মনে ঢল এনেছিল। বিখ্যাত কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন—

তোমরা দিয়েছ শিক্ষা, যে শিক্ষায় কলম ধরেছি
অন্যায়ের প্রতিবাদে। আজ যদি থাকি নির্বিকার—
তোমাদের ধর্মঘটে, তোমাদের জীবন সংগ্রামে
যদি থাকি নিরপেক্ষ, লেখনীতে জ্বলন্ত প্রচার
না যদি বেরোয় তবে মাথায় পড়ুক বজ্রাঘাত—
কবি জন্ম শেষ হোক। শাসকের ঘৃণ্য অত্যাচার
যদি আজ সহ্য করি ভীরু ক্লীব দর্শকের মত
তবে যেন ঘুচে যায় কবিত্বের সব অহংকার।

শিক্ষকদের সংগ্রাম অনুভূতিপরায়ণ শিল্পী সাহিত্যিকদের এমনিভাবে স্পর্শ করেছিল। রাজভবনের সম্মুখের সমাবেশে তাঁরা বার বার এসেছিলেন। সৃষ্ট সম্ভার দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান দেখিয়েছিলেন। আবার সেখান থেকে তৈরী করেছিলেন

নিজ নিজ শিল্প। অভিনব জাগরণের ঐ মুহূর্ত থেকে শ্রীসলিল চৌধুরী কথা ও সুর দিয়ে তৈরী করেছিলেন—

পথে এবার নামো সাথি
পথেই হবে এ পথ চেনা
জনস্রোতের নানান মতের
মনোরথের ঠিকানা
হবে চেনা হবে জানা।
অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে
এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে
তোমার আমার সবার স্বতান
মিলায় প্রাণের মোহনায়
হবে চেনা হবে জানা।

তখন এখন তোলে তুফান
নবীন গানের প্লাবন আনে দিকে দিকে
কিসের বাধা বিপদ বরণ
মরণ হরণ চরণ কে গো সে যায় হেঁকে।
তখন তো আর শোষণ বাঁধন মানবো না
সবার এ দেশ সবার ছাড়া তো জানবো না
পরোয়া নেই আকাশ বাতাস
হবে আনার পরোয়ানা
হবে চেনা হবে জানা।

অবস্থান শিবির থেকে যে গান সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা করেছিলেন যার সুরকার শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত—

তোমরা জেলেছ দীপ
তোমরা দিয়েছ আলো
তোমরা কেন গো আঁধার কুটীরে
ক্ষুধায় শীর্ণ কালো।
নালন্দা আর তক্ষশীলায়
অতীত ভারতে দেখেছি তোমায়
উজ্জ্বল মহিমায়।
গুরুর আসন দিয়েছি তোমায়
বিশ্ব বেসেছে ভালো।

কত মূক মুখে দিয়েছ ভাষা
কলিতে ফুটেছে ফুল
এই বাংলায় তোমরা গড়েছ
রবীন্দ্র নজরুল।
তোমাদের যারা করে অপমান
ধুলায় লুটাবে তাদের নিশান।
সাবধান ওরে সাবধান।
বিদ্যালয়ে ভীরু বাতি যত

মিছিলে মশাল হলো
তোমরা দিয়ো আলো।

রং তুলির চিত্র গ্রহণ করেছিলেন শিল্পীরা। দৈনিক পত্রিকাগুলি কার্টুন এঁকেছিল। এর পরিধি বাংলার সীমা ছাড়িয়ে পড়েছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী দিল্লী থেকে প্রকাশিত হিন্দুস্থান টাইমস্ "আজ নিখিল বঙ্গ শিক্ষকদের সংগ্রাম—শহীদ দিবস" শিরোনামায় কটাক্ষ করে বড় এক ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করে। অবস্থান শিবিরে চল্লিশটি চিত্তাকর্ষক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি এঁকেছিলেন সেদিনের তরুণ শিল্পী আজকের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। প্রবীণ চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে রচিত তাঁর ঐসব শিল্পকলার কয়েকটি নিদর্শন এখনও রক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রথম পথ নাটিকা তৈরী করেন শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত। ভারতীয় গণ-নাট্যের পার্ক সার্কাস শাখা এটি অভিনয় করে। চুয়ান্নর আন্দোলনে গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্তা শোভা সেন ও তাঁর সম্প্রদায় "সৌরীন মাষ্টার" নামে এক নতুন পথ নাটিকা তৈরী করেন। এই আন্দোলনের পটভূমিকাকে গ্রহণ করে প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীসুনীল দত্ত রচনা করেন 'হরিপদ মাষ্টার' নাটক। এই নাটক সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন, "এক দরিদ্র সহকারী প্রধান শিক্ষক এই নাটকের নায়ক। মধ্যবিত্ত জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট সব সহ্য করিয়াও দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করাটা তাঁহার ধাতে আসে না। শিক্ষকদের সংগ্রামের তিনি বিরোধী, আশা করেন যে সংভাবে শিক্ষকতা করার ন্যায্য স্বীকৃতি হিসাবে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। চাকুরী ও পরিবারের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকুল ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার মোহমুক্তি এই নাটকের কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে।" "চির বঞ্চিত শিক্ষক জীবনকে অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দেশের মানুষ গড়িবার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহারা দুঃস্থ। দুঃখ দারিদ্র্যের সংগ্রাম করিতে করিতে অবশেষে চরম প্রতিবাদের পথটি বাছিয়া লইতে বাধ্য হইলেন তাহাই নাটকের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে"—এ মন্তব্য প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষের।

সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিক্ষক অনতিকালের মধ্যে জনতার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ১৯৫৪ সালের আন্দোলন তাই লুকোচুরি খেলা নয়। দ্বিধা সংকোচের বেড়াজাল ছিন্ন করে শিক্ষকেরা দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়েছিলেন সর্বক্ষেত্রে, সারা রাজ্যে। এই উত্তরণ সমাজে অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে ছোট বড় সব লড়াইয়ে যুক্ত শোষিত মানুষের সমর্থনে নিয়ে এসেছিল। নিরপেক্ষতার বলয়-চ্যুত এই মানব অনিবার্যভাবে তাই লড়াইয়ের নেতা হয়ে দেখা দিলেন—এই চমৎকার ছবি দেখালেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'গোত্রান্তর' নাটকে। কালের পরিবর্তিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনন্য সাধারণভাবে এ নাটকে পরিস্ফুট।

গোত্রান্তর সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেনঃ "শহরের উপকণ্ঠে শান্তি কলোনী। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের সাময়িক শান্তিনীড়। গ্রামের স্কুল শিক্ষক হরেন মাষ্টার স্ত্রী শঙ্করী আর অনূঢ়া কন্যা গৌরীর হাত ধরিয়া এই শান্তি কলোনীতে আসিয়া উঠিয়াছেন। কায়ক্লেশে দিনপাত করেন। একটি পাঠশালা করিয়াছেন। সেখানেও ছাত্র নাই! তবু অর্থ নহে আদর্শের জন্যই হরেন মাষ্টার প্রত্যহ পাঠশালা ঘরের শূন্য বেঞ্চির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন। ছোট ভাই কেশবলাল শহরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোন সংবাদ নাই। হরেন মাষ্টারের মনে নিদারুণ দুঃখ, মাথায় সুগভীর চিন্তার জট। এই ছিন্নমূল জীবনের পরিণতি কোথায়। শ্মশানের ডোমের মত মড়া আগলাইয়া আর কতদিন বসিয়া থাকিতে হইবে? এমন সময় শহর হইতে কেশবলাল স্বয়ং আসিয়া

দাঁড়াইল। সেখানে সে রেশনিং ডিপার্টমেন্টে অস্থায়ীভাবে চাকুরী পাইয়াছে। তাহার শহরের বাড়ীতে দাদা বৌদি আর গৌরীকে লইয়া যাইতে চায়। মরা গাঙেও জোয়ার আসে। দারিদ্র্য পীড়িত হরেন মাষ্টারের অতি ছোট সংসারেও সেই সংবাদে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু হইল। হরেন মাস্টার এবং তাহার পরিবার শহরে আসিল। ছিন্নমূল জীবনে শান্তি নাই। কেশবের চাকুরী সামান্য। তাহার আয়ে সংসার চলে না। বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে। জমিদারের দারোয়ান বকেয়া ভাড়ার জন্য তাহাকে অপমান করিয়া যায়। হরেন মাষ্টার নিরুপায়—গুরুগিরি ছাড়া জীবনে আর কিছুই জানা নাই—তবু ভগ্ন হৃদয় হন না। সবার অলক্ষ্যে ছোট ছেলেদের খেলনা পুতুল ফেরি করিয়া বেড়ান কলিকাতার রাস্তায়। পরিশ্রম হয়। কিন্তু আয় বাড়ে না। অবশেষে একদিন বাড়ীওয়ালা আসিয়া মারধর করিয়া তাঁহাদের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেশবকে জেলে ধরিয়া লইয়া গেল। আবার পথ। প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জনতা সমবেতভাবে সহানুভূতি জানাইল। কিন্তু বাড়ীর বারান্দার নীচটুকুও ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। সাহায্য আসিল অপ্রত্যাশিতভাবে, নিকটস্থ বস্তির সার্বজনীন মাতা শৈলবুড়ী আসিয়া ছিন্নমূল পরিবারটিকে তাহাদের বস্তির তাড়িঘরে আশ্রয় দিল। ইহা এক নতুন অভিজ্ঞতা। হরেন মাষ্টার শ্রমিক জীবনের দুঃখ দারিদ্র, সহানুভূতি, নীচতা সব কিছুর সাক্ষাৎ পাইলেন। দেখিলেন ভালয় মন্দয় মানুষ হিসাবে ইহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। শংকরীর কিন্তু ভাল লাগে না। আজীবন মধ্যবিত্ত সংস্কার তাহার মনকে আরও বিরক্ত করিয়া তোলে। তাহার উপর কন্যা গৌরীর সহিত শৈলবুড়ীর ছেলে কানাইয়ের ঘনিষ্টতা তাহার ভাল লাগে না। এই ঘনিষ্টতার কথা হরেন মাষ্টারও জানেন, নাটকীয়ভাবে একদিন তাহার কাছে ইহাদের অন্তরের কথা প্রকাশিতও হইয়া পড়ে। বিচলিত হন, কিন্তু ধৈর্য হারান না। দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন—পিছু হটি নাই। পিছু হটবোও না। আমার বাবা এক সংস্কার। কিন্তু ন্যায়তঃ ধর্মতঃ যেটা সত্য তাকে আমি অস্বীকার করতে পারুম না। এ বিয়াই হইব। সানাই বাজে। মধ্যবিত্ত স্কুল শিক্ষক হরেন মাষ্টারের কন্যার সহিত বস্তীবাসী শৈলবুড়ীর শ্রমিক সন্তান কানাইয়ের বিবাহ হয়। বিবাহ রাতেই অভাবনীয় আর এক দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। বহুদিন ধরিয়া বস্তি উচ্ছেদের জন্য জমিদারদের সহিত বস্তিবাসীর কলহ চলিতেছিল, সেই কলহ মারমূর্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইল। বিবাহ রাত্রেই দলবল আনিয়া বস্তিতে আগুন দিয়া বস্তি উচ্ছেদ পর্ব শুরু হইল। অসহায় বস্তিবাসীর অতি কষ্টে শৈলবুড়ীর কান্নায় আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। হরেন মাষ্টার বিচলিত হন না। আজীবন সংগ্রামের কষ্টিপাথরে জীবনসত্য যাচাই করা হইয়া গিয়াছে—সেই দারুণ দুর্দিনে বৃদ্ধ হরেন মাষ্টারের দেহ জ্যামুক্ত ধনুকের মত ঋজু হইয়া যায়। সমবেত বস্তিবাসীদের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া তিনি ঘোষণা করেন 'জীবন সংগ্রামের টিপনি দেখছ বুড়ি রক্ত চন্দনের—এই দেখ আর হুই দেখ। বিয়া গেছে কাইল, আজ হবে বাসি বিয়া। কোন্ রাজার বেটার বিয়ার এমন ধুম হইতেছে কইতে পার বুড়ী—এত বাজনা—এত বাইদ্য—হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল—চুপ কইরা খাড়াইয়া আছিস—হাত লাগাইতে পারস না তরা—হাত চালাও—কাম কর—উঠাও বস্তি—'। হাতে হাতে আবার ঘর গড়িয়া ওঠে। ঋত্বিক ঘটক এই 'সংকেত-ময়' নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন 'একজন মাস্টার মশাইয়ের চোখ থেকে একটা সম্পূর্ণ বাস্তব এক বিরাট গাথা।' প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক অজিত ঘোষ বলেছেন "মধ্যবিত্ত শিক্ষক কন্যা গৌরী বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালবাসিল এবং অবশেষে উহাদের বিবাহ হইল ইহাই গোত্রান্তর। কিন্তু গোত্রান্তরের আর একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা

ও শ্রেণী আভিজাত্যের গোত্রবন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর।"

শিক্ষক কিংবা গৃহ শিক্ষকেরা চূড়ান্ত ত্যাগের মুখোমুখি হয়ে আদর্শকে কখনও জলাঞ্জলি দেননি তার আলেখ্য তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিকেরা। বর্তমানকালেও তাঁদের জীবন নিয়ে সাহিত্য তৈরী হয়েছে। চলচ্চিত্র ও বেতারে এ সব কাহিনীর নাট্যরূপ পরিবেশিত হয়েছে। অগণিত মানুষের কাছে তার বাণী পৌঁছেছে। চলচ্চিত্রে নরেন্দ্র নাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার' দর্শকের মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করেছিল। তার 'ছোট দিদিমণি' দূরদর্শনে পরিবেশিত হয়েছে। বাণভট্ট ছদ্মনামে নীহার রঞ্জন রায় কিশোর উপন্যাস রচনা করেন 'লালুভুলু'। শিক্ষকের স্নেহ ছায়ায় নাম গোত্রহীন কিশোর কিভাবে বেড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষকের অভাব সেই বাড়ন্ত জীবনে যে ঝড় এনে দিল তার আবেগময় কাহিনী সেখানে লক্ষ্যণীয়। পরিচালক সত্যেন বসু চলচ্চিত্রে তাকে স্থান দিয়েছেন। ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন 'রবীন মাষ্টার'। শত শত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত এ নাটকে সে যুগের মানুষের আদর্শের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টান্ত প্রকাশ করে। সেদিন শহরাঞ্চলের শিক্ষকেরা করুণা-মিশ্রিত উপেক্ষাই পেতেন। তবু অভিভাবক এবং পরিচালক কমিটির সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন বাবু। সমস্ত চক্রান্ত উপেক্ষা করেছেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল করেছেন। মুগ্ধ বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটিকে পুরস্কৃত করেন। আর জনসমক্ষে শিক্ষকের আদর্শকে তুলে ধরেন। সমাজ কল্যাণে ব্রতী এ শিক্ষক জীবন অপরূপে বহু যুবকের মনে রেখাপাত করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুস্তকে এ নাটকের কোন উল্লেখ না থাকলেও অসংখ্য পাঠক ও দর্শকের কাছে এর প্রভাব এখনও অম্লান। চল্লিশ দশকে আদর্শের জন্য জীবনপাতের যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল বস্তুতঃ এই সব শিক্ষক জীবন ছিল কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও ভাস্বর। ১৯৫৪ সালের বিশাল শিক্ষক আন্দোলন তাঁদের এই আদর্শবোধকে আরও সমুজ্জ্বল করেছিল। এর পর বহু ছোট গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা পুরস্কার বিজেতা অন্নপূর্ণা গোস্বামী লিখেছিলেন 'নয়া ইতিহাস' উপন্যাস। সেখানে শান্তনু তার ভালবাসার উর্মি ও বিশাল ঐশ্বর্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করে শিক্ষকতায় থেকে যায়। ১৯৫৮ সালে রমেশ লাহিড়ীর নাটক 'অপরাজিত' প্রকাশিত হয়।

শিক্ষক পিতার প্রেরণাকে অনুসরণ করে কন্যা জীবন ও সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে আশাবাদী ও অপরাজেয় শক্তি দেখাতে সমর্থ হয়। ঐ সালেই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জয়তীকে নায়িকা করে লেখেন 'তৃতীয় ভুবন'। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমালোচনায় বলেছেন "তাহার শিক্ষিকা জীবনের সমস্যাগুলি তাহার ব্যক্তিত্বের যেসব উদ্বোধন ঘটাইয়াছে তাহাও সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক নতুন দায়িত্ববোধ, মেয়েদের শান্ত রাখার জন্য কৌশল উদ্ভাবন, বয়োজ্যেষ্ঠা শিক্ষিকাদের পারস্পরিক ঈর্ষাকলহের মধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা—প্রধানা শিক্ষিকার সহিত স্কুল পরিচালনা বিষয়ে মতদ্বৈত ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহার মন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।" একই দৃষ্টান্তে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে একালে যার ব্যাপ্তি লক্ষ্যণীয়। আদর্শ-বোধের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন বিচিত্র প্রতিভার গ্রন্থকার শ্রীনারায়ণ সান্যাল 'প্যারাবোলা স্যার'-এ। অল্পকালের মধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে তৃতীয় সংস্করণ বের হয়েছে এবং সম্প্রতি বেতার নাট্যরূপ শোনা গিয়েছে। এর কাহিনী সংক্ষেপে—

সত্যাশ্রয়ী আদর্শবাদী শিক্ষক যেন শাপভ্রষ্ট দেবতা। অংকের অসাধারণ কৃতী ছাত্র

ঘটনাক্রমে ‘প্যারাবোলা স্যার’। স্কুল সেক্রেটারী রায়সাহেবের নিজস্ব জ্যোতিষীর ছেলেকে পরীক্ষায় নম্বর বাড়াতে অক্ষম হলে নিজেই স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়ে দেন। বিহারে কিষণগড়ে তাঁকে কেন্দ্র করে স্কুল গড়ে উঠে, তিনিও সম্মানের শীর্ষে থাকেন। স্নেহের ছাত্র সেক্রেটারী তাঁকে স্কুলে রাখবার স্বার্থে সরকারী নিয়মরক্ষায় অত্যন্ত মৃদুভাবে আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে ফেলে। তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। সংসারে অবস্থানকালেও অবিচল ও নির্ভীক ভদ্রলোকের বিপত্তি আসে। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে যখন তিনি সত্যের খাতিরে আদালতে দাঁড়িয়ে একমাত্র জামাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। আইনে জামাইয়ের সাজা হয়। কিন্তু সংসার থেকে তিনি বড় সাজা পান। নির্মমভাবে বিতাড়িত হন। বারানসীতে প্রবাস জীবনে অল্পকালের মধ্যে আবার কর্মমুখর হয়ে উঠেন। আসলে তিনি যে প্যারাবোলা স্যার যার ঐতিহ্য অনেকের কাছে পরিচিত, তা বার বার ধরা পড়ে যায়। যাদের মাতৃ পরিচয় আছে পিতৃ পরিচয় নেই এমন গুটি কয়েক ছাত্রের শিক্ষার্থে ও ইউনিভারসিটির ছাত্রদের অংক কষতে সাহায্য করতে হতো। পাশাপাশি মন্দিরে জুতো পাহারার কাজ চালিয়ে যেতেন। প্রাক্তন ছাত্র পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও তাঁর স্ত্রী সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হয় এবং তাঁকে সম্মত করে। তৎপরতা ও কৌশলে তাঁরা স্যারের নিজস্ব আলয় কলকাতাতেই স্থাপন করে। দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধের সদ্যপ্রয়াত স্ত্রীর স্মৃতি, ছেলে, ছেলে বৌ ও একমাত্র নাতির উপস্থিতি তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু তিনি সেই সংসারে এক মুহূর্তের জন্যও আর জোড়া লাগেন না। কপর্দকহীন প্যারাবোলা স্যার ২৪ ঘন্টা অনাদরে অনাহারে থেকে যেটুকু বাঁচবার ইচ্ছা ছিল তা লুপ্ত করে ফেললেন। স্ত্রীর লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে তিনটি রূপোর টাকা পেয়ে ট্রামে চেপে আসেন এসপ্ল্যানেড ইষ্টে। আত্মহননই তাঁর উদ্দেশ্য। একগাদা শিলপিং পিল গিলে কাশী বিশ্বনাথের জল খেয়ে অংকের গুরু স্যার আশুতোষের পদতলে ঢলে পড়বেন, এই ইচ্ছা। ট্রাম যথাস্থানে আসে। রাস্তায় জট। মিছিল রাজভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধ্বনি ‘শিক্ষা’ নিয়ে ফটকাবাজি চলবে না।’ সবাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ধর্মঘট করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তিনি নামেন। সেখানে সর্বপ্রথম এক মহিলা তাঁকে চিনতে পারে লড়াইয়ের চাঁদার কৌটা এগিয়ে দিতে যেয়ে। তিনিই সেই মহিলা যার স্বামীর হত্যার বিরুদ্ধে জামাইয়ের পক্ষ না নিয়ে প্যারাবোলা স্যার আদালতে সত্য সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অনতিকালের মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মকর্তা তাঁর প্রাক্তন ছাত্র শচীনন্দন তাঁকে চিনতে পারে। শচীনন্দন তার মাস্টার মশায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো মাইক্রোফোনের সামনে। বললেনঃ কমরেডস্। আপনাদের জন্য আমি একটি উপহার নিয়ে এসেছি। এই যে পক্ককেশ বৃদ্ধকে আপনারা দেখছেন এ'র নাম শ্রীযুক্ত সত্যবান চক্রবর্তী। ইনি আমার গুরু, মাস্টার মশাই। আপনারা নতুন যুগের মাস্টার মশাই তাই একে চেনেন না। পঞ্চাশ বছর আগে এ. বি. টি. এ-তে প্যারাবোলা স্যারকে সবাই এক ডাকে চিনত। যে সংগ্রামে আজ আপনারা সামিল হয়েছেন এই বৃদ্ধ আজীবন সেই সংগ্রামই করে গেছেন। উনি আমাদের পূর্বসূরী। লজ্জায় সংকোচে শারীরিক ও মানসিক অসাধারণ দুর্বলতা নিয়ে তিনি বললেন, “এ সভায় যোগ দেবার জন্য আমি আসিনি।... তোমরা চাইছ, আমি কিছু বলি। তাই বলছি। আমার প্রথম কথাঃ তোমাদের আমি চিনি, তোমরা আমার অতি পরিচিত প্রিয়জন—তোমরা শিক্ষক। দ্বিতীয় কথা, তোমাদের কিসের সংগ্রাম তাও আমি জানি—তোমাদের সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে।... আমি বৃদ্ধ ... অশক্ত ... বস্তুতঃ কাল থেকে আমি উপবাসী আছি ... বড় দুর্বল লাগছে। তাই তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—তোমরা অন্যায়ের সঙ্গে আপস কর না।” অবশেষে পানীয় ও খাদ্য পেয়ে তিনি কিছুটা সুস্থ হন। কিন্তু

প্যারাবোলা স্যার আটকে যান সমাবেশে—তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এক নতুন আবাসে যেখানে তাঁকে উন্নতভাবে শিক্ষা দিতে হবে কয়েকটা ছাত্র-ছাত্রীর। সংসার যন্ত্রণা যাকে উত্যক্ত করে আত্মঘাতী করতে চেয়েছিল সেই সংসারচ্যুত সম্মানীয় আদর্শবান সত্যবানের প্রতিষ্ঠা হয় চেতনা-সমৃদ্ধ সমাজে। ‘গোত্রান্তরে’ শিক্ষক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীকে তিনি পথ দেখিয়েছিলেন। এই পথচলা যখন সুসংবদ্ধ তখন তার গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ‘প্যারাবোলা স্যারে’। একক মানুষের সংগ্রাম ও তাঁর আদর্শময় জীবনযাপন স্বাভাবিকভাবে কোন সময় সংসারে অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই বঞ্চিত জীবন কি সমাজে মূল্যহীন? তাকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আদর্শের প্রতি ও মহত্ত্বের প্রতি মানুষের ভালবাসা থেকে আসে। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় নয়, সেই আত্মত্যাগী মানুষের প্রতিষ্ঠা একমাত্র সমাবেশেই সম্ভব। সেই কাজ চলছে। সেখানে শুধু বলবার সুযোগ করে দেওয়া নয়, প্যারাবোলা স্যারদের গলায় মালা দেওয়া হয় এবং নামে জয়ধ্বনি উঠে। সর্বোপরি তাঁকে আত্মঘাতী হতে হয় না। সমাজের স্বার্থে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সমর্পণ করে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। সর্বশেষে সত্যজিৎ রায়ের “হীরক রাজার দেশ” প্রসঙ্গ আসে। স্বৈরাচারী হীরকরাজ সফরে বের হলেন। যে অবস্থাটা দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন তাহলো শিক্ষক অতি দৈন্য অবস্থার মধ্যে থেকেও সৎভাবে ছাত্র পড়াচ্ছেন। সঠিকভাবে ভবিষ্যত তৈরী হচ্ছে বলে রাজার খড়্গ শিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু উৎপীড়িত শিক্ষক পালিয়ে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করেও শিক্ষা দিয়ে চললেন। রাজা মগজ ধোলাইয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলনে অগ্রসর হলেন। তবু তিনি ব্যর্থ। “দড়ি ধরে মার টান—রাজা হবে খান খান” শিক্ষক প্রদত্ত এই শ্লোগানে সবাই এসে একে একে দড়ি ধরে। টান মেরে রাজার মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে যার মধ্যে হতবিহ্বল রাজার হাতও থাকে।

শিক্ষকদের আত্মমর্যাদার যে করুণ প্রসঙ্গটি একদা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উত্থাপন করেছিলেন তার ব্যাপক বিবর্তন দেখি আধুনিক সাহিত্যে। শিল্প সাহিত্য নাটকে এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়। অলীক তো নয়ই। শিক্ষক সমাজকে লক্ষ্য করে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের এ আলেখ্য ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে এ স্থানে এসেছে। শিল্পী সাহিত্যিকেরা পরিবেশ থেকে লক্ষ্যণীয় পরিস্থিতিগুলি বা ভাবধারা নিয়ে তাঁদের সুললিত সম্ভার রচনা করেছেন। পরিস্থিতি ও সাহিত্য আগে পিছে হাত ধরাধরি করে চলেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যে যাত্রাপথে শিক্ষক একা ও স্পষ্ট, যে আদর্শবোধের উদ্বোধনে তাঁকে দেখা যেতো আজ সেই ভূমিকায় তাঁকে আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে জনারণ্যে শিক্ষককে তেমনভাবে চেনা যায় না। শিল্প সাহিত্যে তিনি আছেন, কিন্তু মিশে গিয়েছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাঁর প্রভাব কিংবা নেতৃত্বটা উপলব্ধি করা যায়। পরিবর্তনের কালে তাঁর প্রতিচ্ছবি উন্নতমানে পৌঁছেছে মাত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ শিক্ষক সমাজ। তাঁদের অবদান, সমবেত শক্তি এবং আন্দোলন এই পর্যায়লাভের মূলে রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ১৯৫৪ সালের আন্দোলন অবিস্মরণীয়। আগামীদিনের আবার কোন ‘বিনয় ঘোষ’ যখন বাঙালী সমাজের বিবর্তন নিয়ে গবেষণার দরজা খুলে দেবেন এই শিক্ষক আন্দোলন চিহ্নিত হবে বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের চিত্তের ও পরিমণ্ডলের এক জলবিভাজিকা আখ্যা নিয়ে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে সুস্পষ্টভাবে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রবাহ নতুনভাবে তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

পরিশিষ্ট

আন্দোলন অন্যত্র

১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন সংগঠনে সমিতি সদস্য ও অন্যান্যদের ভূমিকা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র, কর্মচারী, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলি আন্দোলনে কীভাবে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন শক্তিগুলির অংশগ্রহণ এবং দক্ষতার সংগে আন্দোলনের পর্যায় অতিক্রম করাতে রাজনৈতিক দলগুলি এবং তার খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের ভূমিকা নতুন করে প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয়ভাবে ,পরিচিত এই নেতৃত্বের পাশাপাশি কলকাতায় দ্বিতীয় সারির কর্মীরা অগ্রসর হয়েছেন এঁরা হলেন বিমল দত্ত, জ্ঞান ঘোষ দস্তিদার, উৎপল রায়, প্রভাস ঘোষ, অমর মজুমদার, তপেন্দ্র গাঙ্গুলী, রাধাবল্লভ ঘোষ, শচী মজুমদার, সুবোধ ভট্টাচার্য, ননী মিত্র। এভাবে ছাত্র নেতাদের আরও যে নামগুলি যুক্ত হতে পারে তা হচ্ছে—নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সরোজ হাজরা, কমল চ্যাটার্জী, ব্যোমকেশ রায়ের নাম। বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটনা প্রসংগে শিক্ষক সমিতির সদস্য ও কর্মীদের নাম প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার বাগবাজার স্কুলের দেবেন্দ্রবিজয় গাঙ্গুলী, পাইকপাড়ার হাই স্কুলের উপেন্দ্র নাথ মজুমদার, নারিকেলডাঙ্গা হাই স্কুলের সমরেন্দ্র নাথ দাস ও খিদিরপুর হাই স্কুলের সুশীল মুখার্জীর নামও যুক্ত হওয়া উচিত। এঁরা সকলেই নিজ নিজ এলাকার শিক্ষক নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। কলকাতার শিক্ষকদের উপরই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছিল। এঁদের মধ্যে শ্রীরঞ্জিত গুহ (নেতাজীনগর হাই স্কুল)) ও শ্রীসুরেশ মৈত্র (বর্তমানে গবেষক)কে অবস্থান শিবিরে সংগৃহীত অর্থ ও সামগ্রী রক্ষা করতে হতো। আন্দোলন চলাকালে প্রতিদিন সংবাদ বুলেটীন প্রকাশিত হতো। কাশিমবাজার মহারাজা পলিটেকনিক স্কুলের শ্রীহরিনারায়ণ চক্রবর্তী, অশোকনগর আদর্শ বিদ্যালয়ের শ্রীননীগোপাল বিশ্বাস এবং শ্রীবিকাশ ভট্টাচার্য (বর্তমানে হাইকোর্টের এডভোকেট) প্রমুখেরা বুলেটীন সম্পাদনার কাজ করতেন। বুলেটীনগুলি নিয়মিতভাবে বন্টনের ব্যাপারে কাজ করতেন কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মী প্রয়াত নিধিরাম বন্দোপাধ্যায়। প্রিন্টার ও প্রকাশনার কাজ চালাতেন বর্তমানে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রকাশক শ্রীমোহিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বেহালা হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল রক্ষিত অবস্থান শিবিরে স্লোগান দেবার কাজ একটানাভাবে সাহসিকতার সংগে চালিয়ে যেতেন। কেন্দ্রীয় সমিতির দুই কর্মী শ্রীসন্তোষ ভাওয়াল ও উমেশ চন্দ্র সরকার (প্রয়াত)কে অর্থের হিসাব রাখতে হতো। আর দুই কর্মী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস (কেষ্ট) ও প্রভাতচন্দ্র দাস (প্রয়াত)কে টুকিটাকি কাজ নির্বাহ করতে হতো। উল্লেখ্য এসব কর্মীরা আন্দোলনের সমস্ত সময়টা সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। হঠাৎ কোন জিনিস সংগ্রহ করা, সেগুলি সংরক্ষণ করা কিংবা উপযুক্ত স্থানে যথাসময়ে নিয়ে যাওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এঁরা সাহায্য যুগিয়েছেন। মফঃস্বলের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংবাদ আদানপ্রদানের কাজে উপরোক্ত সকলকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এজন্য তাঁরা পুলিশ ও গোয়েন্দার চক্ষুশীল হয়েছেন এবং বার বার বহু কৈফিয়তের মুখে পড়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আন্দোলনে অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রদান করেছেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সহকারী প্রধান শিক্ষক সেন্ট পল্‌স স্কুল, পরে প্রধান শিক্ষক যোধপুর পার্ক হাই) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গোপন সংগঠনে ছিলেন গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী,

সমরেশ সেন প্রমুখ শিক্ষক নেতারা অকস্মাৎ আক্রমণ হলেও আন্দোলন চালাতে হবে এই প্রতিজ্ঞায়।

শুধু কলকাতা নয় রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলন ঐতিহাসিক মাত্রা সংযোজন করেছিল। এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিতে স্থানলাভ করেছে। এসব ক্ষেত্রে অসংখ্য কর্মীদের অবদান উল্লিখিত হলেও বহুল সংযোজনের অপেক্ষা রাখে। ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষকেরা এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেন। জেলার দুই বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা বিজয়কুমার বসু এবং নির্মল চন্দ্র গুপ্তের নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় এ সময়ে শিক্ষকেরা নতুন নেতৃত্বের পত্তন করছিলেন। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য (ব্যারাকপুর এ. ভি. মডেল স্কুল), শ্রীমদনমোহন নাথ (বর্তমানে পৌরপতি—গারুলিয়া), শ্রীধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য (অমরনাথ পাঠশালা, ভাটপাড়া), ভোলানাথ ভট্টাচার্য (ভাটপাড়া হাই স্কুল, বর্তমানে প্রয়াত), অমূল্য দাস (ভাটপাড়া সেন্ট্রাল গার্লস, বর্তমানে প্রয়াত), শ্রীসুধীন লাহিড়ী (নবাবগঞ্জ হাই স্কুল), শ্রীবিমল সেন (দেশপ্রিয় যতীন দাস হাই স্কুল), সত্যগোপাল লাহিড়ী (সার এস. এন. বিদ্যালয়), এন. সি. পেরিয়াল (মাদারহাট পি একাডেমী), হরিমোহন সাহা (ঢাকুরিয়া বিনোদিনী হাই স্কুল)। অশোকনগরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নলিনী কর, শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত এবং শ্রীননী কর। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় এই আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছিলেন মনোরঞ্জন সাহা, কালিপদ আচার্য, লালমোহন ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস, শ্রীসজল রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। শ্রমিক নেতারা আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ রাম রঞ্জন ভট্টাচার্য, নিতাই সুর, সেবাব্রত বিপ্লব চ্যাটার্জী, শ্রীগোপাল বসু এবং শ্রীবিনয় মজুমদার এ'দের পুরোধা ছিলেন। ভাটপাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিভূতি ভট্টাচার্য শিক্ষক ও শ্রমিকদের একযোগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ডঃ রাম রঞ্জন ভট্টাচার্য শ্রমিকদের মহল্লাগুলিতে ছোট ছোট সভা করে তাদেরকে আন্দোলনের সমর্থনে নিয়ে এসেছিলেন। সে দিনের তরুণ কর্মী শ্রীরমেশ ভট্টাচার্য সংগঠন ও প্রচারে ব্যাপকভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। অচিরে তিনি বিরাট এ জেলার অবিসংবাদী শিক্ষক নেতা হিসাবে পরিচিত হন। তিনি গারুলিয়া থেকে হালিশহর পর্যন্ত রিকশোতে মাইক বেঁধে শিক্ষক আন্দোলনের প্রচারে নিয়মিত নেমে পড়েন। সেদিনই তাঁকে "শিক্ষক সৈনিক" বলে নাম দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে দু-দশক তিনি সমিতির জেলা সম্পাদক ছিলেন। হিন্দি এলাকায় তাঁর বক্তব্য হিন্দিতে সম্প্রচার করতেন কমল চ্যাটাজী। হাড়োয়াতে কৃষক সমিতির নেতা আবদুল জব্বর প্রচণ্ডভাবে আন্দোলনে শ্রম দিয়েছিলেন।

বর্ধমান জেলায় শিক্ষক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষক সভার সর্বস্তরের নেতৃত্ব। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় সমূহে কর্মবিরতির যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার পশ্চাতে কৃষক সংগঠনের নেতাদের ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া কলকাতায় মিছিলে এ জেলায় ব্যাপক অংশের মানুষেরা সামিল হয়েছিলেন। আন্দোলনের উত্তালতা স্থানীয়ভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। এ বিষয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী, বিধায়ক ফটিক রায় প্রমুখ সুপরিচিত নেতারা। বর্ধমানে বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা তারাকুমার মিশ্র অন্যান্য জেলায়ও সংগঠন গড়েছেন। অন্যান্য নেতা জহর বন্দোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা হিসাবে পরিচিত), প্রশান্তকুমার গাঙ্গুলী, লোকানন্দ মজুমদার, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শ্রীআমোদ বসু জেলার বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন করেছেন। আসানসোল মহকুমায় গোপীকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীমতি দুর্গা দেবীকে এই কাজ করতে দেখা গিয়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর সিলভার জুবলী স্কুল আন্দোলনের বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়। এখান থেকে খড়গপুর, ইন্দা, দাঁতন প্রভৃতি স্থানে নেতৃত্ব দেওয়া হতো। শিক্ষকদের পক্ষে নেতৃত্ব দিতেন জগদীশ ভট্টাচার্য ও শ্রীশ্যামল দত্ত। সদর মহকুমায় জগদীশ চন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র নাথ সাহা ; তমলুক মহকুমায় কালোবরণ চ্যাটার্জী, জ্ঞানকুমার মিশ্র, সত্যনারায়ণ মাইতি, পুলক বেরা ; ঝাড়গ্রামে আশতোষ রায় ; বিজনপুরে রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঘাটালে প্রফুল্লকুমার জানা কাজ করতেন। ছাত্রদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন শ্রীপঞ্চানন সাহা (পরে ডকরেট করেছেন)ও প্রয়াত প্রশান্ত লাহা (পরে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন)। শ্রীনারায়ণ চৌবে ও শ্রীগৌরীশংকর মিত্রের নেতৃত্বে রেলওয়ে শ্রমিকেরা স্থানীয় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ডাঃ বলাই চন্দ্র রায়কে সর্বদা আন্দোলনের পাশে দেখা যেতো।

শিক্ষক আন্দোলন পুষ্পময়ী বসু, গৌরীচরণ ভট্টাচার্য এবং সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এ'দের পাশে এসে দাঁড়ালেন সুনীতি বিশ্বাস (খাগড়া গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন), এবং ছাত্রনেতা শ্রীপ্রভাত রায়চৌধুরী।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে আন্দোলনের সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরে প্রয়াত সুধীর কুমার ঘোষ (রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল) এবং প্রয়াত ভবানী তলাপাত্র (বালুরঘাট ললিতমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যা) এর নাম যুক্ত করা যায়। মালদহের প্রসিদ্ধ নেত্রী রেণু লাহিড়ীর পাশে প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সুধাংশু ভূষণ রায় (নর্ঘারিয়া হাই স্কুল) এর নাম উল্লেখ্য। শিলিগুড়িতে আন্দোলনে বড় বড় সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ সরকার এবং বীরেশ্বর মজুমদার।

জলপাইগুড়ি জেলা আন্দোলনে বিশেষ স্থান নিয়েছিল। ঐ আন্দোলনে যাঁরা প্রধান প্রধান ভূমিকায় এসেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ (প্রাথমিক বিভাগ), সোনাউল্লা হাই স্কুলের সুরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী, শ্রীসীতাংশু সাধ্য, শ্রীসুহৃদ সেন, শচীভূষণ ঘোষ, মণীন্দ্র দেব হাই স্কুলের মহেন্দ্র মৈত্র, শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্তী, শ্রীঅসিতানন্দ ভট্টাচার্য (বর্তমানে অধ্যাপক), শিক্ষিকা শ্রীমতী তারা ব্যানার্জী, সত্যসাধন বাগচী প্রমুখ। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন প্রয়াত যতীন্দ্র নাথ সিংহ (এম. এল. সি. হয়েছিলেন), শ্রীসুরেশ চন্দ্র চন্দ, শ্রীসুধীর কুশারী ও শ্রীসতীনাথ চক্রবর্তী এবং ধূপগুড়ির শ্রীরবি দত্ত।

হুগলী জেলার শিক্ষক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে বিশেষ শক্তি সঞ্চালন হয়েছিল তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সমিতির নেতা শ্রীশশিমোহন ভট্টাচার্য সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে এবং শ্রীচন্দন সুর চন্দননগরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দিয়েছেন। শ্রীঅনিমেশ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে জেলাব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ জেলার আন্দোলনে শিক্ষিকাদের মধ্যে যারা অগ্রণী ছিলেন শ্রীমতি নমিতা দাসগুপ্ত ও শ্রীমতি সন্ধ্যা চ্যাটার্জীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

নদীয়া জেলার শিক্ষক আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা বীরেন আচার্য ও সরোজমোহন গোস্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীলকৃষ্ণ মৈত্র, রাণাঘাটের তারাপদ বসু, পূর্ণ বাগচী, নারায়ণ ব্যানার্জী, নবগোপাল ব্যানার্জী, চাকদহের নিবারণ চট্টোপাধ্যায়, বীরনগরের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, বাদকুল্লার ফণীভূষণ মণ্ডল, শান্তিপুরের কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল, উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায় (ছোট), গয়েশপুরের শিবেশ বিশ্বাস এবং সত্যগোপাল বিশ্বাস, বেথুয়াডহরির করুণাময় ভট্টাচার্য এবং শিমুরালির কানাইপ্রসাদ চক্রবর্তী। শিক্ষকদের সমর্থনে বিরাট ছাত্র আন্দোলন গড়ে ছিলেন শ্রীঅজিত সান্যাল, সুনীল বিশ্বাস ও কানাইলাল আচার্য। ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টির সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবীভূষণ আচার্য, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, আর. এস. পির দেবু চট্টোপাধ্যায়, আর. সি. পি. আই-এর প্রণব চট্টোপাধ্যায়, শিবু সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শুধুমাত্র জেলার আন্দোলন সংগঠনে নয় কেন্দ্রীয় স্তরের আন্দোলনেও হাওড়া জেলার শিক্ষক সমিতি বিরাট ভূমিকা নিতে পেরেছিল। আন্দোলনকালে ও পরবর্তী সময়ে এদের প্রচেষ্টায় হাওড়া শহর এলাকায় বড় বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমাবেশগুলিতে শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠন ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিল। বিজয়রতন বকসী, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ নেতাদের পাশে অজস্র স্বেচ্ছাসেবক কাজ করতেন। এঁদের একটা অংশ অবস্থান শিবিরে মহিলাদের দেখাশোনা এবং অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ চালাতেন যাঁদের মধ্যে প্রয়াত বীণা (মজুমদার) চৌধুরী, শ্রীমতী নীলিমা সেন এবং শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষক আন্দোলনে তারাপদ সিকদার (প্রয়াত) এবং শ্রীমতী উমা দেবীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু মহান্তি (প্রয়াত) এবং শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রয়াত প্রমথ ঘোষ, শ্রীননীগোপাল রায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, উদয়ভানু ঘোষ—এঁদের উদ্যোগে আন্দোলনের সমর্থনে বড় বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বীরভূম জেলায় এ সময়ে আন্দোলন গড়বার কাজে বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকদের মধ্য থেকে এ ব্যাপারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরা হলেন মল্লারপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীরাধাবল্লভ রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক, বাহিরি ব্রজসুন্দরী হাই স্কুলের শিক্ষক শিশির হাজরা (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বর্তমানে প্রয়াত), বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক কানাইলাল দাস (প্রয়াত), নলহাটি হরিপ্রসাদ হাই স্কুলের শিক্ষক গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায় এবং অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় (দু-জনেই প্রয়াত), শ্রীরাম হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীতারক চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীকিষণলাল চট্টরাজ, নাগরী স্কুলের শ্রীঅরুণ চৌধুরী (বর্তমানে সমিতির সাধারণ সম্পাদক) প্রমুখেরা।

National Union of Teachers

Hamilton House,
Mabledon Place,
London, W.C.I.,
13th January, 1932.

Dear Sir,

I have to thank you for your letter of December 24th, and in response to your request, enclose a copy of my letter to your Secretary dated November 25th.

The Secretary of State for India has been approached on your behalf, and I understand he is awaiting the report of the final enquiry which is being held by the Commissioner of the Division in conjunction with the Inspector-General of Police, who have been specifically required to report on "the conduct of the police and other Government servants in connection with events in Chittagong and Mofussil."

As soon as I have anything definite to report, I will communicate with you again.

Yours faithfully,
Sd/- F. Mander
General Secretary.

S. Sil, Esq.,
Jt. Secretary,
All-Bengal Teachers' Association,
206, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

National Union of Teachers

Hamilton House,
Mabledon Place,
London, W.C.I.,
25th November, 1931.

Dear Sir,

COPY.

I have to acknowledge the receipt of your letter of October 14th, copies of resolutions passed at a meeting of your Association, and the "Teachers' Journal" for September. The school children who reside in Chittagong certainly appear from the reports of your school secretaries to be suffering from very grave injuries received at the hands of the military police, and I have been instructed by my Executive to take up the matter with the Secretary of State for India. I hope to be able to consult him at an early date, and as soon as I have any information to report. I will communicate with you again.

Yours faithfully,
Sd/- F. Mander
General Secretary.

P. Sengupta, Esq.,
Secretary,
All-Bengal Teachers' Association,
206, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

তালের মাষ্টার

(মানিক বন্দোপাধ্যায়কে)

আশরাফ সিদ্দিকি

তাল সোনাপুরো তালের মাষ্টার আমি ঃ
আজ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ বছর দিবস যামী
যদিও করেছি লেন নয় শিক্ষার দেন
(মাফ করবেন। নাম শুনেই চিনবেন)
এমন কথা কেমন করে বলি।
তবুও যখন ঝাড়তে বসি স্মৃতির থলি
মনে পড়ে অনেক অনেক কচি মুখ, চপল চোখ ঃ
শুনুন ঃ গর্বের সাথেই বলি ঃ
তাদের ভেতর অনেকেই এখন বিখ্যাত লোক!
গ্রাম্য পাঠশালার দরিদ্র তালের মাষ্টারকে
না চিনতে পারেন! কিন্তু তাদেরকে
নাম শুনেই চিনবেন!
(মুনাজাত করি ঃ খোদা তাদের আরো বড় করেন।)
অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে আমার
পিঠ বেঁকে গিয়েছে আর চোখেও ভাল দেখিনা তেমন
তাই ভাবছি ঃ সময় থাকতে এখন
আত্ম-কাহিনীটা লিখে যাবো আমার!
রবিবাবু থেকে আরম্ভ করে আজকে বিভূতিভূষণ
আরো কত সাহেব, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, রায়,......
কত কাহিনীই আপনারা লিখে গেলেন!
কিন্তু মানিকবাবু! আপনি কি এমন কাহিনী শুনেছেন ঃ
কোথাও রোমান্স নেই! খাঁটি করুণ বাস্তবতা—
এবং এই বাংলা দেশেরই কথা!

নমস্কার।
আমিই সেই তাল সোনাপুরোর তালের মাষ্টার!
আরম্ভটা শুধুই সাধারণ। কারণ
রক্ত স্নানে শুভ্র হয়ে সত্তর বছর পূর্বে যখন
প্রথম আলো দেখলাম, হাসলাম এবং বাড়লাম
তখন থেকেই ট্রাজিডি চলছে অবিরাম।
লেখাপড়ায় যদিও খুব ভাল ছাত্র ছিলাম
অষ্টম শ্রেণীতে উঠেই বন্ধ করে দিতে হলো, কারণ
পিতামাতার সংসারে নিদারুণ অনটন!
জমিদার সাহেবের কৃপায় চাকরি জুটে গেল একখানা
ডজন খানেক ছেলেমেয়ে পড়ানো, মাসিক বেতন তিন টাকা আট আনা

(তাদের ভিতর একজন এখন ব্যারিষ্টার!
জানি না তালের মাষ্টারকে মনে আছে কি না তার!)
পাঠশালা খুলেছি তারপর
সুদীর্ঘ দিন ধরে বহু ঝঞ্ঝা ঝড়
বয়ে গেছে। ভুলেছি।
অক্লান্ত ভাবেই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছি।
জলের মত কেটে গেল
কত ছাত্র গেল, এল—
প্রমোশন পেল
কিন্তু দশ টাকার বেশি প্রমোশন হয়নি আমার!
কপালে করাঘাত করেছিলাম জীবনে প্রথম সেবার
যখন টাকার অভাবে একটি মাত্র ছেলের পড়া বন্ধ হলো!
আক্রার বাজার! চাল নুনেই কাবার।
কি-ই করার ছিল আমার!
ঘরে বৃদ্ধ মা বাপ
পুরাতন জ্বরে ভুগে ভুগে তারাও যখন ছাড়লো শেষ হাঁক
দুঃখ করে শুধু খোদাকে বলেছিলাম একবার ঃ
এতো দরিদ্র এই তালের মাষ্টার!
তবু ছাত্রদের বোঝাই প্রাণপণ ঃ
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন!

দেশে এলো কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন
মহাত্মার অনশন ; দেশব্যাপী সে কি আলোড়ন
খিলাফতের ঝড় বইছে এলোমেলো
খড়ো ঘরে ছাত্র পড়াই আর ভাবি ঃ এই সুদিন এলো।
মন দিয়ে বুঝাই পলাশীর যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা
হজরত মোহম্মদ, রাম লক্ষ্মণ আর বাদশা সলোমনের কথা
গুণ গুণ করে গান গাই ঃ একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
অভিরামের হয় দীপান্তর, ক্ষুদিরামের হয় মাগো ফাঁসি।
এল মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট বন্ধু
সকলের কথাই ভাল লাগে ঃ ভাবি এরাও বুঝি দেশের বন্ধু!
কোথাও শুনি ঝগড়া লেগেছে। আগুন জ্বলেছে-জ্বলুক। ওরা
তবু তো জেগেছে। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া ক'দ্দিন থাকে। নিভবেই এক দিন
লেজে যদি তোদের আগুন লেগেই থাকে তবে শত্রুর স্বর্ণলংকাই পোড়া।

ছেলেটি কাজ করে মহাজনী দোকানে
মাসিক, পাঁচ টাকা বেতন। প্রাণে
তবু বেঁচে আছি। এল পঞ্চাশ সাল
ঘরে বাইরে হাটে বাটে আকাল। ঘোর আকাল!
এক শো টাকা চালের মন। পঞ্চাশ,—হায় পঞ্চাশ!
ঘরে বাইরে দিনের পর দিন উপাস—হায় উপাস!

গ্রামের পর গ্রাম কাল কলেরায় উজাড়!
নিরীহ তালের মাষ্টারের বুকেও বজ্র পড়লো! কলেরায়
ছেলেটি মারা গেল বিনা পথ্যে বিনা শুশ্রূষায়!
কাফনের কাপড় জোটেনি, তাই বিনা কাফনে
বাইশ বছরের বুকের মানিক-কে কবরে শুইয়ে দিয়েছি এখানে!
এই-ই শেষ নয়—শুনুন বলি ঃ
মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলি।
সেখানেও আকাল। মানুষে মানুষ খায়!
তিন দিনের উপবাসী আর লজ্জা বস্ত্রহীন হয়ে নিদারুণ ব্যথায়
দাঁড় কলসি বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়!
মানিকবাবু, আমি জানি প্রাণবান লেখনি আপনার
তালের মাষ্টারের সাথে হয়ত আপনিও অশ্রু ফেলছেন বেদনার।

কিন্তু আশ্চর্য! আজো বেঁচে আছি আমি
এবং অক্লান্তভাবে দিবস যামী
তাল সোনাপুরের প্রাইমারী পাঠশালায় বিলাই জ্ঞানালোক ঃ
ছাত্রদের পড়াই ঃ ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক
শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক......।

শুভাকাঙখীরা সকলে আমায় বলেন ঃ বোকা মাষ্টার!
কারণ ঘরের খেয়ে যে বনের মোষ তাড়ায় তা ছাড়া সে কী আর!
যুদ্ধ থেমে গেছে। আমরা তো স্বাধীন।
কিন্তু তালের মাষ্টারের তবু ফিরল না তো দিন!
স্ত্রী ছয়মাস অসুস্থা
আমারও সময় হয়ে এসেছে ঃ এই তো শরীরের অবস্থা!
পাঁচ মাস হয়ে গেছে ঃ শিক্ষা বোর্ডের বিল নাই
হয়তো এবারের টাকা আসতে আসতে শেষ হবে আয়ু। তাই
শতচ্ছিন্ন জামাটা কাঁধে ফেলে এখনও পাঠশালায় যাই
ক্ষীণ কন্ঠে পড়াই ঃ
হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে...........।

মনে মনে বলি ঃ
যদিই ফোটে একদিন আমার এই সব সূর্যমুখীর কলি
ইতিহাস সবই লিখে রেখেছে। রাখবে—
কিন্তু এই তালের মাষ্টারের কথা কি লেখা থাকবে?
আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা
আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু নিজের জীবনই অন্ধকার মালা।
মানিকবাবু, অনেক বই পড়েছি আপনার
পদ্মানদীর মাঝির ব্যথায় আমিও কেঁদেছি বহুবার
খোদার কাছে মুনাজাত করি ঃ তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

আমার অনুরোধ আপনি আরো একটা বই লিখুন
আপনার সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে তুলে ধরুন।
আর, আমাকেই তার নায়ক করুন।
কোথাও রোমান্স নেই ঃ খাঁটি করুণ বাস্তবতা
এবং এই বাংলা দেশেরই কথা॥
(নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপত্র থেকে সংগৃহীত)

....

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আহূত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে (৯ই আগস্ট, ১৯৫৩) উত্থাপিত প্রস্তাবঃ (যুগবাণী পত্রিকা ১৩৬০ সাল, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত)

শিক্ষা জাতির মৌলিক সমস্যা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর সব কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌবল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" ইচ্ছা কবির উচ্ছ্বাস নহে ইহা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সত্য। সমস্ত প্রগতিশীল দেশের সমৃদ্ধি ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে। শিক্ষার প্রভাবে যাহারা মূক তাহারা পায় ভাষা, যাহারা মূঢ় তাহাদের চিত্তের আচরণ হয় উদ্‌ঘাটিত। যাহারা অক্ষম তাহাদের আত্মশক্তি হয় জাগরূঢ়, ব্যষ্টি আর সমষ্টির মধ্যে আসে এমন এক অনুপ্রেরণা যাহাতে সমস্ত দেশের, সমস্ত জাতির চেহারা যায় সম্পূর্ণ বদলে। শিক্ষায় গণ হয় সার্থক ও কল্যাণকর, চাষী ফলায় মাঠে দ্বিগুণ সোনার ফসল, কলে-কারখানায় শ্রমিক বৃদ্ধি করে জাতীয় সম্পদ। বৈদেশিক শাসনে দুইশত বৎসরের শিক্ষার অভাব ভারতবর্ষকে করিয়া রাখিয়াছে পঙ্গু। অশক্ত দুর্ভিক্ষ দৈন্যপ্রপীড়িত। স্বাধীনতার পরেও ভারত সরকার কিংবা বিভিন্ন রাজ্য সরকার শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হইয়া রহিয়াছেন সম্পূর্ণ উদাসীন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার অগ্রগণ্য দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ব্যয়-বরাদ্দে শিক্ষার দাবী শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হইয়াছে। তাই এই জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন দাবী করে যে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশুকে যথাযোগ্য শিক্ষার সুযোগ দিবার দায়িত্ব সরকারের এবং জনসাধারণের সহিত সহযোগিতায় শিক্ষাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সরকারের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। শিক্ষা সম্বন্ধে এই জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অভিমত এই যে বৃহৎ কোন পরিকল্পনা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপাইয়া দেওয়া বর্তমান বাস্তবে সম্ভবপর হইতে পারে না। ইতিহাস রচিত হয় বাস্তবকে কেন্দ্র করিয়াই। কোন বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে শিক্ষাসৌধ নতুনভাবে গড়িয়া তোলার সামর্থ্য আমাদের বর্তমান জাতীয় সরকারের নাই। সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থাকেই জাতীয় জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সংস্কৃত ও মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ও চমকপ্রদ ও চটকদার পরিকল্পনার কথা না ভাবিয়া বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন সরকারকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিতেছে—

(ক) যে সকল বিদ্যালয় স্থানীয় অধিবাসীর শিক্ষালাভের তাগিদে এবং জনসাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও

সরকারকে সেগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং সরকারী সাহায্য দিয়া সেগুলির মান উন্নত করিতে হইবে।

(খ) যে সমস্ত স্থানে বিদ্যালয় প্রয়োজন, সে সকল স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সারা পশ্চিমবাংলার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মান বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উদ্দেশ্যানুগ করিতে হইবে। বর্তমানের পুঁথিগত শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের বাস্তবতার সহিত যুক্ত করিতে হইবে এবং রুচি ও সামর্থ্য ভেদে শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন শিক্ষাধারা অনুসরণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

(ঙ) কারিগরী শিক্ষার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(চ) বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ সেবামূলক কার্যের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। পাঁচশালা পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে ঐ টাকা বিদ্যালয়গুলির এই দিকের উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়া ব্যয় সার্থক করিতে হইবে।

(ছ) শিক্ষাকে সার্বজনীন, সুলভ ও সহজ করিতে হইবে। এই সভা যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করে ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব শিক্ষা সংকোচনেরই নীতি। কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধি করা চলিবে না।

(জ) শিক্ষকদের চাকুরীর নিরাপত্তা, দায়িত্বানুযায়ী বেতন ও মর্যাদা স্বীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকদের আত্মোন্নতির যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদেই হোক অথবা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতেই হোক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদিগের প্রভাব আরও বৃদ্ধি করিতে এবং আরো প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় সম্মেলন মনে করে যে এই দুর্মূল্যের দিনে ২০০ টাকা বেতনের কমে পরিবার প্রতিপালন করিয়া নিশ্চিন্তমনে স্বীয় দায়িত্ব পালন করা কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সেইজন্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষকগণের ন্যূনতম বেতন ২০০ টাকা ধার্য করা উচিত বলিয়া যে সুনিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এই সম্মেলন তাহা সমর্থন করে। এই সম্মেলন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদিগের জন্য যথাযোগ্য জীবিকার দাবী সরকারকে জানাইতেছে। এই সম্মেলন নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের নতুন স্কুল কোডে নির্ধারিত বেতন প্রবর্তনের ও অন্যূন ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবীকে আন্তরিক সমর্থন জানাইতেছে এবং এই দাবীর ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে কর্মবিরতির পন্থা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার জন্য সরকারই জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছে। এই সম্বন্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে সমস্ত শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে এবং শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি, সরকার পক্ষের এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধিদের লইয়া পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিবার অনুরোধ জানাইতেছে।

বাঁচার পথে প্রাথমিক শিক্ষকদের গান

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ফয়েজউদ্দিন ছিলেন কবি। ১৯১৭ সালে ভাবতা গ্রামে জন্ম হয়। বাঁচার পথে মানুষের যে চেতনা দরকার সে সম্পর্কে গীত রচনা করতেন এবং নিজ সুরে সেগুলি পরিবেশন করতেন। ১৯৪৯ সালে কতকগুলি গীতের এক সংকলন প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ নিরাপত্তা আইনে তিনি যখন বিনা বিচারে

আটক তখন এটি প্রকাশ করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঐ গীতগুলির প্রভাব অনুমেয়।

দুর্লভ এই গান সংগ্রহ করে দিয়েছেন নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণ চৌধুরী। স্বাধীনোত্তরকালে শিক্ষক আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে এ গান ঐতিহাসিক দলিল বলে মনে করা যেতে পারে।

দেশবাসী শোন দেশের পল্লী গুরুর কথা
পায়না খেতে পেটে দুটো গড়িয়া সভ্যতা গো
                    গড়িয়া সভ্যতা॥

মাথার ধুলা পায়ের কাদা মুছিয়ে নিজ হাতে
লাট বড়লাট মন্ত্রী গড়ে আসন দিলাম পেতে
গুরুজীদের ভুলালো তারা লাট মন্ত্রীর দল
টাকার অভাব বলে করল শত ছল।
ধাপ্পাবাজী মানব না শুনবো না মেকী কথা
বাঁচার পথে লড়ব মোরা গড়িয়া একতা গো
                    গড়িয়া একতা॥

মাঠের রাখাল হাটের কুলি পথের ধূলি কণা,
কুড়িয়ে এনে আমরা তাদের গড়ি খাঁটি সোনা,
গন্ধ-বহ গন্ধ লুটে আমরা কুড়াই ফুল
মোদের দুঃখ হয়, না তো হয় কে তো, কেও ব্যাকুল,
(এবার) নিজেই মোরা হব নিজের ভাগ্য বিধাতা
হাজার কণ্ঠে তুলবো আওয়াজ সইব না আর ব্যথা গো
                    সইব না আর ব্যথা॥

দুঃখ শোকে নাইক মোদের আরাম অবসর
মানুষেরে মানুষ করে গড়তে নিরন্তর
ধূপ কাঠিরই মতন পুড়ে গন্ধ করি দান
সবার তরে বিলাই খ্যাতি হইয়া অপমান
(এবার) লড়ব মোরা করব আদায় স্বার্থ স্বাধীনতা
সভ্যতারী সৃষ্টি পথে স্বার্থকতা গো
                    বাঁচার স্বার্থকতা॥

নাইক মোদের অন্ন বস্ত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই
লক্ষ সতীশ তাইতো দুঃখে গুমরে মরে হায়,
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মন্ত্রী দুঃখ নাহি পায়—
মাথা খারাপ বলে সবার ভুল বুঝাতে চায়,
দুঃখের জ্বালা বুঝলে কি আর কইত অমন কথা
শিক্ষক মেরে শিক্ষা বিস্তার বেতার বারতা গো
                    বেতার বারতা॥

তেঁতুল পাতার ঝোল অম্বল খাদ্য ভাইটামিন
নিত্যভোজে বিদ্যাবুদ্ধি শরীর হলো ক্ষীণ
বস্ত্রাভাবে শিক্ষকেরা চটের থলি পিন্ধে
মা বোনেদের ইজ্জত বাঁচায় লজ্জায় মরে কেঁদে
গুরু হয়ে গরুর মত সইব কত ব্যথা

থাকলে বসে ধরব বলে জাগবে না মমতা
                    জাগবে না মমতা॥

মধ্যম প্রদেশে শুনি লাট সাহেবের পাশে
শিক্ষকেরা ভোজ খাবে সব এক আসনে বসে,
ধাপ্পা দিয়ে ভুখা রাখার ফন্দি কত জানে
ক্ষিদেই মেরে সান্ত্বনা দেয় ঘুম পাড়ানি গানে
বলির পাঁঠার মুখে জানি দেয় গো কাঁঠাল পাতা
ছলে বলে কৌশলেতে ভান করে মমতা গো
                    ভান করে মমতা॥

ভুলের মোহ কাটিয়ে যখন গড়াল সব সমিতি
বাঁচার পথে এই হাতিয়ার নাইক অন্য গতি,
লাগল পিছে বিভেদকারী নতুন ধোকাবাজ
ঘুষ বেসাতি বখরা লোটাই নিত্য যাদের কাজ
বাঁচার পথে মানব না বেইমানদের মেকী কথা
গড়ব সাচ্চা সমিতি আর গড়ব সাচ্চা নেতা গো
                    গড়ব সাচ্চা নেতা॥

সাত চল্লিশের ঐতিহাসিক ধর্মঘট কথা
কোথায় ছিলো কেউ মানে না গায়ে পড়া শত নেতা
বাঁচার পথে কত লড়াই গাঁয়ের গুরু মিলে,
বেকায়দায় পড়িয়া দাবীর কিছু মেনে নিলে
বাঁচার পথে লড়তে গড় শক্তি ও ক্ষমতা
আপোষ ভুলে লড়াই কর মিলবে সফলতা গো
                    মিলবে সফলতা॥

টাকার অভাব মিথ্যা কথা দেশবাসী সব জানে
আমলা পুলিশ মন্ত্রী পোষার খরচ এত কেন
স্বাধীন দেশে কেন তবে বিদেশী কোম্পানী
দখল করে মেটে নাকো টাকার টানাটানি
জেগেছে প্রাথমিক শিক্ষক জেগেছে জনতা,
পারে না ভুলাতে তাদের বলিয়া আর যা তা গো
                    বলিয়া আর যা তা॥

বিবৃতি প্রস্তাব কমিটির রঙ্গ মাখা কল্পনা
হচ্ছে হবে ধৈর্য ধর একথা মানব না
সহ্য করার সহ্য শক্তি নেইক মোদের আর
বাঁচার পথে শেষ লড়াইয়ের আরম্ভ এইবার
সাক্ষী মোদের দেশের যত দেশ প্রেমিক জনতা
না খেয়ে পারি না মোরা করতে শিক্ষকতা গো
                    করতে শিক্ষকতা॥

হয়ত মোরা করব লড়াই আবার বাঁচার পথে
দ্বিগুণ জোরে আগুন হয়ে উঠবো এবার ফেটে
জেলে জুলুম আর কিছু বাধা কিসের পাওয়া
মান ইজ্জত স্বার্থ মোদের সব গেছে খওয়া

স্বাধীন দেশে নাইক কেন বাঁচার স্বাধীনতা
দাওগো জবাব স্পষ্ট করে মন্ত্রী ও সব নেতা গো
মন্ত্রী ও সব নেতা॥

(পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ১৯৪৮ সালের বহরমপুর সম্মেলনে সমাপ্তি সঙ্গীত রূপে গীত হয়)

আন্দোলনের সমর্থনে সংসদের রাজ্য সভায় ১৮।২।৫৪ তারিখে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ কালিদাস নাগের বিবৃতিঃ

Mr. Chairman, I start probably from the wrong and I do not accept that the Bengal Teachers problem is a state subject or a provincial problem. It is a vital subject which affects the destiny of our whole nation. Incidentally it is in Calcutta. But this has a symbolic aspect and it has got a symptomatic character. It is the nature of the tragedy that I want to bring before my hon'ble colleagues here. What is its symptom? The symptom is that we, who are fairly well placed in life, are not sufficiently conscious of the sailent, yet serious tragedy that we are allowing by our policy of drift to develop in our social life. Therefore, though geographically the occurrance is a Calcutta incident, it is an all India affair; and from that point of view, I beg to draw the members of Parliament "especially yours Mr. Chairman, who gave many years of your life to Calcutta.".

I take you into confidence—You, Sir, who have spent over 20 years in Calcutta and Bengal, why this progressive deterioration in the relationship between educated leaders and the teaching classes. I feel that something serious is happening in the very foundation of our educational life. We ought to be ashamed, Sir, and as a teacher, I know that before independence we had teachers, who are paid less than Rs. 30 per month. From Rs. 30 you have raised the Basic salary to Rs. 60, but, then, what is the worth of a rupee these days? My hon. friend, Prof. Ranga knows what a rupee meant in our school days and what a rupee means to-day. If you as responsible parliamentarians, delude yourselves with the belief that by slightly raising the percentage here or there, you have solved the problem, you are much mistaken. You are not even touching the fringe of the dangerous problem. The teachers who are silently suffering this hardship are vital members of our body politics, We should feel for silent sufferers rather than for the talk active people who go about and should that they are asserting their rights. These humble teachers have also their civil rights, nay, their God-given rights. You know Sir, that when you started your great career as an educationist with the first university commission (1917), there were few notes or sketching chapters here and there on the victims of this grade education, for we were too busy then with the so-called

"higher education". In those days it was fashionable under the British regime, to classify teachers under higher education and lower education. I am not concerned with higher education though I wasted my life in that branch of the education. I came to be concerned because I was invited by my friends of Orssia to preside over the Primary Teachers conference in Puri. I felt ashamed and humiliated in my conscience to find that such low salaries are paid to our rural teachers—and they are all family men with wives and children. There are experienced ladies in this House and I request them to give their candid opinion on this vital subject. It is not a question of party or of a province. It is the basic problem of the whole of India and there has been no All-India Commission from the days of Lord Macaulay, for full one century (1830-1930) to examine and have a realistic and intensive analysis of the economic and social condition of the Indian teachers who are to support the whole superstructure of the higher education in India. It is an inverted pyramid (three times have I climbed the pyramids) and I give you this warning that if this precariously balanced pyramid topples over, it will be one of the greatest disasters not only to Bengal or to India, but to the whole world. We are not seriously looking after the basic living requirements of millions of our teachers. They are condemned to live in sub-human conditions and I appeal to all of you hon'ble friends to forget the party and consider whether as a free nation we should not take up this challenge of live to the common sea where some sections of our own community are obliged perpetually to live under such tragic conditions. This question is not of giving much but only of giving the irreducible minimum on which they are to live. Very little has been discussed on this issue in the two university commission reports, including the Radhakrisinan Commission. Let there be real Basic Education Commissions and no more ommissions! We want a commission actually of the central government to determine an all-India basis standard of living for the teachers and on that basis to regulate the budget. In this last speach I delivered in this session, I request every responsible Members of the House of the People and our Council to think of the teachers of the nation who silently bore this burden all these years and who naturally, with the dawn of Independence, are entitled to ask the question—"What is the meaning of Independence to me if I do not find food and education for my own children and my family?" In illness they have no surplus to pay the doctors.

Let us go to their homes; they are our kith and kin and all of you know how responsible the humble teachers are, but we have refused them even the barest needs of life. We cannot maintain our Independence by keeping millions of teachers in this condition. It is a question of tomorrow

and the day after. It is not Five Year Plan. Many of us will be eliminated before our five year plans have materialised. I request every one to think of these teachers. We may, if necessary, adjourn this House and go there in the streets of Calcutta and see the real situation. We are all one country, one India and the humble teachers support the structure of higher education. We should come down to their level and join hands with them and say, they, too, have right to live decently. For this is a fundamental right in our constitution as well as in any progressive constitution of the world. I have gone through the world several times and I am ashamed to find that after seven years of Independence, we have given our teachers such a treatment. India's future is linked up with the amelioration of the teachers condition. Let justice be done and let truth alone triumph. That is my humble submission.

* * * * *

কলকাতা ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২১।২।৫৪ তারিখের সম্পাদকীয়

Calcutta's Attitude

AFTER Tuesdays flare up most of Calcutta has been calm. Whether the calm is real or feigned is difficult to tell. It may be due to the military and police patrols and to the arrests; or those responsible for the riots may prefer for the present to do no more than is required to keep the forces of law and order on the alert and so hope to tire them out or lull them into thinking that nothing further of city wide character is contemplated. The events of last July offer no reliable clue. Then there was room for doubt whether the riots were planned. On Tuesday disturbances occured almost simultenously in areas from the maidan and the Assembly House and followed a pattern. In July each climax came after gradual growing excitement. On Tuesday, the climax reached abruptly and what has followed has been on so much smaller scale that, though in the north of the city bombs were thrown and barricades erected on Friday, the official Press Note that day described the situation "as quiet and normal".

An outsider might be forgiven for thinking that Calcutta is getting habitual to violence. He would be mistaken. The average citizen is surfeited and disgusted, but either intimidated or helpless. Though some condemn the opposition for making capital out of the teachers grievences, others are uncertain where ultimate responsibility rests. One, whom were judge to be shop-keeper has expressed what may be the secret thoughts of many that he would support a Government of any political complexion if it could prevent the outbreak of disorder. Though it is unlikely that many believe in the extra-vagant communist thesis that the Government; through agents, set fire the trams and its own buses in order to discredit its opponents;

there is evidently a wide spread disposition to blame the Government for not being prepared or for not making the right preparation, or for doing the rights things too late.

Uncomplimentary as such opinions are, the Government would do well to regard them as helpless and even encouraging. They seem to indicate that a largely opposition minded city is approaching, if it has not already reached, the point at which it will back the authority if, while dealing justly and promptly with just causes, they take stringent measures to see that these are not exploited. This, we think, among humble people who have much cause for discontent, is something new, certainly it is more evident now than it was in July. Of course the number of people directly affected by the poor pay of teachers is very less than that concerned with an increase in tram fares. Even so, sympathy for the teachers is considerable and support for their cause would have been increasingly manifest if it had not been felt that the Government had at last dealt fairly with them. That achieved, people would like to see them back in schools, not setting a dangerous example to their students—(as Dr. B. C. Roy has tellingly pointed out) or continuing to associate their cause (perhaps reluctantly) with those who have marred it by their organised attacks on authority.

If the issues could now be disentangled most people would be happy—none more we suspect, than some left wing leader, who are in danger of finding themselves in the uncomfortable position of the Lady of Riga who went for a ride on a tiger. There may be minor difficulties here and there but the main outline which usefully be followed seems clear. The teachers should accept the Government's offer and at the earliest convenient opportunity such of their collegues be released. After careful sieving, others against whom no clear case can be made out of either taking part in or organising violence should also be set free, Left without the fuel of against authority as such. The Government would have full support in searching out the ring Leaders, so that there would be no recurrence of organised trouble. Calcutta will see many more demonstrations if policies are unpopular. They are many accepted ways of expressing disapproval. But there can be demonstrations without riots. Violence is what sobers citizen detest.

* * * * *

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকার সংবাদ (জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত)

The New York Times (New York), Dated 17-2-54 1st page (Bold Caption) Calcutta Police Fire on Rioters & Die as Red Fan. Teachers Strike (Special to the New York Times)

CALCUTTA, India, Febuary 16 : The Police fired on rioters to day following oppen communist participation in a strike of School Teachers. The police attacked the mobs with tear gas and guns.

(Four persons were killed and sixty five injured in the rioting, Reuters reported)

At least five street cars and several buses and police trucks were set ablaze by the rioters. Chowringhee, Calcutta's Time square, was a scene of wildest confusion and many shops in the vicinity were pillaged. Among those seriously injured by bullets were six staff members of the Britist owned newspaper Statesman who gathered outside the office to the riots.

Many section of the city were in complete darkness tonight because the street lamps were smashed and power stations disabled. Five engines were kept busy deallng with incendiarism.

(The rioters smashed the windows of the United States information offices, Reuter said)

In the afternoon, the police tried to break up a demonstration outside the Legislative Assembly, which was in session. They threw tear gas bombs at the crowd that attempted to break the police cordon around the building.

Earlier a crowd had held a meeting to press the demands of the West Bengal teachers who are on strike for higher pay and cost-of-living allowances.

The teachers are asking for a monthly cost-of-living allowance of 35 rupees ($-7-38). The Government recently conceded 10 rupees ($ 2.10) conditional on the school management paying an equal amount, but the strikers insist on 35 or nothing.

In the Assembly, Chief Minister B. C. Roy said the Government would raise contribution to 17 rupees 8 annas ($ 3.69). He added that because of a shortage of funds the school management would pay only 10 rupees to the teachers now and 17 rupees 8 annas from next January.

Moderate elements among the teachers seem to be willing to accept the new terms, but are being held back by the Communist and other Leftist groups. It seems likely that if the strikers and the Government do not soon reach a settlement, the initiative may pass from the teacher to the Leftist.

CALCUTTA RIOT'S AGAIN UNDER FIRE

Page—3, Dated 18.2.54

Police clash 2nd Night with Group of Demonstrators Defying Assembly Ban (Special to the New York Times.)

CALCUTTA. India, Feb. 17—For the second successive night, police fired into groups of demonstrator here, wounding serval.

Yesterday's riots that sterumed from a demonstration supporting pay demands of sriking school teachers, were followed by a morning and afternoon of comperative calm.

In the evening clashes occured in a park in central Calcutta when groups attempted to defy the ban on the assembly of more than five persons. The police were subjected to desultory attacks with home made bombs and rocks from surrounding streets. As darkness gathered, attacks intensified and the police used their guns.

The rest of the city was quiet and troops patrolled yesterday's trouble spots. Strong army detachments guarded buildings damaged yesterday. As especially strong guard was mounted at the United States Information Services premises in Chowringhee, a target of yeserday's riot.

As a result of last night's clashes buses and street cars were not running to-day, but most shops in the main streets and most business premises were open. Yesterday's casualties among rioters were estimated at six dead and seventy injured. Sixteen mounted policemen, a dozen foot policemen, six police horses and nine firemen were also injured.

Troops called in to aid the police had a sobering effect in the streets, which contained the charred remains of at least a dozen vehicles.

The promulgation of the decree prohibiting public assembly of more than five persons throughout the city also had a quieting effect. Another calming factor was that yesterday's mass arrest of left wing leaders appearred to have left the mob leaderless.

Red leaders seek Refugee

Calcutta, February 17 (A. P.)—Three communist leaders of West Bengal State restored to Parliamentary immunity to day to evade arrest in connection with two day's mob violence in Calcutta.

The three are Jyoti Basu, Bengali Communist leader and his lieutenants Ranen Sen and Hemant Ghoshal.

Dated 19.2.54

Page—4, (2nd, 3rd & 4th Column at the top)

Nehru Defeats Censure Motion Over Calcutta Rioting

(Photo) Associated Press

Photo Caption : A group of men & women teachers from Calcutta's non-government and non-missionary schools stage a sit down and lie down strike in one city's main thorough fares in hope that the Indian Government will accede to their demands for salary increases and other benefits.

News : Special to the New York Times

New Delhi, India, Feb 18—The Congress party government under Prime Minister Jawharlal Nehru defeated today the first motion of censure

debated by parliament since India became independent in 1947. The motion was on a technical point relating to a discussion off the riots of last two days in Calcutta. The Government won by 259 votes to 66. The opposition complained that Mr. Nehru had agreed to allow the Council of States, or upper house, to discuss the question but had ignored the feelings of the House of the people, or lower house which was really the representative body of the people.

New Delhi, India, Feb 18 (AP)—The Police opened fire for the third consecutive day to-day on unruly crowds in Calcutta a Government radio broadcast said here. Six people have been killed, more than sixty injured and at least 160 arrested in left wing demonstrations that flared up in Calcutta on Tuesday. The riots were sparked by a strike of 23,000 West Bengal School teachers agitating for higher pay and cost of living allowances.

* * * * *

* * * * *

সূত্রঃ—

†১। জনগণের সংগে—জ্যোতি বসু।

২। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ই, এম, এস. নাম্বুদিরিপাদ।

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী।

৪। রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি—সুধীর মুখোপাধ্যায়।

৫। আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা—ডঃ কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য।

৬। দেশ—কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা ১৮৮৫—১৯৮৫,

৭। সুভেনীর—৭৭তম পূর্ণাংগ অধিবেশন—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-কলকাতা ১৯৮৩,

†৮। ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী—অনিলা দেবী (শিক্ষা ও সাহিত্য মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৯)

†৯। কমরেড সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে—গোলকপতি রায় (নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৫৩তম বার্ষিক সম্মেলনের স্মারক পত্রিকা)।

†১০। কৃষক সভার ইতিহাস—আবদুল্লাহ রসুল।

†১১। সেদিনের কথা—মণিকুন্তলা সেন।

†১২। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—সরোজ মুখোপাধ্যায়।

১৩। শিক্ষা আন্দোলনের নিরলস সৈনিক—অরুণ চৌধুরী (শিক্ষা ও সাহিত্য—জুন ১৯৮৪)।

১৪। সকলের চিরদিনের সাথী হোন—অমিতাভ সেন (সত্যপ্রিয় রায় স্মরণিকা—কালিধন ইনস্টিটিউশন)।

১৫। আমাদের আন্দোলন—সংগ্রাম কথা—শশিমোহন ভট্টাচার্য (৪র্থ দ্বিবার্ষিক ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৮৭—স্মারক পত্রিকা)।

১৬। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—গোলকপতি রায়—স্মরণিকা ২য় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, ১৯৮৩)।

১৭। সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা—কালিধন ইনস্টিটিউশন।

১৮। ৬০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা—শিক্ষা ও সাহিত্য।

১৯। সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা ১৯২১-৭১—এ. বি. টি. এ.।

২০। স্মরণিকা—৫ম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন—নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

২১। চল্লিশ দশক—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা—গীতা মুখার্জী (সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর—ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, পঃ বঙ্গ রাজ্য কমিটি)।

২২। পঞ্চাশ দশকে ছাত্র আন্দোলন—হীরেন দাশগুপ্ত—ঐ

২৩। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ও প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ— ঐ

২৪। নব্য ভারতীয় শিক্ষাধারা ও সত্যপ্রিয়—মুক্তি দাশগুপ্ত (শিক্ষা ও সাহিত্য—মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯)।

২৫। নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা—মন্মথনাথ অধিকারী (শিক্ষা ও সাহিত্য—মে-জুন ১৯৮২)।

২৬। এসেম্বলি প্রসিডিংস—১৯৫৪—ভলিউম ৯ নং ২—পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা।

†২৭। সমিতির আন্দোলন ও মুখপত্রের ভূমিকা—গোলকপতি রায় (শিক্ষা ও সাহিত্য জুন, ১৯৮৪)

†২৮। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কমরেড সত্যপ্রিয় রায়ের ভূমিকা—প্রমোদ দাশগুপ্ত (শিক্ষক ও সাহিত্য, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯)।

২৯। প্রেরণার একটি উৎস—সত্যপ্রিয় রায়—প্রমথ সেনগুপ্ত (শিক্ষা ও সাহিত্য মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৯)।

৩০। গোলকদাকে মনে পড়ে—রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব (শিক্ষা ও সাহিত্য, জুন ১৯৮৪)।

৩১। শিক্ষা আন্দোলনের নেতা কমরেড গোলকপতি রায়—শৈলেন দাশশর্মা (শিক্ষা ও সাহিত্য, জুন ১৯৮৪)।

৩২। রথীনদাকে স্মরণ করে—অজিত বাগ (শিক্ষা ও সাহিত্য, জুন ১৯৮৮)।

৩৩। রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব স্মরণে—ভবেশ মৈত্র (শিক্ষ ও সাহিত্য, জুন ১৯৮৮)।

৩৪। শিক্ষক আন্দোলন ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—নিঃ বঃ শিঃ সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখা।

৩৫। সংগ্রাম, সেবা, নির্বাচন ও গণসংগঠনের ভূমিকা—মুক্তি দাশগুপ্ত (শিক্ষা ও সাহিত্য, জুন ১৯৮২)।

৩৬। পঞ্চাশ ও ষাট দশকে গণ-আন্দোলন—বিপ্লব দাশগুপ্ত (দেশহিতৈষী ২২বর্ষ ৩৪ সংখ্যা)।

৩৭। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১৯৫৪—১৯৭৯—আমার অভিজ্ঞতা—আমোদ বসু, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯)।

†৩৮। শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রসংগে—মনোরঞ্জন রায়।

৩৯। গণ সঙ্গীত—গণনাট্য উৎসব (১৯৭৯) পরিবেশিত—গণনাট্য উৎসব কমিটি।

৪০। কাস্তে—দিনেশ দাস।

৪১। হরিপদ মাষ্টার—সুনীল দত্ত।

৪২। মার্কসিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া—ক্রমিক এণ্ড ডকুমেন্টস—সুধী প্রধান সম্পাদিত।

†৪৩। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গণ-আন্দোলন—শিক্ষক আন্দোলন—বিপ্লব দাশগুপ্ত (দেশহিতৈষী—৩১শে জানুয়ারী, ১৯৮৪)।

৪৪। এসেম্বলি প্রসিডিংস—অফিসিয়াল রিপোর্ট—ভলিউম ৯ নং ১,

৪৫। কাউন্সিল ডিবেটস্ (ওয়েষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটীভ কাউন্সিল) ৪র্থ সেসন—ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৫৪ ভলিউম ১৯ নং ২,

৪৬। কাউন্সিল অব ষ্টেটস ডিবেট—ভলিউম ৬, ১৯৫৪,

৪৭। পার্লিয়ামেন্টারী ডিবেট (লোকসভা) পার্ট ২ ভলিউম ১,

৪৮। যুগবাণী—১৯৫৪ সাল।

†৪৯। সন্দীপন পাঠশালা—তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়।

৫০। পল্লীসমাজ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

†৫১। সিন্ধু তরঙ্গ—মানসী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫২। কাক পন্ডিত—তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়।

৫৩। তারাশংকর প্রসংগ—অসিত বন্দোপাধ্যায়।

৫৪। ভাঙা চশমা (দুঃশাসন গ্রন্থ)—নারায়ণ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৫৫। মানুষ গড়ার কারিগর—মনোজ বসু।

৫৬। অনুবর্তন—বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

৫৭। বিভূতিভূষণ রচনাবলী—৭ম ও ১০ম খন্ড।

৫৮। ঋত্বিক ও তাঁর ছবি——রজত রায় সম্পাদিত।

৫৯। টিচার (উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ)—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬০। একলব্য—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৬১। লালুভুলু—বাণভট্ট।

৬২। নয়া ইতিহাস—অন্নপূর্ণা গোস্বামী।

৬৩। রাত্রির তপস্যা—গজেন্দ্রনাথ মিত্র।

†৬৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ।

৬৫। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৬৬। বাংলা নাটকের গোড়ার কথা—শোভা সেন (গণশক্তি—১৮।৪।৮৯)।

৬৭। দীনেশ দাসের কাব্য সংগ্রহ।

৬৮। তারাশংকর—দেশ কাল সাহিত্য—উজ্জ্বল মজুমদার সম্পাদিত।

৬৯। নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর—সুনীল দত্ত।

৭০। শিক্ষা ও সাহিত্য (প্রকাশক—নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি) সংখ্যা—সেপ্টেম্বর ১৯২১, জানুয়ারী, জুন, জুলাই, আগস্ট ১৯২৩, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, জুন, আগস্ট ১৯২৬, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯২৭, জানুয়ারী, আগষ্ট ১৯২৮, মার্চ, নভেম্বর ১৯২৯, জানুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ১৯৩০, জানুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ১৯৩১, জানুয়ারী, এপ্রিল, মে-জুন, নভেম্বর ১৯৩৩, মার্চ ১৯৩৪, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মে-জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৩৫, মে-জুন, জুলাই ১৯৩৬, জানুয়ারী, মার্চ, মে-জুন ১৯৩৭, জানুয়ারী, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৩৮, মার্চ, আগস্ট, নভেম্বর ১৯৩৯, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে-জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪০, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, মে-জুন, নভেম্বর ১৯৪১, জানুয়ারী, জুলাই, ডিসেম্বর ১৯৪২, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, ডিসেম্বর ১৯৪৩, জানুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ১৯৪৪, মার্চ, জুলাই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, জুলাই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৪৬, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, মে ১৯৪৭, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৪৮, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল-মে, জুলাই; আগস্ট-সেপ্টেম্বর, নভেম্বর ১৯৪৯, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, জুন, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫০, জানুয়ারী, এপ্রিল, মে

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫১, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল-মে, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৫২, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল-মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৫৩, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ-এপ্রিল, মে জুন-জুলাই, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৪, এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ১৯৫৫ সাল।

২০।৮।৪৮, ২৩।৮।৪৮, ২।৯।৪৮,
৭১। দি স্টেটসম্যান (ইংরাজী দৈনিক)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪,
৭।২।৫৪, ১২।২।৫৪, ১৩।২।৫৪, ১৪।২।৫৪, ১৬।২।৫৪, ২৪।২।৫৪
১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪, ২১।২।৫৪, ২২।২।৫৪, ২৩।২।৫৪, ২৪।১।৫৪,
৭২। দৈনিক বসুমতী—১১।৬।৫৩, ২১।১২।৫৩, ১৭।১।৫৪, ১২।২।৫৪,
২৮।১।৫৪, ৩১।১।৫৪, ৫।২।৫৪, ৬।২।৫৪, ৭।২।৫৪, ৯।২।৫৪,
১৩।২।৫৪, ১৭।২।৫৪, ২০।২।৫৪
১৯।৮।৫২,
৭৩। অমৃতবাজার পত্রিকা—১।৪।৫২, ২।৪।৫২, ১০।৪।৫২, ১৩।২।৫৪,
২৩।২।৫৩, ১।২।৫৪, ৮।২।৫৪, ৯।২।৫৪, ১১।২।৫৪, ১২।২।৫৪, ২০।২।৫৪,
১৪।২।৫৪, ১৫।২।৫৪, ১৬।২।৫৪, ১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪,
২১।২।৫৪
২৯।১১।৫৩,
৭৪। স্বাধীনতা—৩১।৩।৫৩, ১৩।১১।৫৩, ২৮।১১।৫৩, ৮।২।৫৪,
২৩।১।৫৪, ২৬।১।৫৪, ১।২।৫৪, ৩।২।৫৪, ৬।২।৫৪, ৭।২।৫৪, ১৫।২।৫৪,
৯।২।৫৪, ১০।২।৫৪, ১১।২।৫৪, ১২।২।৫৪, ১৩।২।৫৪, ১৪।২।৫৪, ৭।৩।৫৪,
১৬।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২৩।২।৫৪, ২৪।২।৫৪, ১।৩।৫৪,
৮।৩।৫৪, ২২।৩।৫৪
২০।১১।৫২,
৭৫। আনন্দবাজার পত্রিকা—৬।১১।৫২, ৭।১১।৫২, ১০।১১।৫২, ১।২।৫৪,
২৫।২।৫৩, ১৫।৪।৫৩, ১০।৮।৫৩, ১৬।১।৫৪, ২৭।১।৫৪, ২৯।১।৫৪, ৯।২।৫৪,
২।২।৫৪, ৩।২।৫৪, ৫।২।৫৪, ৬।২।৫৪, ৭।২।৫৪, ৮।২।৫৪, ১৭।২।৫৪,
১০।২।৫৪, ১১।২।৫৪, ১২।২।৫৪, ১৩।২।৫৪, ১৫।২।৫৪, ১৬।২।৫৪, ২৪।২।৫৪,
১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪, ২১।২।৫৪, ২২।২।৫৪, ২৩।২।৫৪,
২৫।২।৫৪, ২৬।২।৫৪

৭৬। যুগান্তর পত্রিকা—১।২।৫৪, ২।২।৫৪, ৬।২।৫৪, ৭।২।৫৪, ৮।২।৫৪, ১০।২।৫৪, ১১।২।৫৪, ১৩।২।৫৪, ১৪।২।৫৪, ১৫।২।৫৪, ১৬।২।৫৪, ১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪, ২১।২।৫৪, ২২।২।৫৪, ২৩।২।৫৪, ২৪।২।৫৪

৭৭। দি হিন্দুস্থান টাইমস্—১৯।২।৫৪

৭৮। সার্চ-লাইট (পাটনা-ইংরাজী)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪ ১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪

৭৯। গণশক্তি (দৈনিক)—২২।৮।৮৪

৮০। হিন্দুস্থান (দিল্লীর হিন্দি দৈনিক)—১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪

৮১। ন্যাশানাল হেরল্ড (লখনৌ)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২১।২।৫৪

৮২। আসাম ট্রিবিউন (গৌহাটী)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ২১।২।৫৪

৮৩। দি হিন্দু (মাদ্রাজ)—১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২০।২।৫৪

৮৪। টাইমস্ অব ইন্ডিয়া (বম্বে)—১২।২।৫৪, ১৩।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪

৮৫। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (নয়াদিল্লী)—১৩।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪, ২১।২।৫৪
৮৬। লীডার (এলাহাবাদ)—১৮।২।৫৪
৮৭। টাইমস্ (লণ্ডন)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪
৮৮। নিউইয়র্ক টাইমস্ (আমেরিকা)—১৭।২।৫৪, ১৮।২।৫৪, ১৯।২।৫৪

সাক্ষাতকার—শ্রীমতি অনিলা দেবী, শ্রীমতি নীলিমা সেন, শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্র নাথ রায় (বর্তমানে প্রয়াত), শ্রীসুশীলকুমার কুণ্ডু, মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, শ্রীসুনীল দত্ত, বীণা চৌধুরী (বর্তমানে প্রয়াত), শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শ্রীসজল রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সরোজ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায় (প্রধান শিক্ষক, কালিধন ইনস্টিটিউশন), অধ্যাপক আশুতোষ রায়, শ্রীস্বপন ব্যানার্জী (নৈহাটী গণ-সংস্কৃতি) শ্রীপুর্ণেন্দু পত্রী, শ্রীসুখময় চক্রবর্তী (গণবার্তা), শ্রীভারতেন্দু চৌধুরী (গ্রন্থাগারিক), শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ভবেশ চন্দ্র মৈত্র, শ্রীবিমান বসু, ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

যে সব গ্রন্থাগারগুলি সাহায্য করেছেন—

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা। জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এসেম্বলী লাইব্রেরী, কলকাতা। কমরেড মুজফ্‌ফর আহম্মদ গ্রন্থাগার, কলকাতা। বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট। রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার। ভাণ্ডার পল্লী পাঠাগার, সুশীল চন্দ্র টাউন লাইব্রেরী ও সত্যপ্রিয় রায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কালিয়াগঞ্জ।

নির্ঘন্ট